বিবেকানন্দ স্মৃতি

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অর্ঘ্য

১৯৬৪

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
অমল দাশগুপ্ত

ব্লক :
প্রসেস্ সিণ্ডিকেট

গ্রন্থন :
নিউ ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ আজকের মানবতার ধ্রুব-তারা। এ যুগের জীবনে তাঁরাই দীপ হয়ে জ্বলে উঠেছেন, সুর হয়ে বেজে উঠেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্দেশিত পন্থায় তিলে তিলে আপন জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আপন সাধনার যে বহুমুখী রূপকে সার্থকতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার সম্যক্ পরিচয় আজকের ভারতবাসী জানতে উন্মুখ,—এই বিশ্বাসই বর্তমান স্মারক গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্বকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। স্বামীজির জীবনী, সাধনা ও বাণী নিয়ে অনেক মনীষী অনেক কথাই লিখেছেন। দেশে বিদেশে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কত আলোর মালা গাঁথা হয়েছে। সেই দীপাবলীর উৎসবে আমি এসেছি আমার স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাণতায় উদ্বুদ্ধ কয়েকটি প্রাণপ্রদীপ নিয়ে। আলোর ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের সমারোহ অপেক্ষা শ্রদ্ধাশীল অনুভব এবং হৃদয়তন্ত্রীতে স্বামীজির বলিষ্ঠ কণ্ঠের অনুরণন হয়েছে আমার পুঁজি। যে লেখক ক'জন এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রসঙ্গ নির্বাচন, লেখার মূলগত লক্ষ্য এবং প্রত্যয়-সঞ্জাত মৌলিকতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে তাঁরা এক নূতন মর্যাদা-বোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পত্র-বিনিময়, যৌথ পাঠ ও আলোচনায়, সূত্রসন্ধানের আগ্রহে তাঁরা সম্পাদকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন।

এই একাত্মবোধ আজ বড় বেশী প্রয়োজন। বিশ্বের বৃহৎ ক্ষেত্রে যেমন যৌথ উদ্যোগের ধারা প্রবহমান হয়ে উঠেছে—স্বামীজির বলিষ্ঠ কল্পনাকে সত্য করে তুলে বিজ্ঞান ও বিবেককে একসূত্রে গ্রথিত করার মহাযজ্ঞে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য হাতে হাত ধরে এগোচ্ছে—ভারতবর্ষের জাগতিক জীবন প্রতিষ্ঠার নানা উদ্যোগে যেমন ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা ও রাশিয়া সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসে অতীতের ভেদবুদ্ধির লজ্জাকে অতিক্রম করতে চাইছে—তেমন আবার প্রতিবেশী চীন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্বার মোহে ভারতবর্ষকে, ভারতীয় জাতীয়তাকে আঘাত করতে এসেছে। তাই বলি একাত্মবোধের আজ প্রয়োজন বড় বেশী।

সন্ন্যাসীদের কাছে, গৃহীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ একটি দাবী রেখেছেন। সেটি হল তামসিকতার বন্ধন ছিন্ন করে দেশ, মানবতা ও ঈশ্বরকে এক পরম সত্যের ত্রিরূপী প্রকাশ বলে চিনতে শিখতে হবে। এ শিক্ষাব্রতের পুরোভাগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রিত যে মহাভাগ্যবান ও মহাশক্তিমান সাধকরা রয়েছেন তাঁদের ভাষণ ও লিখন গত দুটি বৎসর ধরে উত্তর সাধকদের সন্ধান খুঁজছে। পরমপূজ্য স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর এক পুণ্য ভাষণে রয়েছে :

"জাগ্রত ভারত আর নিদ্রাভিভূত হইবে না, বাহিরের কোনো শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।" (পৃঃ ৪, Swami Vivekananda Birth Centenary Souvenir, Sri Sarada Math, Dakshineswar, 1963) পরমপূজ্য স্বামী "দ"র পুণ্য সঙ্গীতাঞ্জলিতে সুর বেজে উঠেছে :

শংকর জাগো শংকায়
জাগো হে বিবেক স্বামি
কণ্ঠে মা ভৈঃ মন্ত্রি
আনো অমৃত বাণী।

যে নির্বীর্যতার আশ্রয়ে কলিকাতা মহানগরীতে স্বামীজির জন্ম-শতবার্ষিকীর উৎসব-বেদী সাম্প্রদায়িকতার গুপ্ত অগ্নিতে জলে উঠেছিল, ভারতবর্ষের সকল সাধুকে, সমস্ত গৃহীকে বিবেক মন্ত্রের তপস্যায় তার নিরাকরণ করতেই হবে। পরমপূজ্য স্বামী যতীশ্বরানন্দের ভাষণে স্বামীজির বাণীই নিরাকরণের পথ-নির্দেশ বহন করছে : "সর্বপ্রথমে আমাদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তারপর সকলকেই দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে।"

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজা রামমোহনপুর,

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
সম্পাদক

সূচীপত্র

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ

তখনও নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ হননি। নবভারতের নূতন তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আনাগোনা শুধু কোরছেন। মনে বৈরাগ্যের জন্য প্রবল আকূতি। তাই বারে বারেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেন, "আমাকে আপনি নির্বিকল্প সমাধি দিন। আমি শুকদেবের মত সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে যেতে চাই। পার্থিব কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে আমি ব্রহ্মানন্দের স্বাদ লাভ করতে চাই।"

ঠাকুর তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "নরেন, তুই নিজের মুক্তিলাভের জন্য আমাকে বলছিস, তুই এতবড় স্বার্থপর কি করে হলি? আমি ভেবেছিলাম তুই হবি বিশাল বটগাছের মত। তোর সুশীতল ছায়ায় লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ আতুর নরনারী শান্তি লাভ করবে।" নরেন্দ্রনাথ নিজের স্বার্থপরতায় লজ্জিত হয়ে উঠলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে এই নরেন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তিলাভ হয়, ততদিন আমি আমার নিজের মুক্তিকামনা করব না।"

উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগ। রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের লোককে হাজার বছরের কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা বহুশত বৎসরের অন্ধকারকে দূর করে নব জাগরণের আলোকের বন্যা নিয়ে আসবে। মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর একান্ত কামনা। রামমোহন স্বয়ং বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন। তাই বুদ্ধির শাণিত তরবারি দিয়ে তিনি আমাদের দেশের

মোহবন্ধন কাট্‌তে চেয়েছিলেন। মস্তিষ্কের দ্বারা তিনি চালিত। তাই হৃদয়াবেগের আবর্তে তিনি কখনও তলিয়ে যাননি। যখন তিনি সতীদাহ প্রথা লোপ করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন। রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাচার্য। শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য দান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের কাছে তাঁর বাণী বিশেষভাবে পৌঁছুতে পারেনি। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক হিসাবে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সে আলোড়ন সমাজের উচ্চ বর্ণ এবং মুষ্টিমেয় সুপ্রতিষ্ঠিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে ভারতের মাটির স্পর্শ ছিল না। পৌত্তলিকতার দোষত্রুটী রামমোহন দেখিয়েছেন, কিন্তু কোটী কোটী হিন্দু মৃন্ময়ী দেবীকে চিন্ময়ী রূপেই দেখেছে। তাই হিন্দুদের কাছে শরৎকালে যখন রাশিরাশি শিউলি ফুল ঝরে পড়ে, আকাশবীণার তারে তারে আগমনীর সুর বেজে ওঠে, তখন সেই মুহূর্তটুকু পরম মুহূর্ত হয়ে ওঠে।

রামমোহনের পরে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিও ছিলেন একজন বড় সমাজ-সংস্কারক। বাংলাদেশের বিধবাদের চোখের জল তাঁর কোমল বুকে বজ্রের মত বেজেছিল। বিধবাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবার মহান্ ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান সমাজ-সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য, তাঁর দুর্জয় পৌরুষ, তাঁর তেজস্বিতা, মননশীলতা সকলই অনুকরণযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের লোকের কাছে তিনি যে মূর্তিতে প্রকাশ, সে মূর্তি স্নেহ, করুণা ও মমতায় মাখা মাতৃমূর্তি। মাইকেল মধুসূদন তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনা করে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মত জ্ঞানবান্, ইংরেজের মত কর্মঠ ও তেজদীপ্ত এবং বাঙালী মায়ের মত মমতায় ভরা।" বিদ্যাসাগর ছিলেন

হৃদয়বান্, তিনি চালিত হতেন হৃদয়ের দ্বারা। বিদ্যাসাগরও রামমোহনের মত জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলিতে পারেননি। তাঁর করুণামন্দাকিনীধারায় বহু দুঃস্থ লোক অবগাহন করেছে। তাঁর মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার মত তাঁর বাণী ছিল না।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করাই ছিল হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য। বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার চর্চা করে আসছিল। ইংরেজী শিক্ষা তাদের অনেককেই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। লর্ড মেকলে একদা বলেছিলেন,—"ইউরোপীয় মুষ্টিমেয় কয়েকখানি পুস্তকের মূল্য সমগ্র প্রাচ্যভূমির সমস্ত গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিক।"

যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তারা ইংরেজী শিক্ষার জৌলুষে একান্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষিগণ ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারাই শতাব্দীর অচলায়তন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভারতের স্বকীয়তা, ভারতের ভাবধারা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য যত মহান্ হোক না কেন, এ কলেজের বহু ছাত্র আত্মবিস্মৃত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। অধ্যাপক ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাণ। ডেভিড হিউমের গ্রন্থাবলী ছিল তাঁর অবশ্যপাঠ্য। তিনি ছাত্রদের যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর চরিত্র ছিল কবিধর্মী। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রকে সংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে। তাঁর কাছে আচারের চেয়ে

বিচার ছিল বড়, সংস্কারের চেয়ে বিজ্ঞান। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর বহু ছাত্রই তাঁর ভাবধারাকে গ্রহণ কর্তে পারেনি। তারা কালাপাহাড়ের মত ভাঙতে চেয়েছিল, কিন্তু সমাজের নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তে পারেনি। অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয় বেশভূষা, ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার ছিল তাদের অনুকরণের বস্তু। পতঙ্গ যেরূপ আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম তৎকালীন যুবকবৃন্দ ইউরোপীয় সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের কারুর কারুর মধ্যে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেম ছিল। কিন্তু জনজাগরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশের জনসাধারণ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। অনেকের দুঃখ ছিল যে তারা বাঙালী হয়ে জন্মেছে। বিলেতী ধরনের হাসি, বিলেতী ধরনের কথাবার্তা, এই ছিল তাদের জীবনের অভীষ্ট। ইংরেজী ভাষাকে কতটা আয়ত্ত করেছে এবং মাতৃভাষাকে কতটা ভুলে যেতে পেরেছে এই অভিমানেই তাদের হৃদয় ভরপুর ছিল। জাতির সঙ্গে নাড়ীর টান তাদের ছিল না। মনে হয়েছিল, তারা কোন সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে কিছুক্ষণের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই তারা আবার চলে যাবে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "তাঁহারা দলবদ্ধ হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন।"

জাতির পক্ষে এ নিতান্তই বেদনার কথা। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে জয় করে নিয়েছিল অস্ত্রের জোরে নয়। ভারতবাসীকে সে জয় করেছিল ইংরেজী শিক্ষার স্বর্ণমৃগ দেখিয়ে। তার ফলে ভারতবাসী একটি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত জাতিতে রূপান্তরিত হ'ল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলার সরস মাটির যোগ ছিল না। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন কোন ছাত্র হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হয়ে দেশের সেবা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশই ছিল মোহগ্রস্ত

এবং দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া ও পাওয়ার প্রতি একান্ত উদাসীন। মাটির পানে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে জাতিকে, তাই এক নূতন ধর্মের প্রয়োজন হয়েছিল, যে-ধর্ম শেখাবে যে, ভারতবর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভারতের উদ্ধারের গোপন মন্ত্র। সেই গোপন মন্ত্র ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন—"

—"আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না মন কারু ঘরে,
যা চা'বি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও মন) কত মণি পড়ে আছে, সে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে ॥
তীর্থগমন দুঃখ-ভ্রমণ মন উচাটন হয়ো না রে,
(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী-স্নানে শীতল হও না মূলাধারে ॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
(তুমি) বাজিকরে চিনলে নাকো, (যে এই) ঘটের
ভিতর বিরাজ করে ॥"

শঙ্করাচার্যের মত জ্ঞান, গৌরাঙ্গের মত প্রেম, বুদ্ধের মত ত্যাগ, মৈত্রী ও করুণার বাণী নিয়ে রামকৃষ্ণদেব জন্মেছিলেন বাংলা দেশের এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে। না-ছিল তাঁর আভিজাত্যের গৌরব, না-ছিল শিক্ষার অভিমান। এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষকে এক নূতন ধর্মে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। তাঁরই মনে প্রকট হয়েছিল বেদান্তের জ্ঞান, আর মানুষের জন্য অপার্থিব ভালবাসা। বুদ্ধদেব মৈত্রী ও করুণার বাণী নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর ধর্মে বোধ হয় ভারতবর্ষের মাটির যোগ ছিল না। সেজন্যই সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়-সাধন করে এক নূতন বাণী প্রচার করলেন, যে-বাণী ভারতবর্ষের প্রাণের তন্ত্রীতে গাঁথা। একদিন রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা

করা হয়েছিল, "আমরা কি মানুষের উপকার করব?" তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তুই উপকার করবি কি রে? জীবকে শিবজ্ঞানে তোরা সেবা কর, পূজো কর"। এই বাণীই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল স্বামীজির কণ্ঠে যখন তিনি বলেছিলেন,

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

রামকৃষ্ণ তখন কর্কট রোগে আক্রান্ত। শারীরিক কষ্টের আর অবধি নেই। গলায় ঘা। এতটুকু খেতে পারেন না। তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও এতটুকু জল পর্যন্ত ঢুকতে চায় না। গুরুঅন্ত প্রাণ শিষ্যেরা শুধু বেদনাই অনুভব করে। কিন্তু কষ্ট লাঘব করবার মত সাধ্য তাদের নেই। নরেন্দ্রনাথ গুরুকে বলেন, "আপনি তো ইচ্ছা করলেই মা কালীকে বলে রোগমুক্ত হ'তে পারেন।" ঠাকুর একটু হাসলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ আবার বললেন, "নিজের রোগ-মুক্তি না হয় আপনি না-ই কামনা করলেন, কিন্তু আপনি তো মাকে বলে একটু খাওয়ার কথা বলতে পারেন। এতটুকু খেতে পারেন না। আমাদের বুকে ফেটে যায়।" নরেনের কথা ঠাকুর ফেলতে পারেন না। মা কালীর মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর প্রার্থনা জানালেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি তাঁর ঘরে ফিরে আসতেই নরেন জিজ্ঞাসা করলেন, "মাকে বলেছিলেন ত? মা কি বললেন?" ঠাকুর একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "মা বললেন, তোর একমুখ দিয়ে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আরও কত লক্ষ লক্ষ মুখ রয়েছে, সেই মুখ দিয়েই তো তুই খাবি।" এই তো ভারতবর্ষের বেদান্তের বাণী, যে-বাণী আমাদের শিখিয়েছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে নারায়ণ রয়েছেন। সেই নারায়ণের সেবাই মানুষের চরম অভীষ্ট। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ পেলো এ জগতে।"

এই প্রশস্তির মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। কারণ, বহু সাধকের সাধনার ধ্যানমূর্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি তাঁর মানসপুত্র নরেন্দ্রনাথকে এই ধর্মেই দীক্ষিত করেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যার পেটে যা সয়।" তিনি তাঁর অন্যান্য শিষ্যকে যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথ নরেন্দ্রনাথের নয়। শুধু বৈরাগ্য, ত্যাগ আর সন্ন্যাস ব্রতেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষিত করেননি। তিনি তাঁর মধ্যে এক বিরাট কর্মব্যাকুলতাও জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই নরেন্দ্রনাথ হিমালয়ের গিরিকন্দরে জনকোলাহলের অনেক দূরে ঈশ্বর আরাধনায় দিন কাটাননি। নিজের মুক্তিকামনা না করে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি কামনা করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "আজকে নরেনের মধ্যে রয়েছে এক বিরাট অহংকার ও আত্মাভিমান। কিন্তু যেদিন নরেন পৃথিবীর দুঃখে ক্লিষ্ট, দারিদ্র্যে জর্জরিত মানুষের সংস্পর্শে আসবে তখন তার সমস্ত অহংকার আর অভিমান বেদনায় আর অনুকম্পায় গলে যাবে।"

বেদনা আর অনুকম্পার প্রয়োজন ছিল। বাল্যকালে একদিন নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত দেখলেন যে তাঁর ছেলে ঘরে যে কটা হুঁকো আছে তার প্রত্যেকটাতেই টান দিচ্ছেন। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন উকিল। তাই তাঁর কাছে নানা জাতের, নানা ধর্মের মক্কেল আসত। নরেন বুঝতে পারেন না, এতগুলো হুঁকোর প্রয়োজন কি! তাই পিতার প্রশ্নে বললেন, "সবগুলো হুঁকোয় মুখ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর্ছি সত্যি সত্যি আমার জাত যায় কিনা।" এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তির কোন প্রকাশ নেই। এখানে আছে মানুষে মানুষে কেন এই ভেদ—তারই একটি বিরাট প্রশ্ন। এ প্রশ্নে আছে শিশুসুলভ কৌতূহল। এ প্রশ্ন বেদনাসঞ্জাত নয়।

রামকৃষ্ণদেবের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ হলেন গুরুভাইদের নেতা ও আশ্রয়স্থল। একটি ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। যেদিন ভাত জোটে তো নুন জোটে না। দুঃখ-দারিদ্র্য আগেও তিনি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু পূর্বে এত কৃচ্ছ্র সাধনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। বেদনার সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ। কিছুদিন মঠে থেকে নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক হয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রী হলেন। পথের দেবতার অমোঘ নির্দেশে পরিব্রাজক হয়ে চললেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। অকথ্য লাঞ্ছনা, অপমান তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ভূষণ হয়ে উঠলো। তীব্র বৈরাগ্যের সুর তাঁকে নিয়ে চলল পথে পথে। বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন নরেন্দ্রনাথ। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন। হঠাৎ দেখলেন, একটি কুঁড়ে ঘরে একজন লোক মনের আনন্দে তামাক খাচ্ছে, বহুদিনের অভ্যাস। নরেন্দ্রনাথের একটু তামাক খাবার প্রবল বাসনা হ'ল। লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই, তোমার হুঁকো কল্কেটা একবার দেবে?" লোকটি সবিনয়ে বললে, "মহারাজ, আপনি তামাক খাবেন, সে তো আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু আমি যে ভাঙ্গী, মেথর।" বহুদিনের সংস্কার। মেথরের ছোঁয়া কোন জিনিস কি খাওয়া যায়? সংস্কারের বশে তামাক না খেয়েই এগিয়ে চললেন। কিন্তু তার পরেই মনে হ'ল, আমি না বেদান্তে বিশ্বাসী? আমি না সর্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করি? মেথরটির কাছে গিয়ে তারই ছোঁয়া তামাক খেলেন। বহুদিনের একটি মোহাবরণ আস্তে আস্তে খসে গেল।

পরবর্তী জীবনে তিনি ছুতমার্গের বিরুদ্ধে আপ্রাণ আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষে মানুষে ভেদ যে ধর্ম শিক্ষা দেয় সে ধর্ম তাঁর নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ছুতমার্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনেরই পূর্বাভাস। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, "আমি পথের

দেবতার নির্দেশে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু যখন ফিরে আসব তখন সমাজের উপর বোমার মতন বিস্ফোরিত হব। সমস্ত মানুষ কুকুরের মত আমাকে অনুসরণ করবে।" অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন।

ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। রাজা, মহারাজা থেকে দীন দরিদ্র প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে তাঁর হল নিবিড় পরিচয়। আরাম কেদারায় শোয়া রাজনীতিবিদ্ তিনি ছিলেন না। ভারতবর্ষকে তিনি যেরূপ ভাবে জেনেছিলেন সেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কজনই বা জানতে পারে? কতদিন ক্ষুধায় একমুঠো অন্ন মেলেনি, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল মেলেনি কিন্তু তবুও ভারতবর্ষকে জাগাতে হলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। রাজ-প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর সর্বত্রই সন্ন্যাসীর নিঃসংকোচ পদক্ষেপ।

মধ্যভারতে বেশ কয়েকদিন তাঁকে ঝাড়ুদারদের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। মেথর ও ঝাড়ুদারদের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজের ক্লেদ ও মলিনতার উপরে যাদের নিত্য মঙ্গলস্পর্শ রয়েছে তারা কত দরিদ্র, কত অসহায়! অথচ এদের মাথার উপর সারা সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

পথে চলতে চলতে এসে পড়লেন ক্ষেত্রীরাজ্যে। ক্ষেত্রীর মহারাজ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। একদিন রাজসভায় গানের জলসার আয়োজন হয়েছে। একজন বাইজী গান গাইছে। সন্ন্যাসী আঁতকে উঠলেন। পতিতা নারীর স্পর্শ তাঁর কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তিনি ঘৃণার সঙ্গে চলে যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। সেই সময় পতিতা নারীর কণ্ঠে একটি গান শুনা গেল। সুরদাসের ভজন। প্রাণের আবেগ দিয়ে নর্তকী গাইল—

"প্রভু, মেরো অবগুণ চিত ন ধরো
সমদরশী হায় নাম তিহারো,
চাহো তো পার করো।"

স্বামীজির বুকে একটি প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিনি বুঝলেন, আবার তিনি ভুল করেছেন। বেদান্তবাদীর কাছে সুচরিতা ও পতিতার মধ্যে কোন ভেদ নেই। বোধ হয় মনে পড়েছিল রামকৃষ্ণদেবের কথা। রামকৃষ্ণদেব একদিন একজন বারনারীকে দেখে বলে উঠেছিলেন,—"মা, আজ তুমি এই বেশে এসেছ।"

জয়পুরে এসেছেন স্বামীজি। সেখানে জনসাধারণের অপরিমেয় দুঃখ, দারিদ্র্য দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। জয়পুরের মহারাজ ও রাজকর্মচারীদের জনসাধারণের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

বাইরে জ্ঞানের পোশাক পরা থাকলেও অন্তর ছিল তাঁর প্রেমময়। এতখানি হৃদয়বান্ সন্ন্যাসী বিশ্বের ইতিহাসে কেউ ছিলেন বলে জানি না। একদিন শুনলেন, ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বলরামবাবু অত্যন্ত অসুস্থ। স্বামীজির চোখ ফেটে জল এলো। তখন ভক্তপ্রবর প্রমদাদাস মিত্র স্বামীজিকে বললেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনারও শোক?" স্বামীজি সবিস্ময়ে বললেন, "আমি সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয়টাকে একান্ত বিসর্জন দিয়েছি? যে-সন্ন্যাস ধর্ম মানুষকে মানুষের দুঃখের প্রতি উদাসীন হতে বলে সে-সন্ন্যাস ধর্ম আমার নয়।"

খবর এল, ছোট বোন শ্বশুরবাড়ীতে আত্মহত্যা করেছে। পাগলের মতন ছুটে এলেন সন্ন্যাসী। ভেসে গেল শুষ্ক বৈরাগ্যের কথা। একটি হৃদয়বান্, প্রেমময় জ্যোতিষ্মান্ আত্মা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত জ্বলে উঠল।

স্বামীজি শুধু হিন্দু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে চাননি, সর্ব-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। একবার তিনি আবু পাহাড়ের গুহায় কিছুদিন বাস করে-ছিলেন। নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। জনৈক মুসলমান মৌলবী স্বামীজির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি

সাদরে স্বামীজিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ক্ষেত্রীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহনলাল হিন্দু ধর্মের একজন পাণ্ডা। স্বামীর আপাতসমাজবিরোধী কাজে তিনি মর্মাহত। তিনি স্বামীজিকে বললেন, "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে মুসলমানের বাড়ীতে কেন আছেন?" স্বামীজি উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমি সর্বভূতে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করেছি। হিন্দু-মুসলমান এ বিভেদ আমি মানি না।"

পরিব্রাজকের জীবন শেষ হ'ল। তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। যখন শুনলেন যে একজন লোক কলকাতার রাজপথে একমুঠো অন্নের অভাবে প্রাণত্যাগ করেছে, তখন বজ্রকণ্ঠে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "সন্ন্যাসীরা কি করছিল? তারা কি বুভুক্ষুর মুখে অন্ন দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেনি?" স্বামীজির কণ্ঠে বারে বারেই এই বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, "আমি মুক্তি চাই না, আমি সহস্রবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে অজস্র দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে চাই। যুগে যুগে মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে চাই। আমার দেবতা দুঃস্থ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে। আমার দেবতা সমাজের পতিতদের মধ্যে।"

স্বামীজি বুঝেছিলেন, সমাজ-সংস্কার দিয়ে ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তোলা যাবে না। খালি পেটে ধর্মের বুলি শোনান তাঁর কাছে অপরাধ। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" স্বামীজি এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করলেন যে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থেকে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেছে সত্য, কিন্তু পশু থেকে তাদের জীবনযাত্রার কোন পার্থক্য নেই! এই অগণ্য জনসাধারণের মধ্যে তাদের হৃত মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভারতবর্ষ বেদান্তের দেশ। কিন্তু বেদান্তের শাশ্বত বাণী ভুলে গিয়ে তারা আজ পশুতে রূপান্তরিত। পুরোহিত, ধনী ও ধর্মান্ধ গুরুদের অত্যাচারে আজ জনসাধারণ সম্মোহিত, বিভ্রান্ত।

সমাজের তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেরা আরামশয্যায় শায়িত। তাদের সেবার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গীকৃত। এই দরিদ্র জনসাধারণের মাথার উপর গোটা সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তাদের অসম্মান—মানবাত্মা বারে বারে লাঞ্ছিত। সমাজের ধনিক, বণিক, মোহান্ত ও পুরোহিতকুল বিলাস-ব্যসনের স্রোতে ভেসে চলেছে। নৈতিক মেরুদণ্ড তাদের ভেঙে পড়েছে। স্বামীজি বুঝলেন, ভারতবর্ষকে জাগাতে পারে একমাত্র জনসাধারণ। দীর্ঘকাল জনসাধারণকে বঞ্চিত ও শোষিত করা হয়েছে। আজকে তাই তারা হৃতবীর্য। কিন্তু তাদের মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে পারলেই ভারতবর্ষের নবজাগরণ সম্ভব হবে।

স্বামীজি বুঝেছিলেন যে বর্তমান যুগ তথাকথিত শূদ্র ও সর্বহারাদের যুগ। ভগিনী ক্রিস্টিন-এর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে স্বামীজি একসময় একটি স্বগতোক্তি করেছিলেন,—“ব্রাহ্মণ যুগ, ক্ষত্রিয় যুগ, বৈশ্য যুগ কেটে গেছে—আজ এসেছে শূদ্রের যুগ।” এই শূদ্র জাগরণ জনসাধারণের জাগরণ।

মাঝে মাঝে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে ইংরেজ কুশাসন ও দুঃশাসন দূর করবার চেষ্টা করেছিল। স্বামীজির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর তেমন বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানতেন, আবেগের মুহূর্তে এরা দু-একজন হয়ত কোন বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হতে পারে। দু-একজন পুলিস কর্মচারী বা জেলা শাসককে হত্যাও করতে পারে, কিন্তু সেটা শ্রেয়ের পথ নয়। তাতেই গণজাগরণ সম্ভবপর নয়। তাই জনসাধারণ ও যুব-সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে—এই ছিল তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস।

যে জনসাধারণের উপর স্বামীজির এত প্রবল বিশ্বাস তারা বহু দিনের অত্যাচারে পঙ্গু, বহুযুগের তামসিকতায় অন্ধ। তাদের যদি জাগিয়ে তোলা যায় তবে তারাই আবার দেশকে জাগিয়ে তুলবে। তাদের জাগিয়ে তোলবার পথ কি? মনে পড়ল ঠাকুর রামকৃষ্ণের

কথা। একদিন রামকৃষ্ণদেব এক টুকরো কাগজে লিখে দিলেন, “নরেন লোকশিক্ষা দেবে।” নরেনের মন তখন সংসারবিরাগী। মোক্ষের চিন্তায় মনপ্রাণ আকুল। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, “ওসব লোকশিক্ষা-টিক্ষা আমার দ্বারা হবে না।” রামকৃষ্ণ বললেন, “তোর ঘাড় করবে।” লোকশিক্ষার প্রয়োজন মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলবার জন্য। কিন্তু ধর্ম যেমন খালি পেটে হয় না, শিক্ষাও তেমনি খালি পেটে হয় না। তাই লোকশিক্ষার পূর্বে প্রয়োজন জনসাধারণের দারিদ্র্য মোচন।

আমেরিকা ধনকুবেরদের দেশ। সেখানে আছে অজস্র সম্পদ্। কিন্তু আমেরিকাবাসীরা জড়বাদে বিশ্বাসী। বাইরের বিলাস-ব্যসন তাদের বেড়ে চলেছে। উপকরণের দুর্গ পাহাড়ের মত জমে উঠেছে। কিন্তু তাদের আত্মা বুভুক্ষু। বিশ্বসভায় ব্যবহারিক জ্ঞানে বিজ্ঞানে তারা প্রায় সকলের ঈর্ষার পাত্র। কিন্তু মনের দীনতা তাদের অপরিসীম। স্বামীজি ঠিক করলেন, আমেরিকাবাসীদের বেদান্তের বাণী শোনাবেন। তার পরিবর্তে নিয়ে আসবেন অর্থ আর ভারতের জন্য আমেরিকাবাসীর শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। সেই অর্থ দিয়ে তিনি ভারতবাসীর দুঃখ ঘোচাবেন। তিনি বললেন, “আমি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছি। কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দেখে আমি অশ্রুপাত না করে থাকতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর না করে তাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়া একান্ত নিষ্ফল। ভারতবর্ষের দুঃস্থ, দরিদ্রদের অভাব-অনটন মোচনের জন্যই আমার আমেরিকা যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।”

স্বামীজি তাঁর উদ্দেশ্যের কথা প্রথম প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করলেন মাদ্রাজে। তিনি নিজেই জনসাধারণের সেবার জন্য নিবেদিত। তাঁর প্রেরণায় অজস্র মাদ্রাজবাসী নিজেদের দেশের এবং দশের কার্যে নিবেদন করলেন। তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলল। তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন তাদের, “তোমরা

নিজের সুখ এবং মোক্ষের কথা না ভেবে সমগ্র জাতির মুক্তির কথা ভাব। সকলের মুক্তি না হলে নিজের মুক্তি চাওয়া স্বার্থপরতা।"

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস তখনও শৈশবের শিশুশয্যায়। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস সর্বভারতীয় গণপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল স্বামীজির তিরোধানের বহু বৎসর পরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বামীজি যখন কম্বুকণ্ঠে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলবার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তখন কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের কাছে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে কিছু সাহায্য মাত্র চেয়েছিল। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী তখনও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মনে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি। এই দিক থেকে বিচার করলে স্বামীজিকেই গণ-আন্দোলনের প্রধান এবং প্রথম পুরোহিত বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে পুরুষসিংহ সুপ্ত হয়ে রয়েছে কিন্তু সে সিংহকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

"বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি
কি শিখানু তারে?"

দীর্ঘকাল বাঘ ভেড়ার দলে মিশে মনে করেছিল সেও ভেড়া হয়ে গেছে। একদিন আর একটি বাঘ বাঘের বাচ্চাটিকে জোর করে ধরে নিয়ে একটা কুয়োর কাছে নিয়ে গেল। তারপর বললে, "ছ্যাখ, আমার যে রকম মুখ, তোরও সেরকম মুখ। আমার গায়ে যেরকম ডোরা কাটা দাগ, তোরও সে রকম ডোরাকাটা দাগ। আমি যেরকম গর্জন করি তুইও সেরকম গর্জন করতে পারিস। তবে তুই কেন নিজের স্বভাব, নিজের জাতিকুল ভুলে গিয়ে ভেড়ার মতন 'ম্যা ম্যা' কচ্ছিস আর তাদের সঙ্গে ঘাস খাচ্ছিস?" ভারতবর্ষের জন-সাধারণ বাঘের বাচ্চার মতন নিজের স্বভাব ভুলে গিয়েছে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে তারাও অমৃতের সন্তান, তাদের মধ্যেও দেবতার মঙ্গল আরতি হচ্ছে।

আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর দুই গুরুভাই—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হল। গুরুভাই দুজন তখন আবু পাহাড়ে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন। নরেন তাঁদের কাছে আমেরিকার ধর্মসভার কথা বললেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বললেন, "ভাই হরি, তোমাদের এই ধর্ম-কর্ম ধ্যান-ধারণা আমি বুঝতে পারি না।" মুখে তাঁর বিষাদের আভাষ, কণ্ঠে কারুণ্য। "ভাই, ধর্ম-কর্ম কতটুকু শিখেছি জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝেছি যে মানুষকে ভালবেসে মনটা ভবে উঠেছে।"

আমেরিকায় চলে এলেন নিঃসম্বল স্বামীজি। সেখানে বহু বাধা-বিপত্তির সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল। যখন তিনি শিকাগোর ধর্মসভায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে 'ভ্রাতৃ ও ভগিনীবৃন্দ' বলে সম্বোধন করেছিলেন তখন বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথাই তাঁর মনে জাগরূক ছিল। এক মুহূর্তে আমেরিকাবাসীর সঙ্গে তিনি পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মৈত্রী ও প্রীতির রাখীবন্ধন তিনি পরিয়ে দিলেন আমেরিকা-বাসীদের হাতে, যাদের ধর্ম আলাদা, ভাষা আলাদা, যাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী আলাদা।

১৮৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ধর্মসভায় স্বামীজি বলেছিলেন, —"তোমরা খৃষ্টানেরা, বিধর্মী পৌত্তলিক ভারতবাসীদের কাছে তাদের আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠাও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তোমরা ক্ষুধার হাত থেকে তাদের দেহকে রক্ষা করবার জন্য কোন প্রচারক তো পাঠাও না। ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার লোক না খেয়ে মারা যায়। কিন্তু তোমরা খৃষ্টানেরা তা শুনেও কিছু করনি। তোমরা ভারতে সর্বত্র যীশুখৃষ্টের নাম প্রচারের জন্য গীর্জা নির্মাণ করে অজস্র অর্থব্যয় করেছ, কিন্তু এটুকু তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে আজ প্রাচ্যে ধর্মের প্রয়োজন নেই। তাদের যথেষ্ট ধর্ম রয়েছে। আজকে বেদনাক্লিষ্ট বুভুক্ষু ভারতবাসীর প্রয়োজন এক টুকরো রুটি। তোমাদের কাছে তারা ক্ষুধার অন্ন

ভিক্ষা করেছে। তোমরা তাদের অন্নের পরিবর্তে শুকনো পাথর দিয়েছ। আজকে বুভুক্ষু ভারতবাসীর কাছে ধর্ম প্রচার করা তাদের চরম অপমান। ভারতবর্ষে যদি কোন পুরোহিত অর্থের বিনিময়ে ধর্ম শিক্ষা দেয় তবে সে ব্রাত্য হবে এবং জনসাধারণ তার দিকে থুতু ছুঁড়ে দেবে। আজ আমি আমার দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশবাসীর জন্য সাহায্যপ্রার্থী।"

স্বামীজি যে বিপুল সংবর্ধনা আমেরিকায় পেয়েছিলেন তাতে যে কোনও লোক আদর্শভ্রষ্ট হয়ে যেত।

কিন্তু স্বামীজি আদর্শনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। সুখে-দুঃখে অচঞ্চল থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। একদিন স্বামীজি আমেরিকার রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে পরিচিত কেউ নেই। আমেরিকা বর্ণ বিদ্বেষের দেশ। একটা হোটেলে তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। হোটেলের ম্যানেজার বললে, "এখানে নিগ্রোদের স্থান হবে না।" স্বামীজি ভুলেও বললেন না যে তিনি নিগ্রো নন। পরদিন হোটেলের ম্যানেজার যখন জানতে পারলে যে রাতের অতিথি ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তখন আর তার লজ্জার সীমা-পরিসীমা রইল না। সে স্বামীজিকে বললে, "আপনি ভারতবাসী তা আমাকে কেন বলেননি?" স্বামীজি ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিলেন—"তুমি কি মনে কর আর একটা জাতিকে ছোট করে আমি বড় হব?"

স্বামীজি এক ধনী আমেরিকাবাসীর গৃহে অতিথি। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁকে শুতে দেওয়া হয়েছে। আরামের আবেশে স্বামীজি চোখ বন্ধ করেছেন। হঠাৎ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন। তাঁর মনে হল, আমি এই সুখশয্যায় শুয়ে আছি আর আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর এক মুঠো অন্ন জোটে না। তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো ছেড়া কাপড় পর্যন্ত নেই। আকাশের নীচে তারা আশ্রয় খোঁজে। চোখের জলে তাঁর বালিশ ভিজে যেতে লাগল। সুখশয্যা ছেড়ে তিনি খালি মেঝেতে শুয়ে

পড়লেন। বাইরে বরফ পড়ছে। মেঝেতে তুহিনের স্পর্শ। কিন্তু তাতে স্বামীজির ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার দেশ! আমার দেশ!"

আমেরিকায় শত সহস্র কাজের মাঝেও মন তাঁর পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষে। বিদেশ থেকে তিনি যে সব পত্র তাঁর ভক্ত, বন্ধু ও গুরুভাইদের কাছে লিখেছেন তাতে স্বামীজির জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কখনও অনুরোধ করে, কখনও ব্যঙ্গ করে, কখনও কশাঘাত করে তিনি তাঁর দেশবাসীকে জাগাতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য দেশ সমৃদ্ধির পথে, আর ভারতবর্ষ শুধু অতীতের গৌরব নিয়ে বড়াই করছে। তাই স্বামীজি তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল ও অন্যান্য মাদ্রাজী বন্ধুদের কাছে লিখলেন— "আর তোমরা কি ক'রছ? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোওগে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তি ক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকীর গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বলো দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ? ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব ক'রছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশেপাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ

—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?”

জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি মাদ্রাজবাসীদের আহ্বান করলেন। বাংলা দেশ স্বামীজিকে প্রথম অবস্থায় স্বীকৃতি দেয়নি। মাদ্রাজেই তিনি প্রথম অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজের দরিদ্র জনসাধারণ তাঁকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেছিল। তাই তাদের উদ্দেশেই তিনি বললেন, “এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোক-গুলো কখনো শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কোন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাঁদের উদ্ভব। আগে তাদের নির্মূল কর! এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

“ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য প্রাণপণ যত্ন সহকারে, মাদ্রাজ এমন কি কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণেব অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের

মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ?" এ মামুলী উপদেশ নয়। হৃদয় থেকে উৎসারিত এই বাণীতে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর দরদ, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা।

আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামীজির একটি নারী কারাগার দেখার সুযোগ হয়েছিল। ভারতবর্ষে কারারুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করা হয়। সামান্য অপরাধের জন্য পশুর মত অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। মানবাত্মা সেখানে লাঞ্ছিত। সেই তুলনায় আমেরিকার কারাগার স্বর্গের মত। তারা কারাগারকে কারাগার না বলে সংশোধনাগার বলে। কারাকর্তৃপক্ষ কয়েদীদের সঙ্গে মানুষের মত সদয় ব্যবহার করে। স্বামীজি তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখলেন—"ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দু-ধর্ম তো শিখাইতেছে জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার

আত্মারই, বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন তোমাদিগকে গরীবের জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে, কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না। তোমাদের পুরোহিতগণ—ভগবান ভ্রান্ত মত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে কিন্তু অসুর আমরা। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহারা নহে। আর যেমন ইহুদীরা যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমস্ত জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, যেরূপ তোমরাও যে কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছ, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ! তোমরা জান না যে অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। দু-ই এক কথা।" সর্বপ্রকার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দেবার সুস্পষ্ট ঘোষণা। খাঁটি ধর্ম থেকে পুরোহিতকুল ভ্রষ্ট। ধর্ম যখন মোহবেশে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে আর ধর্ম নয়। সে ধর্ম মানুষকে লাঞ্ছিত করার অস্ত্র।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শশধর তর্কচূড়ামণির মত হিন্দুধর্মের বিকৃতিকে তিনি কখনও প্রশংসা করতেন না। ধর্মের মোহান্ধতা তাঁর ছিল না। পুরোহিতেরা ধর্মের নামে যে অত্যাচার করেছে তাকে তিনি অকুণ্ঠভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। তাই তিনি লিখলেন—"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই।"

উচ্চপদস্থ বা ধনী ব্যক্তির উপর স্বামীজির বিশ্বাস ছিল না। কর্মোদ্যম তাহাদের নাই। আদর্শের বলিষ্ঠতা তাহাদের নাই। তাহারা আত্মসর্বস্ব। তাই স্বামীজি লিখলেন—"ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই। চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর—আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর স্বদেশের লোকেরাই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কী না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান অনন্ত শক্তিমান। আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি। কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায় স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি রাজপুরুষদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও তাঁহার নিকট সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। জীবন বলি তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ৩০ কোটী

ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর। যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।”

আমেরিকার ভোগবিলাসের মধ্যেও ভারতবর্ষের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রবল। কিন্তু ভারতবাসীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির মুক্তিও কামনা করেছিলেন। ধর্মসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকাবাসীদের “অমৃতের সন্তান” ও “অমৃতের অধিকারী” বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি তাঁর শ্রোতৃবৃন্দকে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন যে তারা পাপী নয়, তারা সকলেই অমৃতের অধিকারী। আমেরিকাবাসী সকলেই খৃষ্টান। তাদের বাইবেল বলেছে যে অ্যাডাম ও ইভের পাপের ফলে তারা সকলেই পাপী। চিরজীবন ধরে যে পাপ তারা করেনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। কিন্তু স্বামীজির কণ্ঠে নূতন এক বাণী তারা শুনল। যীশু যেমন ল্যাজারাস্‌কে মরণের ওপার থেকে নূতন জীবনের বাণী শুনিয়েছিলেন, স্বামীজিও সেই রকম আমেরিকাবাসীকে অন্ধকার নরকের বিভীষিকা থেকে নন্দন কাননে নিয়ে এলেন।

এই বক্তৃতা মানব-বন্দনার স্তোত্র। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন,—“তোমরা নিজেদের পাপী বল ? মানুষকে পাপী বলা চরম অপরাধ। মানুষের স্বভাবে রয়েছে স্বর্গের সুষমা। সুতরাং তোমরা সকলে সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে ওঠ। এতদিন পর্যন্ত নিজেদের ভ্যাড়া বলে কল্পনা করেছ। এখন মোহাবরণ তোমাদের ঘুচে যাক্।” আমেরিকা থাকাকালীন স্বামীজি তাঁর বিখ্যাত “কর্মযোগ” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে মাথা না খুঁড়ে বিশ্বের কর্মশালায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য স্বামীজি আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন—“কাজের জন্যই কাজ করা উচিত; নাম, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা বা স্বর্গে যাওয়ার প্রলোভনেও কাজ করা উচিত নয়। কর্মবীরেরা জানেন যে ভাল কাজ করলে তাতে সুফল নিশ্চয়ই হবে, কেউ কেউ আছেন যাঁরা

দরিদ্রের সেবা করেন এবং মনুষ্য সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহান্।

"আমাদের দেশে আমি একটি অজ্ঞ, নির্বোধ লোককে চিনতাম। তার কিছুই জানবার স্পৃহা ছিল না। সে পশুর মত জীবন যাপন করত। একদিন সে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'ঈশ্বরকে জানতে হলে ও মুক্তি পেতে হলে কি করা উচিত?' আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি মিথ্যা বলতে পার?' সে উত্তর করল, 'না'। তখন আমি বললাম, 'তাহলে তোমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস কর্তে হবে। নির্জীব, নিষ্ক্রিয় পশু অথবা শুষ্ক কাঠ হওয়ার চেয়ে মিথ্যে কথা বলা ভাল। তুমি নিষ্ক্রিয়—অন্যায় করতে হলেও যে কার্যক্ষমতা প্রয়োজন তা তোমার নেই'।

"সর্বপ্রকার নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করতে হলে—সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে বর্জন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে, ধর্মে, দর্শনে এবং কাজে দুর্বলতা অতিক্রম করবার বাণী রয়েছে। তোমরা যদি বেদ পাঠ কর তাহলে দেখতে পাবে এই অভীঃ মন্ত্র বারে বারে সেখানে উচ্চারিত হয়েছে। ভয় দুর্বলতারই নামান্তর।

"জনসাধারণের সেবা এটা আমাদের করতেই হবে। মানুষের উপকার করা জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ব্রত। মানুষের সেবা করা জীবনের পরম-সুযোগ। বাড়ীর তেতলা থেকে দরিদ্রকে ৫টি পয়সা ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে দরিদ্র-নারায়ণ তোমার দ্বারে উপস্থিত। তোমার কাছ থেকে দান পেয়ে তোমাকেই সে মানুষ করে তুলচে। যে গ্রহণ করে তার চেয়েও যে দাতা সে-ই বেশী আশীর্বাদ পায়। তুমি যে মানুষের উপকার করতে পাচ্ছ তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাক।"

স্বামীজির দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম একই সূত্রে গাঁথা। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন বলেই স্বদেশকে এত ভালবাসতে পেরেছিলেন। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে, স্বদেশকে ভালবাসলে অন্য

দেশকে ঘৃণা করতেই হবে। কিন্তু স্বামীজি তথাকথিত জাতীয়তা-বাদের দ্বারা কখনও বিভ্রান্ত হননি। যেখানেই মানুষের উপর উৎপীড়ন বা অত্যাচার হয়েছে সেইখানেই তিনি বরাভয় কণ্ঠ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

স্বামীজি আমেরিকা থেকে যে সব পত্র লিখেছেন তা মানব-প্রেমের পবিত্র হোমশিখায় প্রদীপ্ত। স্বামীজির দেশপ্রেমে ভাব-বিলাসের চিহ্নমাত্র নেই। স্বয়ং তিনি নিষ্কাম কর্মযোগী। তিনি চেয়েছেন বিশ্ববাসীকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করতে। আলাসিঙ্গা পেরু-মলকে তিনি লিখলেন—"কোন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার। কাজ কর, করে মর—এই হয় সার।" সাহস অবলম্বন কর। আমাদের ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ হইবে এই বিশ্বাস রাখো। ভগবান বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আব আমরা তাহা করিব। নিজদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখো। অর্থাৎ পবিত্র, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাসো। ভগবান তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল তাঁহারা তাহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া আছেন, আর যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজ-রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব। অধিকাংশ ভারতীয় নারী যতদূর শিক্ষার উন্নতি কল্পনা করিতে পারে—প্রতিটি মার্কিন নারী তদপেক্ষা অনেক অধিক

শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণকেও কেন না ঐরূপ শিক্ষিতা করিব? অবশ্যই করিতে হইবে।”

আমেরিকা থাকাকালীন স্বামীজি ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বহু সম্প্রদায়ের লোক নানা রকম অপপ্রচার সুরু করেছিল। খৃষ্টান মিশনারীর দল স্বামীজির প্রতিষ্ঠায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। খৃষ্টানদের দেশে একজন কালো চামড়ার পৌত্তলিক বিপুল সংবর্ধনা পাচ্ছে এটা তাদের কাছে অসহ্য। বিশেষ করে দীর্ঘকাল ধরে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকেরা আমেরিকার অধিবাসীদের কাছে এ কথাই বলে আসছিল, ভারতবর্ষ কুসংস্কার ও অশিক্ষার দেশ। সেখানে নারীদের উপর পশুর মত ব্যবহার করা হয়। সন্তানকে পুণ্যের লোভে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রকার নানা রকম অর্ধসত্য কখনও বা সম্পূর্ণ মিথ্যার দ্বারা আমেরিকাবাসীকে তারা বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। স্বামীজি এসে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দিলেন: তার ফলে নিজেদের সমাজের কাছেই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা ছোট হয়ে গেল। স্বামীজির গৌরব হ্রাস করার জন্য যে পন্থা তারা গ্রহণ করেছিল তা যীশুখৃষ্টের ধর্মের অনুমোদিত নয়। ইতিহাস কোন কিছুই ভোলে না। ইতিহাসের পাতায় একথা লেখা আছে যে স্বামীজিকে তারা বিষ দিয়ে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অপপ্রচারের চেয়েও অনেক বেশী ঘৃণ্য কাজ করেছিল স্বামীজির দেশবাসী ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে অজ্ঞাত অখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দকে ছোট করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী তুলে ধরবেন। কিন্তু তিনি হারিয়ে গেলেন ভিড়ের মাঝখানে। আর সেইখানে জ্বলন্ত পাবকশিখার মত পূতচরিত্র স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রতাপচন্দ্র তখন দেশে-বিদেশে স্বামীজির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে সুরু করলেন। যিনি সাক্ষাৎ শিব সেই বিবেকানন্দের চরিত্রের উপর তিনি

কলঙ্ক লেপন করলেন। স্বামীজির কোন বিশিষ্ট আমেরিকাবাসী বন্ধুর কাছে বেনামীতে প্রতাপচন্দ্র চিঠি লিখিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রহীন, তোমার বাড়ীতে স্ত্রী ও কন্যা রয়েছে। তোমার বাড়ীতে স্বামীজির প্রবেশ নিষেধ করে দাও"। কিন্তু স্বামীজির বন্ধু এ চিঠিতে এতটুকু মূল্য দিলেন না। তিনি জানতেন যে অগ্নি-শিখায় কখনও কালিমার স্পর্শ লাগতে পারে না।

প্রতাপচন্দ্র তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে রামকৃষ্ণদেব ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য সুরু করলেন। স্বামীজি তাঁর নিজের নিন্দা ও স্তুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু যেখানে তাঁর দেশের সম্মান, তাঁর ধর্মের সম্মান বিপন্ন সেখানে তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। কোন এক সময় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সে সময় তিনি রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একখানা বইও লিখেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি পেয়েছিলেন মনের শান্তি, আত্মার আরাম। আজ সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণদেব ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করলেন। স্বামীজি কলকাতা থেকে প্রতাপচন্দ্র কর্তৃক লিখিত রামকৃষ্ণ জীবনী আনিয়ে আমেরিকাবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন যে প্রতাপচন্দ্র অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নিজের দেশের ধর্মকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বামীজি একাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার যুগে যুগে হয়ে এসেছে। কিন্তু সেই অপপ্রচার ক্ষণিকের মেঘ। স্বামীজির বিরুদ্ধে যে কুৎসার কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তা স্তব্ধ হয়ে গেল। একদিন স্বামীজিকে একটি আমেরিকাবাসী শিশু প্রশ্ন করেছিল,—'ভারতবর্ষ কোথায়?' স্বামীজি তাকে একটি পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে আসতে বললেন। তখন ভারতে ইংরেজ শাসনের যুগ। স্বামীজি শিশুটিকে দেখালেন ভারতবর্ষের মানচিত্র। ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি লাল চিহ্নাঙ্কিত। শিশুটি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল

—'তোমাদের দেশ লাল কেন?' স্বামীজির বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি শিশুটির পিতামাতাকে বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ভারতবর্ষের মানচিত্র ইংরেজ কুশাসনের রঙে রাঙা। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের পীড়িত হৃদয়ের ক্ষত থেকে ঝলকে ঝলকে যে রক্ত বেরুচ্ছে সেই রক্তে ভারতবর্ষের মানচিত্র রক্তিম।"

আমেরিকার সম্পদ্ দেখে স্বামীজি এতটুকুও ঈর্ষান্বিত নন। তিনি দেখলেন যে অধিকাংশ আমেরিকাবাসী বিত্তশালী। তাদের তুলনায় ভারতবাসী চরম দারিদ্র্যের পঙ্কশয্যায়। স্বামীজি বেদনাক্লিষ্ট চিত্তে তাঁর গৃহীভক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখলেন, "আমেরিকাবাসীরা কর্মবীর। যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমাদের মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচবে না।"

"দ্বিতীয়, দরিদ্র লোক, যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, oppor- tunities (সুবিধা) আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব। কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের

মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর দূর কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত পদদলিত দরিদ্র গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ--আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।"

সেনাপতি যেরূপ সেনানীবৃন্দকে আদেশ দেন স্বামীজিও ঠিক সেই রকম তাঁর অগণ্য শিষ্যদের দেশের সেবায় আত্ম-উৎসর্গ করার জন্য আদেশ দিলেন—'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'। স্বামীজি নিজে কর্মবীর। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের বিরাট কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর পত্রাবলীতে রয়েছে শৌর্য ও বীর্যের মন্ত্র। আর রয়েছে উৎসাহ এবং আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলবার মহাস্ত্র। মাদ্রাজে কাজ শুরু হয়েছে শুনে স্বামীজির আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু ক্ষণিকের আবেগে স্বামীজির বিশ্বাস নেই। বারে বারে তিনি মাদ্রাজী শিষ্যদের উৎসাহিত করে চলেছেন। তাদের উদ্দেশে তিনি লিখলেন—

"দৃঢ়ভাবে কার্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো। কাজে লাগো। দুই দিন আগেই হউক আর পরেই হউক, আমি আসিতেছি। আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে এক বিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।' মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কার-কার্যেই

আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না। উহা নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ।

"আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ।"

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজির ভারতবর্ষের নানা স্তরের অধিবাসীদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সবার কাছেই আজ সহায়তা প্রার্থনা করেছেন। সকলকেই নূতন কর্মপথে উদ্বুদ্ধ করছেন। জনৈক রাজার দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখলেন—"আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।"

তখনও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজির মনে জাগেনি। কিন্তু সকল গুরুভাইকে তিনি ত্যাগের মন্ত্রে, অশোক মন্ত্রে, অভীঃ

মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখিলেন—"ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুতমার্গ', খালি 'আমায় ছুয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু' হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে। ডানদিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং 'ফট্ ফট্ স্বাহা' 'ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ' করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? 'কালঃ সুপ্তেষু জাগতি কালো হি দুরতিক্রমঃ' (সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)।" তিনি জানছেন তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা!

"যে দেশে কোটী কোটী মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য।"

* * * *

"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলো সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে —কোন কাজ করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা

কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফলকথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নেই।

"We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them underfoot. Again the force to raise them must come from inside i.e., from the orthodox Hindus. In every country, the evils exist not with but against religion. Religion, therefore, is not to blame, but men."

স্বামীজি শুধু তাঁর দেশবাসীকেই জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা নয়। তিনি আমেরিকার কঠিন জড়বাদের প্রস্তরের উপরেও আঘাত হেনে জড়বাদীদেরও মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবার আহ্বান জানালেন। রকফেলার ছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট ধনী। তিনি তাঁর বন্ধুদের উৎসাহের আতিশয্যে একদিন খবর না দিয়েই স্বামীজির পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। স্বামীজি তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, তিনি যে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন তা তাঁর নিজের ভোগে ব্যয় না করে মানুষের সেবার জন্য ব্যয় করা কর্তব্য। ঈশ্বর রকফেলারকে যে বিপুল অর্থ দিয়েছেন তার তিনি অছি মাত্র। রকফেলার জীবনে এমন কথা শোনেন নি। তখন তিনি দাম্ভিকতায় ভরপুর। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে স্বামীজির ঘর থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। তার প্রায় সাতদিন বাদে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে

আবার স্বামীজির কাছে নিয়ে এলো। রকফেলার স্বামীজির দিকে একখানা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন। সেই কাগজে রয়েছে রকফেলার জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থ সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারই প্রতিলিপি। রকফেলার জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজিকে, "আপনার কথামত আমি বিপুল অর্থ সাহায্য করেছি। আশা করি আপনি খুশী হয়েছেন। আমাকে এই দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।" স্বামীজি অবিচলিত ভাবে বললেন, "আপনার উচিত আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কারণ আমিই আপনাকে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছি!" একথা ভারলে অবাক লাগে যে রকফেলারকে বিশ্বের মানবের কল্যাণের জন্য অর্থ সাহায্য কর্তে স্বামীজিই অনুপ্রাণিত করেছেন। শুধু রকফেলার নয় আরও কত দেশী বিদেশী লোককে যে স্বামীজি মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

ভারতকে ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী করবার স্বামীজির ইচ্ছা ছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের বিশেষ কেউ শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবেননি তখন স্বামীজি যে সব পত্র লিখেছিলেন তাতে একথাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে যে শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত ভারতের অপরিমেয় দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা দূর করা যাবে না। একটা চিঠিতে তিনি লিখলেন—"খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরা ভারতবর্ষে যদি খৃষ্টধর্মের মহিমা প্রচার না করে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করেন তবেই দেশের যথার্থ মঙ্গল হতে পারে।" শিল্প শিক্ষা এবং শিল্প প্রসারের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা স্বামীজির মতে একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সুজলা সুফলা সত্য, কিন্তু শুধু কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে ভারতের কল্যাণ হবে না। স্বামীজি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিলেন যে সামান্য কয়েক শত বছরের মধ্যে আমেরিকার কি বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তরের মূলে রয়েছে আমেরিকার অসাধারণ শিল্পপ্রসার।

ঘরে বাইরে কোথাও স্বামীজির এতটুকু বিশ্রাম নেই। তিনি জন্ম থেকেই মায়ের কাজে বলিপ্রদত্ত। একবার স্বামীজি রামকৃষ্ণ-

দেবকে বলেছিলেন, "বাড়ীর অন্ন সংস্থানের একটু ব্যবস্থা করি তারপর আপনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে আপনার ব্রত উদ্‌যাপন করব।" রামকৃষ্ণদেব জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম নিষ্ঠুর হয়েছিলেন। তিনি সমবেত ভক্তবৃন্দের কাছে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"একজন বলেছিল যদি ১০ হাজায় টাকা পাই তাহলে বাড়ীর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে, তবে নির্ভাবনায় ঈশ্বরকে ডাকা যাবে।" সকলে হেসে উঠেছিলেন, তারা বুঝতে পারেন নি কার উদ্দেশ্যে এই বিদ্রূপবাণ। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে রামকৃষ্ণদেব আবার বললেন—"একটি মেয়ের ভীষণ শোক হয়েছিল শোক হলে আছাড় খেয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আছাড় খেয়ে পড়লে পাছে নাকের দামী নথটা ভেঙ্গে যায় তাই নথটা খুলে আঁচলে বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর অঝোরে কাঁদতে সুরু করল!"

স্বামীজির জীবনে এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাত তাঁকে মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে শিখিয়েছে। ৩৯ বৎসর মাত্র তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এতটুকু বিশ্রাম তাঁর মেলেনি। একটা উল্কার বেগে তিনি ছুটে চলেছিলেন এদেশ থেকে ওদেশে। মানব কল্যাণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করাই তাঁর জীবনে একমাত্র ব্রত। একদিন স্বামীজি তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন—"দেখ, ঠাকুর যাকে কালী বলেন, সেই কালী আমার ভিতরে ঢুকে গেছে। আমি একটু বিশ্রাম, একটু আরাম জীবনে পাইনি।"

স্বামীজি আমেরিকায় যে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্যও মানবের সেবা। তিনি জানতেন যে মানুষের সেবা শুধু অর্থ দিয়ে হয় না, মানুষকে যদি শুভ কর্ম-পথে চালিত করা যায়, যদি তার মোহ নাশ করা যায়, যদি তার হৃত মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে আনা যায়, যদি তার মধ্যে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ও ত্যাগ জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তাও মানব-প্রীতির প্রকাশ। দীর্ঘকাল আমেরিকাবাসী ধনমদমত্ত হয়ে ভুলে গিয়েছিল তারা অমৃতের সন্তান। স্বামীজি

বিভিন্ন সভায় শত শত বক্তৃতায় তাদের জাগিয়ে তুললেন জড়বাদের পঙ্কশয্যা থেকে।

আমেরিকার কল্যাণ সাধন কর্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের কল্যাণের কথা তাঁর মনে সদা জাগরূক। অতন্দ্র প্রহরীর মত সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি ভারতের কল্যাণের জন্য মায়ের মত স্নেহ নিয়ে জেগে আছেন। আলাসিঙ্গার সঙ্গে পত্রালাপ যথারীতি চলেছে। তাকে লিখলেন—"ভারতই আমার কর্মক্ষেত্র। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালতে হবে যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সময়ে সবই হবে।" আলাসিঙ্গাকে আবার লিখলেন—"আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি ; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি—"

হরিদাস বেহারীদাস দেশাইকে লিখলেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষ রোগগ্রস্ত। সমাজ সংস্কারকগণ ভারতবর্ষের ক্ষতটি কোথায় তা বুঝতে না পেরে সমাজ কল্যাণের বিধান দিয়েছেন। শুধু বিধবা বিবাহ দ্বারাই জাতির কল্যাণ সম্ভব হবে না। জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলাই জনকল্যাণের প্রশস্ত পথ, "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্য তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব-বোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

ভারতের বিরাট কর্মশালায় সকলেরই কিছু কিছু করবার আছে। জগন্নাথের রথ যে রকম রাজা থেকে আপামর জনসাধারণ সকলেরই টানবার অধিকার আছে, ঠিক সেই রকম ভারতের কল্যাণের জন্য রাজা মহারাজারও প্রয়োজন আছে! পরিব্রাজক জীবনে অনেক রাজার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। সকলেই তাঁর

শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলেও তাঁরা প্রত্যেকেই স্বামীজির অনুরাগী। ক্ষেত্রী, রামনাদ, আলোয়ার ও মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়েছে। মহীশূরের রাজাকে তিনি লিখলেন—"ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিদ্রগণ দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। আমাদের জনগণ ও রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা মানুষ। তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে।" জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস এই পত্রের প্রতিটি পঙক্তিতে পরিস্ফুট। স্বামীজি যখন বোলতেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তখন উপনিষদের এই মন্ত্রটি পুঁথির পাতাব বাইরে এসে ক্ষাত্রতেজ ধারণ করত।

শুধু হিন্দু ধর্মকে ভালবাসাই স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান তাঁর কাছে সকলেই সমান। ধর্মের নামে কোন সঙ্কীর্ণতাকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। ভারতবর্ষে দরিদ্রদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেকের একটা ভুল ধারণা

আছে যে, মুসলমান বাদশাহ ও নবাবেরা তরবারির সাহায্যে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে স্বামীজি বিচার করে দেখালেন যে যেখানেই জমিদারের সংখ্যাধিক্য সেখানেই মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। অধিকাংশ মুসলমান পূর্বে হিন্দু ছিল। জমিদারের অমানুষিক উৎপীড়নে এরা ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এই সর্বহারা, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য স্বামীজির সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তাদের সম্বন্ধে তিনি লিখলেন,—"এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী ব্যক্তি দ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের সুযোগ সুবিধা খুব বেশী নাই—একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা ত্রিশ কোটী নরনারীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে—এমন কি, বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।"

পরম বিস্ময়ের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্বে কোন সরকারী মার্কসবাদী স্বামীজির "বর্তমান ভারত" উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে, স্বামীজি সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল, কেন না, তিনি লিখেছেন, "নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই।" যেহেতু স্বামীজি "মুসলমান ভারতবাসী'র কথা লেখেননি সে জন্য স্বামীজি সাম্প্রদায়িক এবং যেহেতু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকে তোরাপ আলির কথা লিখেছেন সুতরাং তিনি প্রগতিবাদী। স্বামীজির এই চিঠিখানার মধ্যে অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। এবং এ সত্যও প্রমাণিত হয়েছে যে সরকারী মার্কসবাদী ভদ্রলোক

স্বামীজির উপর কলঙ্ক লেপন করবার চেষ্টা করে নিজের উপরই দুরপনেয় কলঙ্ক লেপে দিয়েছেন।

পূর্বোল্লিখিত চিঠির মধ্যেই স্বামীজি লিখলেন—"লোকে কি বলিল—সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি। তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মানুষের স্তুতি নিন্দায় আমি দৃকপাতও করি না, তাদের অধিকাংশকেই অজ্ঞ কলরবকারী শিশুর মতো মনে করি।" হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতি স্থাপন করা স্বামীজির জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যখন তিনি বলেছিলেন যে, তিনি চান প্রত্যেক মানুষ Islamic Body এবং Vedantic Brain লাভ করুক, তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই নিবেদিত হয়েছে। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন,—"যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে সাম্যের সমীপবর্তী হয়ে থাকেন তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী।" ভারতবর্ষের বহু মন্দির শূদ্রের কাছে, অন্ত্যজের কাজে রুদ্ধ। কিন্তু মসজিদের বিরাট প্রাঙ্গণে সমস্ত মুসলমানেরই সাদর আমন্ত্রণ। ছুতমার্গের প্রবল শাসনে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রিতের জন্য আলাদা পাতা পাতার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কোন মুসলমানের গৃহে অর্থনৈতিক ভেদ থাকতে পারে কিন্তু বিশেষ কোন সামাজিক ভেদ নাই। এই গণতান্ত্রিক রীতিনীতিটুকু মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্বামীজি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজি ভারতের তথা বিশ্বের নানাবিধ সমস্যা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর পত্রাবলীতে, তাঁর "ভাববার কথায়", "পরিব্রাজকে", "বর্তমান ভারতে" তাঁর "কলম্বো থেকে আলমোড়া

যাত্রাকালীন বক্তৃতামালায়” এবং আরও হাজার হাজার বক্তৃতায়। কিন্তু অনেকের কাছে বিস্ময়জনক মনে হয়েছিল যে স্বামীজি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। তার কারণ অনুধাবন করা কঠিন নয়। ইংরেজ শাসনের শেষ দিকেই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। চিরকাল ইংরেজ যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার নাম বিভেদ নীতি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দুস্তর এক ব্যবধান রচনা করেছিল ইংরেজ সরকার নিজেদের ভারতবর্ষে কায়েমী করবার জন্য। স্বামীজির জীবদ্দশায় এ সমস্যা ততটা জটিল হয়ে দেখা দেয়নি। হিন্দু মুসলমান তখন ঠিক একই বৃন্তে দুটি ফুলের মত না থাকলেও আজকের মতন পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করেনি। স্বামীজি হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে কম কথা বলেছেন সত্য। কিন্তু যেটুকু বলেছেন তাতে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাই।

একবার স্বামীজির সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর মহুলা ও সারগাছিতে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমে মুসলমান ছেলেদের নেওয়া হবে কি না। স্বামীজি উত্তরে লিখেছিলেন যে, মুসলমান ছেলেদেরও সাগ্রহে নেওয়া হবে, কিন্তু তাদের ধর্মের উপর যেন কোন কারণেই হস্তক্ষেপ না করা হয়। তাদেরও চরিত্রে, ত্যাগমাধুর্যে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে হবে। স্বামীজি লিখেছিলেন, “সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঠিক মর্ম কথাটি ইহারা কখনও বুঝিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে।”

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদান্তের ক্লাস নিলেন স্বামীজি। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটু সেতুবন্ধ রচিত হল। আমেরিকা থেকে তিনি চললেন ইংল্যাণ্ড।

> “যে নদী হারায়ে পথ চলিতে না পারে
> সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।”

স্বামীজি বিশ্বাস করিতেন যে আচারের বেড়া দেয়া হয়েছে বলেই ভারতের এই অবনতি। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখলেন—"আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।"

মাদ্রাজের ভক্তগণ স্বামীজির আদর্শকে ধ্রুবতারা করে এগিয়ে চলেছে। ভক্তদের কৃতকার্যতায় স্বামীজির আনন্দের সীমা নেই। যে কর্মোদ্যম তাদের ভিতরে দেখা দিয়েছে তা কিছুতেই থিতিয়ে দেওয়া চলবে না। স্বামীজি তাই তাদের লিখলেন—"পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা ৯০ জন নর-পশুই মৃত, প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদ-পদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও; এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি, এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। বৎস ভয় পাইও না। উপরে তারকাখচিত সমস্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না,

নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।”

স্বামীজি রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়েননি। কিন্তু কংগ্রেসের শৈশবকালে রাজনীতিবিদ্‌রা যা কখনও চিন্তাও করেননি সেই ভারতের সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার স্বপ্ন স্বামীজির দৃষ্টি-প্রদীপে ধরা দিয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন—“স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।”

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও একান্ত প্রয়োজন। তৎকালীন চিন্তানায়কগণ ইংরেজ সরকারের কাছে সামান্য একটু সুখ সুবিধা পাবার জন্যই একান্ত লালায়িত ছিলেন। তাঁদের না ছিল বলিষ্ঠতা, না ছিল কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কোন কোন চিন্তানায়ক দাস্য সুখে হাস্যমুখ হয়ে বিনীতভাবে ইংরেজ সরকারের পাদুকালেহন করেছিলেন। আর তথাকথিত প্রগতিবাদীরা কয়েকটি ভাল চাকরি পেলে খুশী হয়ে উঠতেন। রক্ষণশীল সমাজ ঘরে বসে পূর্বপুরুষ আর্যদের অহংকারে স্ফীত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা—একমুঠো অন্নের ব্যবস্থা করবার কথা কেউই ভাবেননি। কিন্তু স্বামীজি সর্বপ্রকার স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন। বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। সর্বদেশে, সর্বকালে শোষকেরা যেরূপ অত্যাচার ক'রে এসেছে, ভারতবর্ষেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়-নি। স্বামীজি তাঁর এক পত্রে লিখলেন—“অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে

হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন। আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতে স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ভক্তেরা স্বামীজির সঙ্গে যোগ রেখেছেন। যখনই কোন অসুবিধায় পড়ছেন তখনি স্বামীজির কাছ থেকে পথ-নির্দেশ ভিক্ষা করছেন। স্বামীজির ভয় হোল যে তাঁর গুরুভাইয়েরা কেউ কেউ হয়ত বা গতানুগতিক ধ্যান ধারণা পূজা-আচ্চার মধ্যেই নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলবেন। রামকৃষ্ণানন্দকে ভর্ৎসনা করে তাই লিখলেন—"আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল, পরশু তার উপর চামর হ'ল, আজ খাট হ'ল, কাল কাঠের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হ'ল আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে

না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়—তাদেরই নাম হতভাগা ; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া, জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবন বিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট তাঁর স্বরাট। বিরাট রূপে এই জগৎ, তাঁর পূজো মানে তাঁর সেবা—এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ সব বিচারের নাম কর্ম নয় ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্ঠির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বাইয়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে থাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে—একথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশ-ময়।”

একই বাণী ধ্বনিত হল তার প্রায় প্রত্যেকটি পত্রে! মাদ্রাজ এবং বাংলা এরাই প্রথম স্বামীজির বাণী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখনও স্বামীজির উপদেশ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝড়ো হাওয়ায় যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেইরকম স্বামীজি তাঁর অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন মাদ্রাজে ও বাংলায়। মাদ্রাজ এবং বাংলা সম্পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ হ'লে অন্যান্য দেশেও আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে। তাই মাদ্রাজের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে আবার লিখলেন —“এস আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদ-

দলিতদের জন্য প্রার্থনা করি; দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করিতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না,—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি।

এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখছি; আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্ত মোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু ক'রে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি—কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়তো আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটি চিন্তাও কখন নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ কর্তে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও! যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দরিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে

মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটী লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করছে।"

বিশ্বের সকলের মুক্তি না হলে নিজের মুক্তি চাওয়া চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। কিন্তু দীর্ঘকাল রক্ষণশীল ভারতে মানুষেরা ধর্মসাধনা করেছে শুধু নিজেদের মুক্তির জন্য। বামাচার ও ছুৎমার্গের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম সীমাবদ্ধ। বেদ উপনিষদের শাশ্বত বাণী ভুলে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে মানুষ ধর্ম খুঁজছে। তাই স্বামীজি আহ্বান জানালেন মানুষের মনকে প্রসার করার জন্য। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, প্রসারের মধ্যেই রয়েছে জীবনের স্ফুরণ, সংকোচনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা। বিশ্বকে ভালবাসাই মুক্তির উপায়। সমাজে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকের মিল না থাকতে পারে কিন্তু প্রাকৃতিক বৈষম্য সত্ত্বেও সকল মানুষকে সমান সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার স্বপক্ষে স্বামীজি বরাবর বলেছেন। সমাজের উচ্চ-বর্ণেরা জীবনে প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে থাকে, আর অধিকাংশ লোক এতটুকু সুযোগ পায় না। তাই স্বামীজি বললেন, "দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—এরাই তোমার ঈশ্বর হোক।"

স্বামীজির স্বদেশপ্রেমে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। তাই সমদর্শীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যেই নারায়ণ। তিনি লিখলেন—"ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে "মানুষ" বলিয়া অভিহিত করে আমরা সেই নারায়ণেরই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জল

সেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?

ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সমাজ সংস্কারকের জন্ম হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁদের দান অনস্বীকার্য। কিন্তু তাতে কিছু দরিদ্রের হয়তো অন্ন সংস্থান হয়েছে, কিছু সতীর হয়ত স্বামীর চিতায় পুড়তে হয়নি, কিছু বিধবা হয়তো দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সুযোগ পেয়েছে। এর মূল্য নিঃসন্দেহে প্রচুর কিন্তু সমগ্র জাতিকে এই সমাজ সংস্কারকগণ মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। স্বামীজি তাই আমূল সংস্কারের স্বপক্ষে ছিলেন। কাপড় যদি শতছিন্ন হয়ে যায়—তাহলে তাতে অজস্র তালি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে নূতন কাপড়ের প্রয়োজন। স্বামীজিও তাই সমাজের লক্ষ লক্ষ ক্ষততে অষুধ না দিয়ে পুরোনো, পচা, গলা সমাজকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে নূতন সমাজের ইমারত গড়তে চেয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে তিনি লিখলেন—"আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলি মাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ"

সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে স্বামীজি পাপ পুণ্যের বিচার করতেন না। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। সকল মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার মন্দির খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষকে ভালবাসতে হবে তার পুণ্যের জন্য নয়। মানুষকে ভালবাসতে হবে মানুষ ব'লে! চৈতন্য মহাপ্রভু যেরকম জগাই মাধাই দুই মাতালকে কোল দিয়েছিলেন, নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র যেমন গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, পাষাণী অহল্যার বুকে পদস্পর্শ ক'রে তাকে চিন্ময়ী ক'রে তুলেছিলেন,

যীশুখৃষ্ট যেরকম বারবনিতা মডলিনকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন, ঠিক, সেই রকম স্বামী বিবেকানন্দ বেশ্যাদের পর্যন্ত মায়ের মত ভালবেসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কোন এক সময় তথা-কথিত ভদ্রলোকেরা বেশ্যাদের আগমনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজি আমেরিকা থেকে এই খবর পেয়ে বলেছিলেন "বেশ্যারা যদি দক্ষিণে-শ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায়, তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।"

"আমাদের মহাজগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।" রামকৃষ্ণানন্দের উদ্দেশে লিখলেন—"যাহারা ঠাকুর ঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরীব, ছোটলোক ভাবে; তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক, তাঁর অবারিত দ্বার। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a richman to enter the Kingdom of God.'

ইংল্যাণ্ডে স্বামীজি এলেন বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে। দিনে দিনে তাঁর শিষ্য ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল, এই সময় তাঁর কাছে এলেন 'কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল'। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাণীটুকু কুমারী নোবেলের কাছে এক নূতন জগতের বারতা নিয়ে এল। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছেন। কেউ কারুর চেয়ে ছোট নয়। কুমারী নোব্‌ল একটি পরম নমস্কারে স্বামীজিকে নিজের গুরু বলে

গ্রহণ করলেন। নিবেদিতাও স্বামীজির জ্বলন্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ, বিশেষ ক'রে অশিক্ষিতা নিগৃহীতা নারী-সমাজকে জাগিয়ে তোলবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করলেন। স্বামীজি বজ্রনির্ঘোষে যে মানবতার বাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে নিবেদিতার সমস্ত মন, প্রাণ, চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। স্বামীজি যখন নিবেদিতাকে বললেন—"আমার কথা বলতে গেলে, আমি স্বদেশ-বাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে নিয়োজিত হয়েছি তা সুসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে পৃথিবীতে ২০০ বার জন্মগ্রহণ করব।" ইংরেজ জাতি ভারতবাসীর চেয়ে অনেক কম ভাবালু। কিন্তু স্বামীজির হৃদয় থেকে উৎসারিত এই বাণী কুমারী নোবেলের মর্মস্পর্শ করেছিল। তাঁর ধর্ম আলাদা, ভাষা আলাদা, পরিবেশ আলাদা, সাংস্কৃতিক পটভূমিকা আলাদা, কিন্তু স্বামীজির আহ্বানে তিনি তাঁর সমস্ত অতীত ভুলে গিয়ে ভারতের মাটিতে একটি শুভ্র ফুলের মত নবজন্ম গ্রহণ কর্তে চাইলেন। কিছুদিন বাদে স্বামীজি আবার আমেরিকা গেলেন। তিনি কুমারী নোবেলের উদ্দেশ্যে লিখলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারত-এর কাজে তুমি সাফল্য লাভ করবে। ভারতের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন যথার্থ সিংহিনীর প্রয়োজন।" দূর থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ দুরকম ভুল করে থাকে। একদল ভাবে ভারতবর্ষ কুসংস্কার, দরিদ্র, অশিক্ষা ও বর্বরতার দেশ। আর একদল মনে করে, ভারতবর্ষ সোনার দেশ। তা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। পাছে কুমারী নোবেলের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন মোহজাল, কোন কুহক রচিত হয়ে থাকে তাই স্বামীজি প্রথমে তাকে সাবধান করে দিলেন—"এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কিদৃশ তাহা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে আসিবার পর তুমি নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইবে। তাহাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগকে ভয়েই হউক বা ঘৃণায় হউক

এড়াইয়া চলে, এবং তাহারাও ইহাদিগকে তীব্র ঘৃণা করে—যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস কর তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।”

ভারতবর্ষের কাজে, স্বামীজির কাজে, উৎপীড়িতদের কাজে কবে যেতে পারবেন কুমারী নোবেলের তাই একমাত্র স্বপ্ন। নিজের সমাজ সংসার সমস্ত ত্যাগ করে কুমারী নোবেল এলেন ভারতবর্ষে। সেইখানে তিনি ভারতবর্ষের কাজে নিবেদিতা হলেন বলেই তাঁর নাম হল নিবেদিতা। স্বামীজি তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে বললেন—“যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।” স্বামীজির জীবনের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বামীজি মানবকল্যাণের জন্য ভারতে যে বীজ রোপণ করেছিলেন নিবেদিতার প্রবল কর্মশক্তির সাহায্যে সেই বীজ একদিন পত্রে পুষ্পে, বর্ণে গন্ধে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে, চৈতন্যের মহিমায় মহীয়ান্ হয়ে উঠল। সেহেতু স্বামীজির ভারতবর্ষের মানবকল্যাণের জন্য যে দান সে সঙ্গে নিবেদিতার দান একই সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “লোকমাতা”, অরবিন্দ বলেছিলেন “শিখাময়ী’, অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“মহাশ্বেতা” আর স্বয়ং নিবেদিতা নিজেকে বলতেন “আমি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা”। তাই স্বামীজির আরব্ধ কাজ নিবেদিতা সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে নিবেদিতার অবদানকে স্বামীজির অবদান বলেই গ্রহণ করতে হবে।

স্বামীজি যখন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে দেহরক্ষা করলেন তখন মঠের সন্ন্যাসীরা প্রার্থনারত, কিন্তু নিবেদিতার প্রার্থনা করারও সময় নেই। তিনি শুধু বললেন—“স্বামীজি আমাকে যে কাজের ভার দিয়ে গেছেন সে কাজ আমাকে শেষ কর্তেই হবে।” স্বামীজিকে কোন বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। একদিকে যেমন তিনি

বেদান্তের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্রও তিনি ছিলেন। যাঁরা স্বামীজিকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে গ্রহণ করেছেন তাঁরা দেখেছেন স্বামীজির অপূর্ব ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। আবার যারা—

"শুনেছে কানে তোমার আহ্বান বাণী
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে, সংকট আবর্তমাঝে দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত,"

তাঁরা স্বামীজির কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্র শুনতে পেয়েছেন। সেই বিপ্লব-বাদীরা চিরকাল স্বামীজিকে তাঁদের গুরু বলে শ্রদ্ধা করে এসেছেন। নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ, বাঘা যতীন, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং সহস্র সহস্র নামকরা আর নাম নাজানা বিপ্লবী স্বামীজির বাণীর মধ্যে পেয়েছেন বিপ্লবের মহামন্ত্র। স্বামীজির দেহরক্ষার পর নিবেদিতাই প্রথম চেষ্টা করলেন স্বামীজির বিপ্লবাত্মক বাণীকে বাস্তবে রূপদান কর্তে। স্বামীজি বিপ্লবের গুরু, তা রাজনৈতিক নয়, সে বিপ্লব 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক ভাবের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতাই ১৯০২ সালে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিবেকানন্দ সোসাইটির উদেশ্য ছিল বিবেকানন্দের মানবতার বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। স্বামীজির অন্যতম ভক্ত 'ওকাকুরা' বললেন—"Vivekananda is dead, but he has left his spiritual daughter to lead you. Listen to her, rally round her." স্বামীজির মানসী কন্যা নিবেদিতা স্বামীজির বাণী ছড়িয়ে দিলেন দেশে বিদেশে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন—"ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত

সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।” মানুষকে সত্য করে ভালবাসার মন্ত্রটুকু স্বামীজিই নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন।

শুধু নিবেদিতা নয়, বহু বরেণ্য, বহু মনীষী গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করে গিয়েছেন যে, স্বামীজি ভারতের মুক্তিযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যে মুহূর্তে শুনলেন, স্বামীজি দেহ ত্যাগ করেছেন তিনি পাগলের মত ছুটে এলেন বেলুড় মঠে। তখন স্বামীজির নশ্বর দেহ চিতার উপরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই লেলিহান শিখার একটি স্ফুলিঙ্গ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কেশস্পর্শ করে তাঁকে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। তিনি স্বামীজির ভাবধারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিলেন। দেহরক্ষার ৬ মাস পূর্বে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি সেদিন বুঝেছিলেন বিশ্বমানবের জন্য স্বামীজির প্রাণ কতখানি বেদনাবিহ্বল। তিনি বলেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের অপরিসীম বেদনার প্রতিমূর্তি। স্বামীজির সঙ্গে লোক-মান্য বালগঙ্গাধর তিলকের পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দেশ উদ্ধারের জন্য কি কথাবার্তা হয়েছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু দুজনেই বৈদেশিক শাসন ও শোষণ থেকে ভারতকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন একথা ধারণা করলে আশা করি তা ভুল হবে না। শিবাজী উৎসব তিলকের প্রবর্তন, যে-শিবাজী বলেছিলেন ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন জাতিকে “এক ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিব আমি।” সেই শিবাজীর প্রতি স্বামীজির শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। ১৯০১ সালে কলকাতায় যখন শিবাজী উৎসবের আয়োজন হয়, তখন ইংরেজ সরকারের ভয়ে কেউ সভাপতিত্ব করতে রাজী হননি। স্বামীজির কাছে যখন বলা হল তখন ঝর ঝর করে তিনি কেঁদে ফেললেন! তিনি বলেছিলেন যে Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করা হোক। তিনি যদি সম্মতি না দেন, তখন স্বামীজিই সভাপতিত্ব করবেন।

শ্রীঅরবিন্দ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শক্তি ছিল তৎকালীন সমস্ত বিপ্লবাত্মক কাজের পিছনে। মহাত্মা গান্ধী সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না কিন্তু দেশের প্রতি তাঁর অকৃপণ ভালবাসা ছিল। তিনিও অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে বিবেকানন্দের রচনা থেকেই তিনি দেশকে আরও বেশী ভালবাসতে শিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বিশেষ কোন উক্তি করেননি। কিন্তু যেটুকু সামান্য বলেছেন তাতেই স্বামীজির দেশসেবা ও মানবিকতার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা সূচিত হয়। তিনি বলেছিলেন—"যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানতে হবে।" আবার তিনি বলেছিলেন—

"আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দারিদ্র্যের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এক-ঝোঁকা নয়, তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্গুলকে নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি।" বলেছিলেন, "দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।" একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়।

ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুতমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে! তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হ'তে পারে বলে ভয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের এই বাণী—সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়েই মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"

বিভিন্ন বিপ্লবী বীর ও চিন্তানায়কদের উদ্ধৃতি থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও স্বামীজির বাণী ও সাধনাই ছিল সমস্ত প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। স্বামীজির রচনার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে ছিল। ফাঁসীর মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে স্বামীজির রচনা ছিল জীবনবেদ। ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বোমাকে যতটা ভয় কর্তেন তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় কর্তেন স্বামীজির অগ্নিস্রাবী রচনাকে।

স্বামীজি যখন ইংল্যাণ্ডে প্রথম গিয়েছিলেন তখন ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণা ছিল। বিজেতার প্রতি বিজিতের এ বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে দেখলেন যে সেখানকার দেশবাসী তামসিকতার অন্ধকার থেকে রজোগুণের পথে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি ইংল্যাণ্ডকেও ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে ইংল্যাণ্ড বীরের দেশ, ক্ষত্রিয়ের দেশ, কর্মবীরের দেশ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে ভালবেসেছিলেন বলেই ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে কোন অপমানও সহ্য করেননি। ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভারতে এত কাপুরুষতা ও দুর্বলতা কেন, তার উত্তরে গৌরবের সঙ্গে স্বামীজি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ কখনও সাম্রাজ্য-লোলুপ নয়। ভারতবাসী নিজের দেশেই স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। অন্যের দেশের উপর দস্যুর মত হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলেই কি ভারতবর্ষ কাপুরুষ?"

ইংল্যাণ্ডে শৌর্যবীর্যের স্ফুরণ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজ জাতির সঙ্গে শৌর্যবীর্যহীন আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসীদের তুলনা নিশ্চয়ই করেছিলেন। ইংরেজদের তিনি প্রশংসা করলেন। তিনি ভাবলেন যে যদি ইংরেজ জাতিকে বেদান্ত ধর্মে উদ্বুদ্ধ করা যায়, যদি ইংরেজ জাতি স্বামীজির বলিষ্ঠ ভাবধারা গ্রহণ করে তাহলে তাদের মাধ্যমে এই ভাবধারা বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। ইংরেজদের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—"ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু কেন তাদের অধিক কৃপা করছেন, তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ, কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটি ভেঙ্গে দিতে পারলেই হল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।" স্বামীজির মানুষ তৈরী করার কাজে ইংল্যাণ্ডে শুধু ভগিনী নিবেদিতাকেই পাওয়া গিয়েছিল তা নয়। স্বামীজির স্টেনোগ্রাফার গুডউইনএর নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদি গুডউইন না থাকতেন বা স্বামীজির সংস্পর্শে না আসতেন তা হলে বিশ্ববাসী স্বামীজির সোনার চেয়েও দামী রচনা-বলীর সাতখণ্ড থেকে বঞ্চিত হত। কায়ার পিছনে যেমন ছায়া অনুসরণ করে তেমনি গুডউইন স্বামীজির সঙ্গে পশ্চিম থেকে ভারত-বর্ষ পর্যন্ত এসেছিলেন। স্বামীজির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা পর্যন্ত তিনি অনুলিখন করে রেখেছিলেন। স্বামীজির অন্যতমা শিষ্যা যোসেফাইন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানি যে প্রথমে প্রথমে গুডউইনকে তাঁর কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তার উত্তরে গুডউইন যা বলেছিলেন তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য। গুডউইন বলেছিলেন—"স্বামীজি যদি মানুষের সেবায় তাঁর সমস্ত জীবন সমর্পণ কর্তে পারেন, তবে আমি অন্ততঃ এতটুকু কাজ তাঁর হয়ে করে দিতে পারি।"

আমেরিকা থাকার সময় যোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামীজির সংস্পর্শে আসেন এবং একটি নমস্কারে তার সমস্ত দেহ মন স্বামীজির কাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা যেমন ভারতের জনসাধারণের সেবায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, যোসেফাইন ম্যাকলাউডও তেমনি ভাবে ভারতবর্ষকে সেবা করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজিকে লিখলেন যোসেফাইন ম্যাকলাউড—"আমি কি ভারতবর্ষে আসব ?" স্বামীজি উত্তর দিলেন—"হাঁ দুঃখ, দুর্গতি, দারিদ্র্য, নোংরা আবর্জনা ; নেংটিপরা লোক ধর্মের কথা বলছে—এ সব সত্ত্বেও যদি আসতে চাও, তবে এসো। অন্য কিছু যদি চেয়ে থাক তা হলে এস না। বিরুদ্ধ সমালোচনা আর আমরা সহ্য করতে পারি না।" যোসেফাইন ম্যাকলাউড ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করলেন। স্বামীজির ভক্ত আলাসিঙ্গার কপালে বৈষ্ণবের ফোঁটা তিলক কাটা দেখে শুধু স্বামীজির কাছে ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। স্বামীজি মনে করলেন যে ভারতবর্ষকে অপমান করা হয়েছে। অথচ বাস্তবিক-পক্ষে যোসেফাইন ম্যাকলাউডের মন্তব্যে কোন রূঢ়তা ছিল না। স্বামীজি তীব্রস্বরে বলে উঠলেন—"তোমাদের কিছু বলতে হবে না। তোমরা এতদিন কি করেছ ?" স্বামীজি স্বদেশকে এত বেশী ভালবাসতেন যে সে সম্বন্ধে তিনি অবিশ্বাস্যরূপে স্পর্শকাতর ছিলেন। একদিন যোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"স্বামীজি, আমি কেমন ভাবে আপনাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর্তে পারি ?" স্বামীজি উত্তর দিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষকে ভালবাস।" তাই ভারতবর্ষকে ভালবাসার জন্য স্বদেশ, সমাজ সমস্ত কিছু ছেড়ে যোসেফাইন ম্যাকলাউড ভারতবর্ষের দুঃখকে বেদনাকে নিজের দুঃখ ও বেদনা বলে মনে করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের সেবাই তাঁর একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে রজঃগুণের প্রাধান্য দেখে স্বামীজি মুগ্ধ হয়েছিলেন একথা আমরা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এ সত্যও তাঁর

কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে অতিরিক্ত জড়বাদ ও পার্থিব সুখ ভোগস্পৃহা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি বিরাট অভিশাপ। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি যেমন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠে আর তার লাভাপ্রবাহে সমস্ত জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়—ঠিক সেই রকম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা একদিন আগ্নেয়গিরির মত শুধু জ্বলন্ত লাভা উদ্গীরণ করবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Nationalism গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে বিভীষিকাময় রূপ অঙ্কন করেছিলেন স্বামীজি তাঁর বহু বৎসর পূর্বে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত প্রচারের গোড়াপত্তন হয়ে গেল।

এবার ভারতবর্ষে ফেরবার পালা। জাহাজ-ঘাটে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন,—"স্বামীজি, এতদিন পশ্চিমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে বাস করে ভারতবর্ষকে কি আর আপনার ভাল লাগবে?" স্বামীজি আবেগের সঙ্গে বললেন—"তোমাদের দেশে আসবার আগে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, এখন ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে বড় পবিত্র, ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার তীর্থ।"

ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতীয় শিষ্যদের কাছে অজস্র পত্র লিখেছিলেন স্বামীজি। আলাসিঙ্গাকে লিখলেন, "যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় করে ফেলা যেতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা সবাই যে আহাম্মকের দল—স্বার্থপর কাপুরুষ; মুখে স্বদেশ-প্রেমের কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াই আর "আমরা খুব ধার্মিক" এই অভিমানে ফুলে আছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও একনিষ্ঠ; কিন্তু হতভাগাগুলো সবাই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডরা যেন ঐ একটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়েই জন্মেছে!···এ আমি বড় শক্ত কথা বললাম; কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর

তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি যাদের উপর সব আশা করা যায়—তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে —কেবল যদি এই রকম লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের যূপকাষ্ঠে হত্যা না করা হত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মাদ্রাজ তখন জাগবে যখন তাদের হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়। যা হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবেই হবে।"

দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়েছেন স্বামীজি। দেশের জন্য মন উচাটন হয়ে উঠেছে। কুমারী যোসেফাইন ম্যাকলাউডকে তিনি লিখলেন—"হ্যাঁ, আমার সেই পুরাতন প্রিয় দেশটি এখন আমায় ডাকছে; যেতেই হবে আমাকে। সুতরাং এই এপ্রিলে রাশিয়ায় যাবার সকল পরিকল্পনা বিদায়। ভারতে কাজকর্ম কিছুটা গোছগাছ করে দিয়েই আমি চিরসুন্দর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ফিরে আসছি।"

স্বামীজি পাশ্চাত্ত্য দেশ জয় করে ভারতবর্ষে ফিরছেন। এডেন বন্দরে জাহাজ যখন থামল, তিনি ও তাঁর কয়েকজন ইংরেজ শিষ্য সমুদ্রকূল থেকে কিছু দূরে একটি জলাশয় দেখতে গেলেন। সেখানে একজন ভারতবাসীকে দেখে সহচরদের ফেলে দ্রুতবেগে সেই ভারতবাসী পানওয়ালার কাছে প্রাণের আনন্দে গল্প সুরু করলেন। ইংরেজ সহচরেরা যখন দেখল যে সামান্য একজন পানওয়ালার সঙ্গে স্বামীজি খোশ গল্পে রত তখন তাদের আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না। স্বামীজি তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে গিয়ে বললেন, "ভেইয়া তুমহারা ছিলমটো দো।" পানওয়ালার কলকেটি নিয়ে

স্ফূর্তির সঙ্গে ধূমপান কর্তে লাগলেন। সমদর্শী সন্ন্যাসীর কাছে কিছুমাত্র সামাজিক বিভেদ ছিল না।

কলম্বোর কাছাকাছি যখন জাহাজ এসেছে, স্বামীজি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল বহুদিন বাদে দেশমাতৃকার কোলে আবার তিনি আশ্রয় পাবেন, দেশমাতৃকার স্নেহাঞ্চলে আবার তিনি শান্তি খুঁজে পাবেন। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত স্বামীজির যাত্রাকে রোমক সেনাপতির বিজয় অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সিংহল ও ভারতবর্ষের জনসাধারণ শুধু যে স্বামীজির যাত্রাপথে অজস্র ফুলই বিছিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, তাদের মনের মন্দিরে স্বামীজির বিগ্রহ স্থাপিত হল। কলম্বো থেকে আলমোড়ার যাত্রাপথে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তা মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল। কলম্বোর জনসাধারণের বিপুল সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে স্বামীজি বললেন, "যদি বিশ্বের কোন দেশকে যথার্থ পুণ্যভূমি বলে অভিহিত করা যায় তবে সে পুণ্যভূমির নাম ভারতবর্ষ। এই পুণ্যভূমিতে প্রত্যেকটি মানবাত্মা ঈশ্বরাভিমুখী। এই পুণ্যভূমিতে মানুষ তার চরম অভীষ্ট লাভ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জড়বাদের জ্বলন্ত অগ্নিতে মানুষ তৃষাতুর হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষই সেই দেশ যা নাকি সেই তৃষাতুর মানুষকে সুশীতল জল দিতে পারে।"

মনমাদুরার জনসাধারণের সংবর্ধনার উত্তরে স্বামীজি বললেন— "হে দেশবাসী, তোমরা চিন্তা করো যে গত ছয়-সাত শত বছর ধরে আমরা কত নীচে নেমে গেছি। শত শত লোক শুধু এতদিন ধরে এই প্রশ্ন করেছে, আমরা ডানহাত দিয়ে জল খাব না বাঁ হাত দিয়ে, অথবা আমরা হাত তিনবার ধোব না চারবার ধোব, অথবা আমরা পাঁচবার কিংবা ছ বার কুলকুচো করব। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে যারা তাদের সময় অতিবাহিত করছে তাদের কাছ থেকে আমরা কি-ই বা আশা কর্তে পারি? অথচ এই সমস্ত লোক এই সম্বন্ধে

আলোচনা করে ভারী ভারী পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শনের বই লিখে চলেছেন। আজকে আমাদের ধর্মের স্থান রান্নাঘরে। আমরা বৈদান্তিক নই, পৌরাণিক নই, তান্ত্রিক নই, আমরা শুধু ছুতমার্গাবলম্বী। আমাদের ধর্ম রন্ধনশালায় অধিষ্ঠিত। আমাদের ঈশ্বর ভাতের হাঁড়ি এবং আমাদের ধর্ম হল 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি পবিত্র'। যদি এই অব্যবস্থা আরও একশত বৎসর ধরে চলে তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোককে উন্মাদ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হবে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি যে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজ আমরা জীবনের বিরাট সমস্যাগুলো সমাধান করার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের মৌলিকতা অবলুপ্ত। আমাদের মন দুর্বল ও শক্তিহীন। এই ব্যবস্থাকে আজ চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।"

মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে স্বামীজি তাঁর "সমর নীতি" ব্যাখ্যা করলেন। "আজ আমাদের জনসাধারণ জিজ্ঞাসা কচ্ছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনেছি, আমাদের অনেক সঙ্ঘ ও সংস্থা গঠিত হয়েছে, অনেক কাগজপত্রে লেখালেখি হয়েছে কিন্তু আমরা সেই মানুষকে খুঁজছি যিনি আমাদের হাত ধরে এই পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করবেন।' —গত একশ বছর ধরে বহু সমাজ-সংস্কার আমাদের দেশে হয়েছে। কিন্তু এই সব আন্দোলনের ফলে শুধু কিছু বিষোদ্গারপূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভগবান যদি এ সাহিত্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করতেন তাহলে বোধ হয় ভাল হত। সমাজ-সংস্কারকেরা রক্ষণশীল দলকে সমালোচনা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে, গালাগালিতে জর্জরিত করেছে। এর উত্তরে রক্ষণশীল দল গালাগালি করে পাল্টা জবাব দিয়েছে। তার ফলে আমাদের দেশে প্রত্যেক ভাষায় এমন সব সাহিত্য রচিত হয়েছে যা জাতির পক্ষে লজ্জাজনক, দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক। একে কি সমাজ-সংস্কার বলে? এর ফলে কি দেশ গৌরবের পথে অগ্রসর হতে পার্বে? ...সমাজ-সংস্কার

সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন, কারা সমাজ-সংস্কার চায়? তাদের আগে খুঁজে বার করো। জনসাধারণ আজ কোথায়? বিশ্বে মুষ্টিমেয়ের অত্যাচার সবচেয়ে চরম অত্যাচার। যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মনে করে কোন একটা জিনিস মন্দ তাহলেই অনড় জাতি গতিশীল হয়ে ওঠে না। জাতি অনগ্রসর কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের সংবিধান রচনা করতে হবে—আজ দেশে রাজা নেই। কিন্তু জনসাধারণের হাতেই বা ক্ষমতা কোথায়? আজ তাদের ক্ষমতা দিতে হবে। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে শিক্ষিত করাই প্রথম কর্তব্য। আমাদের সেই সুদিনের জন্য অপেক্ষা কর্তে হবে। গত ১০০ বছর ধরে যে সব সংস্কার সাধন হয়েছে তা অলংকারের মত অপ্রয়োজনীয়। প্রত্যেকটি সংস্কার সমাজের ওপরের তুটি বর্ণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিধবা-বিবাহ ভারতবর্ষের শতকরা ৭০টি নারীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এবং এ সমস্যা ভারতবর্ষের সমাজের উচ্চবর্ণের লোকদের উপরেই প্রযোজ্য যারা দরিদ্র জনসাধারণের পয়সায় শিক্ষার আলোক লাভ করেছে।" এই "সমর নীতি"র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—"বহু শতাব্দী ধরে জনসাধারণকে শুধু শেখান হয়েছে তারা ছোট। তাদের বলা হয়েছে তারা কেউ নয়, বিশ্বের সমস্ত জনসাধারণকেই বলা হয়েছে যে তারা মনুষ্য পদবাচ্য নয়। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে শত শত বৎসর জীবন যাপন করে তারা আজ পশুর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাদের কাছে কোন দিন আত্মার কথা কেউ বলেনি—আজকে লোহার মত পেশী আর ইস্পাতের মত দৃঢ় স্নায়ুর প্রয়োজন। দীর্ঘকাল আমরা ছিঁচকাঁদুনেপনা করেছি। আজ আর কান্নার অবকাশ নেই। আজকে তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হয়ে ওঠ। আর যে ধর্মের প্রয়োজন সে ধর্ম তোমাদের মানুষ করে তুলবে। আজ মানুষ গড়ার বাণী আমাদের বড় প্রয়োজন। মানুষ গড়ার শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন

—আমি দেশপ্রেমে বিশ্বাসী। দেশপ্রেম সম্বন্ধে আমার একটি আদর্শ আছে। বিরাট কিছু তৈরী কর্তে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ হৃদয়বান হও, বুদ্ধি বা যুক্তির মধ্যে কি আছে? বুদ্ধি বা যুক্তি তোমাকে কয়েক পদ নিয়ে যেতে পারে তার বেশী কিছু পারে না, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে অনুপ্রেরণা।

প্রেমের দ্বারাই বহুদিনের বন্ধ দরজা খুলে যাবে। হে ভবিষ্যৎ সমাজের সংস্কারক ও দেশহিতৈষিগণ, তোমরা কি হৃদয়বান? তোমরা কি বিশ্বাস কর যে দেবতা ও ঋষিদের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বংশধরেরা আজ পশুত্বের পর্যায়ে উপনীত? তোমরা কি অনুভব করে যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ উপবাসী এবং লক্ষ লক্ষ লোক যুগ যুগ ধরে উপবাসী? তোমরা কি অনুভব কর যে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা কাল মেঘের মত আমাদের দেশকে ছেয়ে ফেলেছে? এতে কি তোমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে? এতে কি তোমাদের নিদ্রা বন্ধ হয়েছে? তোমাদের রক্তের প্রবাহে শিরাতে ধমণীতে কি এই বেদনার অনুরণন শোনা যাচ্ছে? তোমরা কি এই চিন্তা করে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছ? জনসাধারণের এই দুর্দশার কথা চিন্তা করে কি তোমরা তোমাদের দারা পুত্র পরিজন, তোমাদের ধনসম্পত্তি এমনকি তোমাদের জীবনের কথা ভুলে গিয়েছ? তাই কি কর্তে পেরেছ? যদি পেরে থাক তবে দেশপ্রেমের প্রথম সোপানে মাত্র উপনীত হয়েছ।"

ভারতবর্ষ বেদান্ত ধর্মের জন্মভূমি। বিদেশে যে বেদান্তের অভীঃ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—স্বামীজি সেই মন্ত্রেই ভারতের জনসাধারণকে দীক্ষিত করলেন। স্বামীজির একটি প্রিয় বাণী ছিল ইংলণ্ডের কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্যের একটি উক্তি—"দুর্বলতাই পাপ"! স্বামীজি তাঁর "বেদান্ত এবং ভারতীয় জীবনে ইহার প্রয়োগ" নামক বক্তৃতায় বললেন—"উপনিষদের পাতায় পাতায় আমি শুধু শক্তির বাণী ধ্বনিত হচ্চে শুনতে পাচ্ছি।

এই শক্তির সাধনার কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। আমি আমার সমগ্র জীবনে এ শিক্ষা লাভ করেছি—মানুষ তুমি কখনও দুর্বল হয়ো না। উপনিষদ থেকে একথা শিখেছি—শক্তি লাভ কর, সোজা হয়ে দাঁড়াও, সবল হও। পৃথিবীর যে একমাত্র সাহিত্যে অভীঃ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে সে সাহিত্যের নাম উপনিষদ্।"

ভারতবর্ষের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বৈদান্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সুখী স্বাধীন সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ গড়ে তোলা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ" নামক বক্তৃতায় তিনি বললেন—"দীর্ঘকাল আমরা যে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছিলাম তার প্রয়োজন ছিল। এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ রচিত হবে। আজ সেই শুভ ভবিষ্যতের সূচনা। ক্ষুদ্র বীজের মত সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। এর প্রথম কিশলয় দেখা দিয়েছে এবং এই বীজই একদিন বৃক্ষে পরিণত হবে।"

এই বক্তৃতাতেই স্বামীজি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,—আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত অন্যান্য দেবতারা অদৃশ্য হয়ে থাক। আমাদের জাতিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। আমাদের জাতির মধ্যে ঈশ্বরের হাত, ঈশ্বরের পা, ঈশ্বরের কান, ঈশ্বর আমাদের জাতিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। অন্যান্য সমস্ত দেশ আজ ঘুমিয়ে আছে। আজকে সেই বিরাট দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত হতে হবে। সেই বিরাট দেবতা আমাদের চার পাশে। নরনারী ও পশুপ্রাণী আমাদের দেবতা এবং প্রথম দেবতা যাকে আমাদের পূজো কর্তে হবে তারা আমারই দেশবাসী মানুষ।

কলিকাতার বিপুল সংবর্ধনার উত্তরে স্বামীজি বললেন—হে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার কানে একটি সুর সর্বদা বাজতে থাকে 'জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী'—আমার বিদেশ থেকে আসবার প্রাক্কালে জনৈক ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'স্বামীজি এই বিলাসব্যসন ও শক্তি ও গৌরবের দেশে ৪ বছর থেকে আপনার নিজের মাতৃভূমি কেমন লাগবে?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসবার আগে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম। এখন ভারতবর্ষের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র! ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র! ভারত পুণ্যভূমি, ভারত আমার তীর্থস্থান—ভারতের দারিদ্র্য ও অধঃপতনের কারণ এই যে আজ ভারত সংকীর্ণ হয়ে গেছে। শামুকের মতন ভারতবর্ষ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" কলিকাতার যুব সম্প্রদায় তোমরা ওঠো, জাগো, আজ আমাদের শুভলগ্ন এসেছে, আজ সমস্ত দ্বার আমাদের কাছে খুলে যাচ্ছে। তোমরা সাহসী হও, নির্ভীক হও। আমাদের শাস্ত্রেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় অভীঃ অভীঃ! আমাদেরও অভীঃ হতে হবে। তাহলেই আমাদের কাজ সুসম্পন্ন হবে। তোমরা ওঠো, জাগো, তোমাদের দেশ আজ তোমাদের কাছ থেকে বিরাট আত্মাহুতি চান। যুবকসম্প্রদায়ই তা করতে পারে। তেজদীপ্ত, শক্তিশালী, সুগঠিত, বুদ্ধির আভায় ঝলমল যুবসম্প্রদায়ই একাজ কর্তে পারে। কলকাতায় এই রকম শত সহস্র যুবক রয়েছে। তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে আমি কিছু কাজ কর্তে পেরেছি তাহলে স্মরণ রাখবে যে আমিও অকর্মণ্য ভবঘুরের মতো কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি যদি এতটা কর্তে পারি তাহলে তোমরা আরো বেশী কর্তে পার। ওঠো, জাগো, বিশ্ব তোমাদের আহ্বান করছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে জনসাধারণের বুদ্ধি ও অর্থ আছে কিন্তু আমার মাতৃভূমি বাংলা দেশে যে পরিমাণ উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি তা অন্যত্র নেই, আজকে সেই অন্তর্নিহিত উৎসাহকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাই কলকাতার

যুবসম্প্রদায়—তোমরা ওঠো, জাগো, তোমাদের রক্তে উৎসাহের বন্যা জেগে উঠুক। নিজেদের তোমরা দরিদ্র মনে কোর না। মনে কোর না তোমরা নিঃস্ব বা নিঃসম্বল। টাকাকড়ি দিয়ে মানুষ তৈরী হয় না। মানুষই টাকা তৈরী করে। মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আজকে জগৎ রচিত হয়েছে।”

বহু যুবক ও তরুণ স্বামীজির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পড়ল। কিন্তু সবাই তো সমান নয়। একদিন স্বামীজি কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে শিষ্য ও ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময় একটি যুবক বল্লে—“আমি বহু সম্প্রদায়ের লোকের নিকট যাতায়াত কচ্ছি। কিন্তু সত্যের স্বরূপ এখনও উপলব্ধি কর্তে পারি নি।” স্বামীজি স্নেহবিহ্বল কণ্ঠে বললেন—“তুমি যদি শান্তি পেতে চাও তবে আগে তোমার নিজের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। নিজেকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে সত্য বা শান্তির সন্ধান মিলবে না। তোমার পাড়া-প্রতিবেশী কত লোক দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত। তাদের তুমি আপ্রাণ সেবা কর। রোগার্তকে ওষুধ দাও। যদি ওষুধ না মেলে তবে অন্যভাবে সেবা শুশ্রূষা কর। নিরন্নকে অন্ন দাও। অশিক্ষিতকে শিক্ষার আলোক দাও!” যুবকটি বল্লে, “আচ্ছা স্বামীজি আমি যদি রোগীর সেবা কর্তে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করে সময় মত না খেয়ে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ি।” স্বামীজির স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে একটু উত্তাপ দেখা দিল। স্বামীজি বললেন, “তুমি রোগীর সেবা কর্তে গিয়ে নিজের রোগের কথা ভাবছ। যার এত ভয় তার পক্ষে রোগীর সেবাও হবে না, শুধু নিজেরই রোগ হবে।”

এর কয়েকদিন বাদে স্বামীজি তাঁর জনৈক গৃহীভক্ত চণ্ডীবাবুকে বললেন—“চণ্ডীবাবু, আপনি আমাকে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?” চণ্ডীবাবু বললেন—“সুন্দর ছেলের কথা কি বলছেন?” স্বামীজি উত্তর করলেন, “দেখতে ভাল এমন ছেলে আমি চাইছি না। আমি চাই, সুস্থ শরীর, কর্মঠ, সৎ-প্রকৃতি কতকগুলি

ছেলে যারা নিজেদের মুক্তি সাধনের জন্য ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য তৈরী হতে পারে।”

স্বামীজির শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজিকে প্রশ্ন করলেন, “স্বামীজি, অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি?” স্বামীজি উত্তর দিলেন, “বিদেহমুক্তি সাধনমার্গের সবচেয়ে উঁচু স্তর। নিজের মুক্তির জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাধন ভজন করেছি, মুক্তি পেলাম না বলে না খেয়ে মরতে চেয়েছি। কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয় যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটি লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।”

স্বামীজি তাঁর শিষ্যকে যে কথাটি বললেন তা যেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

“ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে॥

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার ’পরে॥

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প’রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥”

বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য এতখানি নিঃস্বার্থপরতা বোধ হয় আর কখনও দেখা যায়নি। দীন দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশ স্বামীজির কাছে একটি পরম সত্য। বেদান্ত-বাদের এই মূলমন্ত্র স্বামীজির জীবনে একান্তভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে॥
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ঘোর
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে॥'

মানুষকে দুমুঠো খেতে দেওয়াই স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপ্ত করে তুলতে। বীর্যহীন, মনুষ্যত্বহীন, দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের ফলে শৌর্যহীন, ভারতবাসীকে তিনি সত্যিকার মানুষ করে গড়তে চেয়েছিলেন। স্বামীজির উপদেশে কিছুই নেতিবাচক ছিল না, সবই ইতিবাচক। তিনি চেয়েছিলেন "I want each one of my children to be

a hundred times greater than I could ever be. Every one of you must be a giant—**must**, that is my word."

যীশুখৃষ্ট যেমন বলেছিলেন—"I have come to fulfil and not to destroy," স্বামীজিও সেরকম ভারতের গরিমাময় ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চান নি। কিন্তু যেখানে মানুষের বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন, যেখানে মানুষ মোহের যাঁতাকালে পিষ্ট, তার বিরুদ্ধে স্বামীজির ধিক্কার সর্বদাই ধ্বনিত হয়েছিল। একদিন স্বামীজি কাছে গোরক্ষিণী সভার জনৈক প্রচাবক উপস্থিত হলেন। প্রচাবক স্বামীজিকে প্রণাম কবে তাঁকে গোমাতাব একটি ছবি উপহার দিলেন। স্বামীজি তাঁদের সভার উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্ন করায় প্রচারক বল্লেন—"নিষ্ঠুর কসাইরা ভারতবর্ষেব গোমাতাদের হত্যা করছে তাই আমাদের সমিতি বিভিন্ন স্থানে পিঁজবাপোল প্রতিষ্ঠা করে কসাইদের হাত থেকে গোমাতাদের কিনে আশ্রয় দিচ্ছে।" এ সময়ে মধ্যভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, সরকারী তালিকা মতে ঐ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৯ লক্ষ লোক মারা গেছে। তাই স্বামীজি প্রচারককে প্রশ্ন করলেন—"আপনাদের তহবিল থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদেব সাহায্য করাব ব্যবস্থা হয়েছে কি?" প্রচারক বললেন যে তারা মানুষের সাহায্য করেন না। গোমাতাদেব সাহাযা করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নিদারুণ মূঢ়তায় স্বামীজির চোখ থেকে যেন অগ্নিবর্ষণ হতে লাগল। প্রচারক বল্লেন, "মানুষ তার কর্মফলে মারা যায় এবং দুর্ভিক্ষও মানুষের কর্মফল।" স্বামীজির কণ্ঠে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ, তিনি বল্লেন—"পশু পাখীদের বাঁচাবার জন্য আপনারা অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, কিন্তু মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনাদের প্রাণ এতটুকু কাঁদে না। আপনি বল্‌ছেন, মানুষ কর্মফলের জন্য মরেছে, তাই যদি হয় তবে আপনার গোমাতারাও তো কর্মফলের জন্য কসাইয়ের হাতে মারা যাচ্ছে।" প্রচারক একটু লজ্জিত হলেন কিন্তু তবু বল্লেন—"কিন্তু শাস্ত্রে যে বলে গরু আমাদের মা", স্বামীজি হাসতে হাসতে বললেন—"গরু

যে মা তা ভালই বুঝতে পাচ্ছি। নইলে এমন কৃতী সন্তান আর কেন হবে?" কিন্তু তবুও প্রচারকের শুভবুদ্ধির উন্মেষ হল না, স্বামীজির কাছে বারে বারে অর্থ প্রার্থনা করলেন। তখন স্বামীজি বললেন—"আমার পয়সা কোথায়? তবে আমার হাতে যদি কখনও পয়সা আসে তবে আগে তা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করব। আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে।" স্বামীজির শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক ব্যর্থকাম হয়ে চলে যাবার পর স্বামীজি ক্ষোভে ও বেদনায় বলে উঠলেন—"কি কথাই বল্লে। বলে কিনা কর্মফলে মানুষ মরচে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা অধঃ-পাতে গেছে এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?"

রামকৃষ্ণদেবকে স্বামীজি যতটা বুঝতে পেরেছিলেন অন্য কোন শিষ্যই বোধ হয় তা পারেন নি। একদিন রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পায়চারী করছিলেন। ঠাকুরের রসদদার সেজবাবু মথুরা নাথ বিশ্বাস দূর থেকে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যখন ঠাকুর এদিকে আসছেন তখন মনে হচ্ছিল যে সাক্ষাৎ শিব। আবার যখন ওদিকে যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল তিনি কালী। এই দুটো রূপ সবার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বামীজি রামকৃষ্ণদেবের থেকে অভিন্ন বলেই তিনি গুরুকে যতটা বুঝেছিলেন অন্য শিষ্যরা তা পারেন নি। কোন কোন শিষ্যের মনে হ'ল যে নিজের মুক্তিলাভ ও ভগবানকে পাওয়াই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই স্বামীজির জনসেবা বা মানুষের কল্যাণ ব্রত তাঁদের মনে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজি যখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত করলেন, তাতে কোন কোন গুরুভাই প্রথমে একটু আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন, শ্রমিকদের উৎসাহ বর্ধন প্রভৃতি

কাজও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল। স্বামী যোগানন্দ বল্লেন—"তোমার এসব বিদেশীভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এই রকম ছিল?" স্বামীজি বল্লেন—"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন ভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।" স্বামী যোগানন্দের মনে আর এতটুকু ক্ষোভ রইল না। তাঁরা জানতেন স্বামীজি রামকৃষ্ণদেবের বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দেবেন।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল স্বামীজির দেশাত্মবোধক কাজে অত্যন্ত উৎসাহী। কি করে দেশকে জাগাতে হবে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় স্বামীজি লিখেছিলেন,—"যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে সতুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের কুবুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।" স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, মিশনের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ও জন-হিতকর। সুতরাং মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগ দিন আর না দিন

দেশের মানুষের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে তিনি তাঁর জীবন যৌবন সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জনশিক্ষা ব্যতীত কখনও সম্ভবপর নয়। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তিনি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে বলেছিলেন—"দিনরাত চীৎকার করে ওদের (ইংরেজ) 'এ দেও, ও দেও', বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয় পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেচাঁমেচি করতে হবে না। ওরা আপন হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্ত ধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতি চর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ (secondary) উপায় বলে বোধ হয়। আমি এ বিশ্বাস কাজে পরিণত কর্তে জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ করে যান।" শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি—

"কেবল শিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিলাম, Irish Colonists (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে,

তার চলনে আর সে 'ভয়' 'ভয়' নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে ঐ Irishman-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, "(Pat) প্যাট তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনিতে শুনিতে 'প্যাট' এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনোটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্রই চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ! প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরে ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ইত্যাদি।"

ভগিনী নিবেদিতা তখনও ভারতবর্ষে আসেন নি। স্বামীজি নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষে কিরকম কাজ এগোচ্ছে তার খবর বিশ্বের সর্বত্র তাঁর ভক্তদের কাছে পাঠাচ্ছেন। স্বামীজির মানবসেবা সম্পর্কিত উপদেশ যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল তা ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি থেকেই জানা যায়।

"এখন আমি দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি, এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্য গড়ে তোলা ছাড়া শিক্ষাকার্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারিনি, অন্নসংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যদিও এপর্যন্ত অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পেরেছি, তবু অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।"

ভগিনীপ্রতিম কুমারী মেরী হেইল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলা। ভারতবর্ষে জনসেবার জন্য স্বামীজি যে পরীক্ষা ও সমীক্ষা করে চলেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ উদগ্র। তাই স্বামীজি কুমারী

হেইলকে লিখলেন—"কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখ কষ্টের ভিতরে কেমন কাজ করছে, কলেরা আক্রান্ত 'পারিয়ার' মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘুরে বেড়াতাম—কেউ আমায় চিনত না, তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।"

স্বামীজির স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতার বাণীর ফলে বহুলোক বৈদ্যুতিক শিহরণ অনুভব করেছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজির ভাবে ভাবিত। কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও পূজা আচ্চার দিকে তাঁর নজরটাও খুব বেশী। তাই স্বামীজি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—আর ঠাকুর পূজো-ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশী ব্যয় না করে।··· তুমি মঠের ঠাকুর পূজোর খরচ দু' এক টাকার মাঝে ক'রে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে।···শুধু জল তুলসীর পূজো ক'রে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তাহলে সব কল্যাণ হবে।"

স্বামীজি কলকাতায় থাকার সময় কয়েকজন শিষ্যকে দীক্ষা দেন। জনৈক শিষ্য সম্বন্ধে স্বামীজি শুনলেন যে তার পূর্ব জীবন কালিমাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং মঠের কোন কোন সন্ন্যাসী তার দীক্ষা দানের সম্বন্ধে একটু আপত্তি তুলেছিলেন। মানবপ্রেমিক স্বামীজি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—"আমরা যদি পাপী-তাপীদের দীক্ষা না দিই তবে তাদের উপায় কি হবে?" ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছে যেমন বহু পাপী

তাপী এসে শান্তি লাভ করেছিল স্বামীজির কাছেও পাপী তাপী, দীন দুঃখী পণ্ডিতেরা তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছিল। সমদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের কাছে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র কোন ভেদ ছিল না। স্বামীজির হয় তো অনেকদিন আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়েছিল। স্বামীজির পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বহু দুঃস্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করতেন। কয়েকজন আত্মীয়কে নেশা ভাঙ করতে দেখে বালক নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে এই নেশাখোরদের প্রশ্রয় দিতে বারণ করেছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত তার উত্তরে বলেছিলেন—"মানুষের জীবন যে কত বেদনাময় তা তোর পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। যখন তুই বুঝতে পার্বি যে ক্ষণিক আনন্দের জন্য এরা নেশা ভাঙ করে তখন তোর প্রাণও এদের জন্য দয়ার্দ্র হয়ে উঠবে।" শুধু নেশাখোরদের জন্য নয়, সমাজের সবচেয়ে যারা পতিত, সবচেয়ে যারা হতভাগ্য তাদের সকলের জন্য স্বামীজির হৃদয় প্রেমোদ্বেল হয়ে উঠত।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী গুরুগত প্রাণ। তিনি তাঁর "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ"-এ স্বামীজির যে উপদেশ মালা গেঁথে রেখেছেন তা সর্ব যুগের সকল মানুষের কাছে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্ব যখন বহু দিনের মোহ নিদ্রা থেকে উঠে উন্নতির পথে, প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে তখন ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। স্বামীজি তাই বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে শিষ্যকে বললেন—"তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস্। তোদের hypnotise (বিমোহিত) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোবাও তাই শুনে আজ হাজার বছর হতে চলল ভাবছিস্—আমরা হীন। সব বিষয়ে অকর্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ দেহও তোদের দেশের মাটি থেকে জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দেখ না তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মতো খাতির

করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস—'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অন্তরের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হতে পারিস।"

স্বামীজির চরিত্রে কর্ম, ভক্তি ও যোগ এই তিনের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। কিন্তু ভক্তি ও যোগের চেয়ে জাতিকে কর্মের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করাই স্বামীজির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যারা তামসিকতার পঙ্কে ডুবে আছে তাদের উদ্ধার করতে হলে কর্মযোগই প্রশস্ত পথ। আমেরিকার অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্মঠ, তাদের আরও কর্মঠ করার জন্য স্বামীজি তাঁর কর্মযোগ সম্পর্কিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমেরিকার চেয়ে ভারতবর্ষে কর্মযোগের ঢের বেশী প্রয়োজন। তাই স্বামীজি শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বললেন—"এখন বৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখালে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কার্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃতমস্তিষ্ক, অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। মহা রজো-গুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহ জীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক, ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় লোক মাত্র আরামে রয়েছে, অধিকাংশ লোক এমন তামসিকতায় আচ্ছন্ন যে তারা বুঝতে পর্যন্ত পারছে না যে তারা অসুখী। মন তাদের অসাড় হয়ে গেছে।" শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি—স্বামীজি সেজন্য বারে বারে বোলতেন—"তোদের ভোগের ভিতর হচ্ছে কিনা—স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মতো বংশ-বৃদ্ধি—begetting a band of famished beggars and slaves

(একপাল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসের জন্ম দেওয়া)। তাই বলছি এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম-কর্ম-কর্ম। এখন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—এ ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য পথ নেই।"

দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বামীজির শরীর ভেঙ্গে গেছে। একটি ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছিলেন তিনি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। কিন্তু মনোবল এখনও তাঁর অটুট। তিনি শিষ্যকে বল্লেন—"শরীর যদি থাকে তবে আরও কত দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দেব। মাদ্রাজে জন-কতক আছে। কিন্তু বাংলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নেই। Brain ও muscles (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet (লোহার মত শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়)।"

মহাকবি গিরিশচন্দ্র স্বামীজির গুরুভাই। তিনি স্বামীজিকে বললেন—"হাঁ, হে নরেন,—একটা কথা বলি, বেদ বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী, এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায় নি। ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডারা অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এসকল রহিত করার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?" সমাজের এই বেদনার চিত্র স্বামীজির কল্পনানেত্রে যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন তিনি

নির্বাক হয়ে গেলেন। স্বামীজি জানতেন যে এই সামাজিক বিভীষিকা ভারতবর্ষে হয়ত একটু বেশী, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই কম বেশী এই অরাজকতা। বেদনায় স্বামীজির চোখ ফেটে জল এলো। কিন্তু স্বামীজি তাঁর ভাবাবেগ সবার সামনে প্রকাশ করতে চাইলেন না। চোখের জল যাতে কেউ না দেখতে পায় সেজন্য তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র শিষ্যকে বল্লেন—"দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজির বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

স্বামীজি কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন। এখনও পদ্মপলাশ লোচনে একটু জলের আভাস। স্বামীজির প্রথম শিষ্য সদানন্দ সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে দেখে স্বামীজি বললেন—"ওরে এই জি. সি.র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?" তার পরে গিরিশচন্দ্রকে বললেন—"দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়—এ জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়—খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে?"

মানুষের দুঃখে চিরকাল স্বামীজি চোখের জল ফেলেছেন। মাদ্রাজে তখন একদিন সমুদ্রতীরে তিনি জেলেদের কংকালসার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে বল্লেন—"হে ভগবান, তুমি এত বেদনা এত দুঃখ সৃষ্টি কেন করেছ? আমি আর এই দুঃস্থদের দিকে তাকাতে পারি না। হে প্রভু, কতদিন পরে এদের দুঃখের রাত্রি শেষ হবে?"

বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে স্বামীজি কিছুদিন ছিলেন। সামী তুরীয়ানন্দ একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্তে গেলেন। তিনি একটু অন্তরাল থেকে, দেখলেন স্বামীজি খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মতন বারান্দায় পায়চারী কর্ছেন। স্বামীজি এত চিন্তামগ্ন ছিলেন যে তুরীয়ানন্দের উপস্থিতির কথা তিনি জানতেও পারলেন না। কিছুক্ষণ গুনগুন করে মীরাবাঈ-এর একটি বিখ্যাত ভজন গাইলেন, তার পরে দেখা গেল তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেললেন। তিনি বার বার শুধু গানের একটি কলি গেয়ে যেতে লাগলেন—'ওরা কেউ আমার দুঃখ বুঝতে পারে না।' তার পরে তিনি গাইলেন 'যারা জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছে তারাই শুধু এই দুঃখ বুঝতে পারে'। তাঁর সেই করুণ কণ্ঠ তুরীয়ানন্দের বুকে এসে বাজল। তুরীয়ানন্দ বুঝতে পারলেন না এই বিরাট দুঃখের উৎস কোথায়? তার পরে বুঝতে পারলেন যে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের কথা ভেবেই তাঁর বুকের রক্ত সহানুভূতির অশ্রুতে গলে গিয়ে নেমে আসছে। তুরীয়ানন্দ এই কাহিনীর উল্লেখ করে বলেছিলেন, "তোমরা কি মনে কর যে তিনি এত অশ্রুপাত করেছেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে? না! তাঁর প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু যা দেশের জন্য তিনি পাত করেছেন, তা থেকে অজস্র বীর কর্মী জন্মগ্রহণ কর্বে। তারা স্বামীজির চিন্তা, স্বামীজির ভাবনা, স্বামীজির কর্ম নিয়ে এই পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলবে।"

স্বামীজি নিজে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর গুরুভাইরাও সমাজ সংসার ত্যাগ করে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির ভাবে দীক্ষিত। সন্ন্যাস জীবন বড় পবিত্র জীবন। স্বামীজির মতে যে লোক সমাজের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে তার প্রতি স্বামীজির সহানুভূতি নেই, সে স্বার্থপর। তাই স্বামীজি বললেন—"পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ কর্তে,

বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্র বিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী কর্তে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

সব মানুষকে সমান করবার ইচ্ছা স্বামীজির ছিল। সেজন্য উচ্চনীচ ব্রাহ্মণ-শূদ্র এই ভেদাভেদ স্বামীজি তুলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক ভারতবাসীকে দ্বিজ করে তুলতে। সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। ছুতমার্গের ফলে দেশটা বারঘরে তের উঠোন হয়ে পড়েছে। জাতিভেদের কুফল সম্বন্ধে স্বামীজি এত সজাগ ছিলেন যে, একবার ঠিক করলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিনে তথাকথিত নীচ জাতীর লোক ও ব্রাত্যের দল সকলেরই যজ্ঞোপবীত পরবার অধিকার আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"ছোঁব না ছোঁব না বলে এদের আমরা হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় ডুবে গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয় বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে, তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।"

কলকাতায় কিছুদিন থেকে স্বামীজি উত্তর ভারতে বেদান্ত ধর্ম ও মানুষকে ভালবাসার ধর্ম প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। লাহোরে কয়েকটি উৎসাহী যুবককে নিয়ে একটি সভা স্থাপন করলেন। তিনি তাদের সুস্পষ্টভাবে বললেন যে—এ সভায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। পড়াশুনার অবকাশে প্রত্যেক সভ্যকে মানুষের কল্যাণে ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত কর্তে হবে। শুধু লাহোরে নয়, উত্তর ভারতের যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই তিনি মানবিকতার বাণী প্রচার করেছিলেন।

আলোয়ারে যখন স্বামীজি এলেন, তখন রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ করে অতি দীন হীন লোকের কাছ থেকেও আমন্ত্রণ

এসেছিল। স্বামীজি অন্য কারুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে একজন দরিদ্রা বৃদ্ধার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজি বৃদ্ধাকে খবর পাঠালেন যে তার হাতে তৈরী মোটা চাপাটী খেতে তাঁর ইচ্ছে হয়েছে। স্বামীজির শিষ্য ভক্তের দলও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন—স্বামীজিকে সম্বোধন করে বৃদ্ধা বললে—"আমার কত সাধ ছিল তোমাদের ভাল করে খাওয়াই। কিন্তু সাধ আছে সাধ্য নেই।" বৃদ্ধার দেওয়া সেই বিদুরের খুদ স্বামীজি ও শিষ্যেরা খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন, আসবার সময় অলক্ষ্যে একখানা ১০০ টাকার নোট রেখে এলেন। এ ভিক্ষে নয়। এ স্বামীজির মানবপ্রীতির সুন্দর প্রকাশ।

বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না এবং সাধারণতঃ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে এমন খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ যেখানে দাতাকর্ণের জন্ম—সেই ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নের অভাবে মারা যায়। স্বামীজির বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্তে। তাঁর কাছে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে স্বামীজি বল্লেন—'দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই; কারণ সে সব দেশে মানুষ আছে।'

জাতির নিষ্ক্রিয়তায় স্বামীজি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ কর্তেন। তিনি চাইতেন যে ভারতবর্ষের লোকেরা আবার মানুষ হয়ে উঠুক। শুধু যে সমাজের তলাকার লোকেরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে তা নয়। সমাজের উপর তলাকার লোকেরা আরও মনুষ্যত্বহীন। প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজি বললেন—"নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে বসতে জুতো লাথি খেয়ে একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন Professional (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে। তোদের উপর-শ্রেণীর লোকেরা দু' এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে করে

সকল অফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি কুড়ি টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচশ বি. এ., এম. এ. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন! 'ঘরে ভাত নেই, মাগ ছেলে খেতে পাচ্ছে না, সাহেব দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম'। চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত কর্তে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় লোকেরা দল বেঁধে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন করো' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' করে মহা হল্লা করেছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—'ইংরেজ, আমাদের দাও।'

ভারতবাসী ভারতবর্ষে জন্ম বলে লজ্জিত। অনেকেই ইংরেজদের ভালমন্দ সব কিছুই অনুকরণ কর্তে চায়। এত পরমুখাপেক্ষী জাতি পৃথিবীতে বিরল। তাই স্বামীজি দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন। যে দেশে মানুষ মাত্রেই অমৃতের সন্তান—এই বাণী উচ্চারিত হয়েছে—সেখানেই মানুষ নিজেকে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে দীনহীন, সবচেয়ে পাপী বলে মনে করে। সুরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামীজি বলেছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই আমরা negative education পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই —এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনও জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive কিছু শেখানো হয়নি। হাত পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাত গুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলে দেশের যত কিছু Problem ক্রমশঃ আপনা আপনিই solved হয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথের "তোতা-কাহিনী"র সঙ্গে বাঙালী পাঠকমাত্রেই পরিচিত। স্বামীজি চাইতেন না যে দেশবাসীরা কয়েকটি ইংরেজী

বুলি শিখে তোতা পাখীতে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরেজী লিখতে পড়তে পারলেই আমরা শিক্ষিত হই। ইংরেজীই ছিল শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি। স্বামীজি চেয়েছিলেন দেশবাসীকে যথার্থভাবে শিক্ষিত কর্তে। স্বামীজি বললেন—"কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হ'ল। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic জাত তৈরী হচ্ছিস্। কেবল Machine-এর মত খাটছিস, আর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে।"

যথার্থ শিক্ষার প্রয়োজন দেশের আছে সত্য কিন্তু শিক্ষার চেয়েও প্রয়োজন ক্ষুধিতের মুখে অন্ন, আর রোগার্তের সেবা-শুশ্রূষা। স্বামীজির শরীর ভেঙে গেছে। গুরুভাইদের অনুরোধে দার্জিলিংএ স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসেছেন। কিন্তু শরীর সারবার আগেই শুনলেন, কলকাতায় শত শত লোক প্লেগে মারা যাচ্ছে। নিজের শরীর তুচ্ছ ক'রে নেমে এলেন কলকাতায়। সরকার বাহাদুর প্লেগ নিবারণের জন্য অনেক সতর্কবাণী—অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁরা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করেন নি। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশনের লোকের দ্বারা রোগার্তদের সেবা করবেন ঠিক করলেন। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের শৈশব কাল, পুঁজি বলতে তাদের বিশেষ

কিছুই ছিল না। একজন গুরুভাই সঙ্কোচের সঙ্গে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের টাকা নেই। অর্থ ছাড়া চিকিৎসা করা কি সম্ভব?" স্বামীজি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—"যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে মঠের জন্য কেনা হয়েছে তা বিক্রী করে দাও। আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের আবার বাড়ীর প্রয়োজন কি? গাছ-তলাই আমাদের সুখশয্যা। যদি আমাদের সমস্ত জমি বিক্রী করেও হাজার হাজার রোগার্তের প্রাণ বাঁচাতে পারি তবে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বনা।" জমি বিক্রী করার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি। নানা জায়গা থেকে অযাচিতভাবে সাহায্য আসতে লাগল। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা স্বামীজির নেতৃত্বে আপ্রাণ চেষ্টা করে হাজার হাজার লোককে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দানে, সেবায়, শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারে রামকৃষ্ণ মিশন আজ সকল প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানে। কিন্তু গোড়ার দিকে স্বামীজির প্রেরণা ও নেতৃত্বই এই শিশু প্রতিষ্ঠান-টিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সাহায্য-প্রাপ্ত কোন লোক স্বামীজির কল্যাণ-স্পর্শই পাচ্ছে।

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের তাণ্ডবলীলা শেষ হয়েছে। কিন্তু মানুষ তৈরী তো এখনও হয়নি। আর মানুষ তৈরীর কাজে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষার। সমাজের উপরতলাকার লোক কিছু শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যাদের পরিশ্রম, সবচেয়ে বেশী যাদের অসম্মান সেই তথাকথিত ইতর শ্রেণীর লোক এতটুকু শিক্ষার আলো পেলে না। তাই স্বামীজি বরাবর বলেন যে এই ইতরেরাই সমাজের মেরুদণ্ড। এরা তিনদিন কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। কৃষক ও শ্রমজীবীরা ধর্মঘট করলে ভদ্রলোকের অন্ন-বস্ত্র জুটবে না। স্বামীজি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন..."তোরা এই mass-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে—'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ।

আমরা 'তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।' তোদের এই sympathy পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যে তৎপর হবে, আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তর তত্ত্বগুলিকে এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।"

যাদের চিরকাল ছোটলোক বলে পায়ে ঠেলে ফেলা হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগান বড় কঠিন। কিন্তু স্বামীজি হাল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন যে আজ একাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে, ভদ্রলোক ও ছোটলোককে দাঁড়াতে হবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়ঃ। তাই স্বামীজি বললেন—"এই myss যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর civilization এনে দিয়েছে। তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে। ভেবে দেখ—গল্ জাতের হাতে অমন যে প্রচীন রোমান সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল। এই জন্য বলি এই সব নীচ জাতের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর, একদিন জাগবে নিশ্চয়ই-- তখন তারাও তোদের কৃত-উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে তিন রকম বৈদ্য আছে। অধম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য ও উত্তম বৈদ্য। উত্তম বৈদ্য হচ্ছেন তিনি যিনি রোগীকে জোর করে গালাগালি দিয়ে তার উপকারের জন্য তেত ঔষধ গেলাতে পারেন। স্বামীজি ছিলেন সমাজ-ব্যাধির উত্তম বৈদ্য। প্রয়োজন হলে মিষ্টি মধুর বাণী উচ্চারণ করে নয়, জোর করে গালাগালি দিয়ে তাঁর বাণী প্রচার কর্তেন। শিষ্যকে তিনি একবার বলেছিলেন—"তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality

আছে এই মাত্র। Physique ভাল না হলে মনের সহিত struggle করবি কেমন করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution মানুষ পদবাচ্য আছিস? আহার, নিদ্রা, মৈথুন ভিন্ন তোদের আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাসনি এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, 'মান হুঁশ আছে যার সে-ই মানুষ'। তোরা তো জায়স্ব ম্রিয়স্ব বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশীগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস। তোরা animal, তাই struggle করতে বলি। থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ দেখি তোরা animal and human planes -এর মধ্যবর্তী জীববিশেষ কিনা? Physiqueটাকে আগে গড়ে তোল। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

বেলুড় মঠ স্থাপন করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার নয়। জ্ঞান, বৈরাগ্য, মানুষের সেবা, ভক্তি—সবারই লীলাভূমি হবে বেলুড় মঠ। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের নামে অন্নসত্রের ব্যবস্থাও করা হবে। যথার্থ দীন-দুঃখীদের নারায়ণ জ্ঞানে সেখানে সেবার ব্যবস্থা করা হবে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—"জ্ঞান দানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি?" স্বামীজি বললেন—"এই অন্ন হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে সেবাকর্মে ভিক্ষা-শিক্ষা করে যেরূপে হোক দুমুঠো অন্ন দীন দুঃখীকে দিতে পারিস, তাহলে জীবজগতের ও তোর মঙ্গল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই সৎকাজের জন্য সকলের Sympathy পাবি।"

কিন্তু সমস্যা হল কারা এই ব্যবস্থা করবে। যারা সংসারী, তারা সংসারের মায়াচক্রে বাঁধা পড়েছে। স্ত্রীপুত্রের জীবিকার্জনের জন্যই তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। স্বামীজি তাই চাইলেন কয়েকজন বালসন্ন্যাসী, যারা মঠে থেকে নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে স্বামীজির স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারবে। এই বালসন্ন্যাসীরা শুধু

জনসেবাই করবে না, জনসেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যথার্থ ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং তাদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। কারণ স্বামীজির বিশ্বাস,—

"দেশের mass of people যেন একটা sleeping Leviathan! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না।"

বালসন্ন্যাসীদের মন যথেষ্ট উদার হতে হবে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়— এ তিন থাকতে নয়। সন্ন্যাসী কোন মানুষকে ঘৃণা করবে না। সে জানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা বহু শত বৎসরের সংস্কারের দাস, তাদের কাছে এখনও এতটা ঔদার্য আশা করা যায় না। স্বামীজির শিষ্য শরচ্চন্দ্র গুরুর এত সংস্পর্শে এসেও সংসারের বন্ধন, জাতিভেদের বন্ধন ত্যাগ করতে পারছেন না, স্বামীজি শিষ্যকে বললেন,—" 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না' ক'রে ছুতমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই; গলায় এক গাছা সূতা থাকলেই হ'ল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুতমার্গীদের আর আপত্তি নেই······তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্য সকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।"

শিষ্যের এই অনিত্য সংসারে মানুষের কল্যাণের জন্যই হোক বা নিজের কল্যাণের জন্যই হোক কর্ম করে যাওয়াটা নিষ্ফল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বামীজি কর্মযোগী, তিনি বললেন,—"আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত······মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন

ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মতো মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দু-দিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মতো অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই ক'রে মরাটা ভাল নয় কি?" বিশ্ববাসীর প্রত্যেকের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আরও অনেকে হয়ত ভেবেছেন, কিন্তু নিজের মুক্তি সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি বোধ হয় স্বামীজির মতন কেউ দিতে চায়নি।

স্বামীজি যখন দেশের বা মানুষের দুর্দশা দেখে বেদনার্ত হয়ে উঠতেন তখন আমরা বুঝতে পারি কতখানি হৃদয়বান্ ও প্রেমিক তিনি ছিলেন। স্বামীজি শিষ্যকে বললেন—"কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে, সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়। "তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়, তোদের মঙ্গল কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যেদিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সেদিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব!"

আমরা স্বামীজির বাণী ও রচনা থেকে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করেছি। হয়তো মনে হতে পারে যে কোন কোন ক্ষেত্রে একই কথার পুনরুক্তি হয়েছে। কিন্তু জাতিকে জাগাবার জন্য এ পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল। জীবনে যে সমস্ত সত্য স্বামীজির কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা অন্যের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে, স্বামীজির কাছে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের লোক এসেছিল। তাদের প্রত্যেককেই স্বামীজি মানুষ হতে বলেছেন। শুধু নিজেই মানুষ হলে চলবে না, অন্য মানুষকেও জাগিয়ে তুলতে হবে, এই ছিল স্বামীজির ধ্যান ও ধারণা। স্বামীজি তাই শিষ্য শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশে যে বাণী প্রকাশ করেছেন সে বাণী সমস্ত বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। " 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয় বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয় বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে, সকলকে বার বার বলগে

যা—তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এই ভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তার পর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্ব-প্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হ'তে পারবে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক কি এ দেখে স্থির হয়ে থাকতে পারেন? কান্না পায় না? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাংলা—যে দিকে চাই কোথাও যে জীবনীশক্তির কিছু দেখি না। তোরা ভাবছিস আমরা শিক্ষিত, কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পূরে পাশ করে ভাবছিস্, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর—একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্, চাকরি-গুখুরি করে নয় নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস্? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে, দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস্। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হ'লে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না, তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্,

তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস্ ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে তা কে বলতে পারে?"

ভাঙা শরীর জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন স্বামীজি, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসেছেন নৈনীতাল। সেখানে এক দেবী-মন্দিরে দুইজন দেবদাসীর ইচ্ছে হল স্বামীজিকে দর্শন করবে। স্বামীজির কোন ভক্ত বা স্থানীয় অনুরাগীর দল ভাবতেই পারলেন না যে দুজন পতিতা স্বামীজির সঙ্গে দেখা করার স্পর্ধা কেমন করে রাখে। স্বামীজি সমদর্শী। গঙ্গার জল, নর্দমার জল আজ তাঁর কাছে সমান হয়ে গেছে। তিনি দেবদাসী দুজনকে শুধু দর্শন দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের আশীর্বাদ পর্যন্ত করলেন। অনেক বছর আগে ক্ষেত্রী রাজার দরবারে দুজন নর্তকীকে দেখে স্বামীজি সন্ন্যাসের অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সেই নর্তকী দুজনের "সমদরশী নাম তুম্হারা" এই গান শুনে আবার ফিরে এসেছিলেন। তখন অভিমান ছিল, আজ তাঁর কোন মান-অভিমান নেই। সব মানুষকেই সমদর্শীর দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন।

নৈনীতালে থাকাকালীন স্বামীজির ছোটবেলাকার এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়। তার নাম ছিল যোগেশচন্দ্র দত্ত। যোগেশবাবুও দেশহিতৈষী। তিনি স্বামীজিকে বললেন—"যদি কিছু চাঁদা তুলে ভারতের কয়েকটি যুবককে সিভিল সার্ভিস পড়াবার জন্য বিলেতে পাঠান হয় তাহ'লে দেশের নিশ্চয়ই উপকার হবে।" দেশের মুক্তি-আদর্শ স্বামীজির কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি উত্তর দিলেন—'ওতে কোন সুফল হবে না। শুধু ছেলেগুলো বিলেতে গিয়ে সাহেবদের অনুকরণ করবে। নিজেরা শুধু আরামে থাকবার চেষ্টা করবে। দেশের জনকল্যাণের কথা

তাদের মনেও থাকবে না'। দেশের যথার্থ উন্নতি সম্বন্ধে দেশবাসী এত বেশী নিরুৎসাহ ও উদাসীন যে স্বামীজির এ কথা ভাবতেই চোখ দুটি জলে ভরে এল। যোগেশবাবুর স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারা যায় যে স্বামীজির কাছে ভারতই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাঁর প্রতি রক্তবিন্দুতে ভারতের কল্যাণ কামনার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ঠাঁই পেত না।

শুধু ভারতের চিন্তাই তো নয়। প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা, প্রত্যেক জাতির মুক্তি স্বামীজি কামনা করতেন। স্বামীজি তখন কাশ্মীরে। ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসীদের কাছে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। স্বামীজি নিজে "৪ঠা জুলাই" নাম দিয়ে ইংরেজীতে একটি বিখ্যাত কবিতাও রচনা করেছিলেন। ৪ঠা জুলাই তাঁর নিজেরও মহাপ্রয়াণের দিন। সুতরাং ৪ঠা জুলাই তারিখে কাশ্মীরে অবস্থানকালে স্বামীজি ঐ পবিত্র দিনটি উদ্‌যাপন করেছিলেন। স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন কয়েক জন আমেরিকান শিষ্য। শিষ্যদের কিছু না বলে তিনি এক দর্জির সাহায্যে তুলো দিয়ে আমেরিকার জাতীয় নিশান তৈরী করিয়ে টাঙিয়ে দিলেন। সেই দিনই "৪ঠা জুলাই-এর প্রতি" কবিতাটি রচিত হয়।

স্বামীজির ভাবধারায় শুধু যে তাঁর শিষ্য ও ভক্তেরাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা নয়। বোম্বাইয়ের শিল্পপতি জামসেদজি এম. টাটাও স্বামীজির গভীর দেশপ্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি সে সময় স্বামীজিকে শুধু অভিনন্দিত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি লিখেছিলেন—"আমার বিবেচনায় বিবেকানন্দই এই আন্দোলন পরিচালনের একমাত্র যোগ্যতম অধিনায়ক।"

উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে তিনি আবার বেলুড় মঠে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এলেন ভক্তপ্রবর সাধু নাগ মহাশয়। কবি গিরিশচন্দ্র একবার বলেছিলেন যে মহামায়া স্বামীজিকে ও সাধু নাগ মহাশয়কে মায়ার জালে আবদ্ধ করতে

পারেনি। মহামায়া যখনই তাঁর জাল বিস্তার করেছেন, দীনহীন নাগ মহাশয় নিজেকে দীন থেকে দীনতর, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে জালের বাইরে চলে এসেছেন। আর স্বামীজি এত বড় যে মহামায়া তাঁর সমস্ত জাল বিস্তার ক'রেও স্বামীজিকে আবদ্ধ করতে পারেননি। স্বামীজি জালের চেয়েও বড় হ'য়ে মায়াপাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। নাগ মহাশয় ও স্বামীজি নানা বিষয় আলোচনা করলেন। আলোচনার শেষে বলে উঠলেন স্বামীজি—"আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায়—অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সঠিক হ'ল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—যুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ যোধ হয়েছে।"

নৈনীতাল, কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গাতে তিনি ঘুরেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের জল হাওয়া তাঁর কিছুতে সহ্য হচ্ছে না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা স্বামীজিকে আবার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যেতে অনুরোধ করলেন। যাবার কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র "উদ্বোধন" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশের পিছনেও ছিল স্বামীজির মানবিকতা। তিনি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন—"তোদের history, literature, mythology প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে। মানুষকে কেবল বলছে—'তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই'। তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা নিয়ে—ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। উদ্বোধন কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে জাগিয়ে তোল্ দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে।" স্বামী অনন্তানন্দকে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood এবং দয়া। 'স ঈশঃ অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ'—তবে 'প্রকাশ্যতে ক্বাপি নাম"—এই স্থলে বলা উচিত—"সঃ প্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপঃ"—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া প্রেমের পূজো দেশে হোক। ভেদ বুদ্ধিই বন্ধন, অভেদ বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ।"

ধর্ম কাকে বলে সে সম্বন্ধে স্বামীজি অগস্ত্যানন্দকে লিখলেন—; নীতিপরায়ণ মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হওয়ার নামই ধর্ম। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—"লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে 'কুছ পরোয়া নেই' 'ওরা বাহাদুর' আমি সঙ্গেই আছি, তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটী কোটী নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো খালি 'বাপরে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়' ডিসপেপ্টিক্গুলো প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে ঘোর ডিসপেপ্সিয়া কখন আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষের আর কি ব'লব, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনও কোন কাজ থেকে হটেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেননি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শক্তি-মায়ের ছেলে। মিন্মিনে, ভিন্ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা, তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দু-ই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়।" এই চিঠির মধ্যেও স্বামীজির সেই অভীঃ বাণী, কর্মযোগের বাণী, মানুষ হবার বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

দেওঘরে অবস্থানকালে শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে স্বামিজী যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি সমাজের সর্বপ্রকার সমস্যার কথাই আলোচনা করেছেন। সাধারণতঃ সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডিকেই সমাজ বলে মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে সমাজের অর্থ দেশবাসী প্রত্যেকটি মানুষ। এই মুষ্টিমেয় গুণীর দল নিজেদের মুখ এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য কোটী কোটী নরনারীকে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে চিরকাল ডুবিয়ে রাখতে চায়। এরই বিরুদ্ধে স্বামীজির বিদ্রোহ। তাই স্বামীজি লিখলেন—"সমাজ কে ? লক্ষ লক্ষ তাহারা ? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত ? ? ?"

শ্রীমতী সরলা ঘোষালের সঙ্গে স্বামীজি নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করতেন। শ্রীমতী ঘোষাল স্বামীজির আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বলেছিলেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পূজো ত্যাগ করলেই তাঁর দলের সকলে স্বামীজির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। স্বামীজি জানতেন যে এই জাতীয় সমালোচকেরা শুধু নিন্দাই করতে পারে, গঠনমূলক কিছু করা তাদের সাধ্যাতীত। স্বামীজি শ্রীমতী ঘোষালকে তাই লিখলেন—"

"বলি ও-রকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ও-রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হ'তে পারে ? আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত সিঁটকানো ? কে জানে কার কি মতিগতি। আমার যেন মনে হয়, ও-সব লোক গ্লাস-কেসের ভিতর ভাল ; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত ন মানে জাত কুজাত।
ভুক ন মানে বাসী-ভাত॥

স্বামীজির ইংল্যাণ্ডে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'লো। সঙ্গে যাবেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। যাত্রার আগের দিন স্বামীজি সমস্ত শিষ্য ও গুরুভাইদের সন্ন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে বললেন—"তোমরা নির্ভীক হও, মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের সুখ-শান্তির কথা ভেব না। মানুষের কল্যাণের জন্য যদি বাকি জীবন উৎসর্গ কর্তে না পার তবে জীবন ধারণ করে লাভ কি? তোমাদের কোটী কোটী ভাই নিরন্ন, বিবস্ত্র, দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের সেবা করাটাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য।"

উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পত্রাকারে লিখতে সুরু করেন। এই পত্রাবলীই পরে 'পরিব্রাজক' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে 'পরিব্রাজক' বাংলা সাহিত্যের একখানি অপরূপ গ্রন্থ। 'পরিব্রাজক'এও স্বামীজির জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও গভীর মানবপ্রীতির বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে। নিজের দেশবাসীদের প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, "আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি জায়গা থাকে?"

জাহাজ থেকেও স্বামীজির বাণী নীরব নয়। উচ্চপদস্থ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এখনও ঘরেতে বসে গর্ব করে পূর্বপুরুষের। তাদের আর্যতেজে পৃথ্বী কম্পমান। স্বামীজি একথা যত ভাবছেন ততই তাঁর মন বেদনায় বিহ্বল হ'য়ে উঠছে। তিনি লিখলেন—"আর্য বাবা'গণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের

পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ-লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েচে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে

অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কংকালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটী জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে।"

যাত্রাপথে সুয়েজ খাল পড়ল। সুয়েজ খালের খাত-স্থাপত্য দেখে স্বামীজি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর আবার মনে পড়ল যে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ—সব জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ল, ভারত শুধু পেছিয়ে পড়ে রইল। শ্রমিকেরা চিরকাল লাঞ্ছিত, পদদলিত, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের অন্নবস্ত্র উৎপাদন করছে কিন্তু তাদের এতটুকু স্বীকৃতি নেই, তাই ভারতের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন—

"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমরা নীরব, অনবরত নিন্দিত। পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকজন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্‌দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনিমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা!....তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন; দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, যেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা,

অনন্তপ্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘর দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য--হে ভারতের চির পদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।"

জাহাজে "উদ্বোধনের" জন্য লেখা চলেছে। যাঁরা সঙ্গী সাথী আছেন তাদের সঙ্গে স্বামীজি দিনরাত ধর্ম, ইতিহাস, মহাপুরুষের জীবনী ও মানবসভ্যতার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে চলেছেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর "The master as I saw him" পুস্তকে তার একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন যে, স্বামীজি মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকে মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা বলে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। স্বামীজি বলেছিলেন, "যদি অপরাধ কর তবে তা মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হ'তে চাও তবে বড় দরের দুষ্ট হও।"

ভগিনী নিবেদিতা বললেন—"স্বামীজি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত কম।" স্বামীজি এ সংবাদে এতটুকু আনন্দ লাভ করলেন না। বেদনার সঙ্গে তিনি বললেন— "আমাদের দেশবাসী যদি এরূপ নির্জীব ও মোহগ্রস্ত না হয়ে অপরাধও করত, তাহলেও ভাল ছিল।" স্বামীজির মানবতাবোধ ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়।

ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন থেকে স্বামীজি আবার আমেরিকায় চললেন। বেদান্ত প্রচারের যে ভিত স্থাপন করে এসেছিলেন তাকে আরও দৃঢ় করতে হবে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে হবে। কুমারী মেরী হেইলকে সে সময়ে তিনি যে চিঠিখানা লিখেছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভারতবর্ষের

কল্যাণের জন্য তাঁর প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি ইংরেজ কুশাসনের কথা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করলেন। তিনি লিখলেন,—"রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার—কিছু স্বাধীনতা ছিল।" ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে স্বামীজির বিশ্বাস একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল। "ইংরেজ শাসনের ইতিহাস সন্ত্রাসের ইতিহাস। শুধু বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্যই যে ইংরেজ সরকার দায়ী তা নয়, তাদের কুশাসনের ফলে দেশে বারে বারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ও লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কৃপণতা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকারকে যে সম্পাদক সমালোচনা করেছেন তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারীর মর্যাদা ভারতবর্ষে বিপন্ন।" স্বামীজি নির্ভীক ভাবে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করেছেন। পত্রের উপসংহারে তিনি লিখলেন—"মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।"

অনুরাগী ভক্ত স্টার্ডিকে ভারতে কি রকম কাজকর্ম হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। স্টার্ডি স্বামীজির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা, যোসেফাইন ম্যাকলাউড্, বা মিস্টার ও শ্রীমতী সেভিয়ার, বা ভগিনী ক্রীস্টিন-এর মত ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করেননি। তাঁর ভালবাসায় যেন কোথায় একটুকু ফাঁক ছিল তাই খানিকটা অনুযোগ করেই স্বামীজি তাঁকে লিখলেন,—"প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে, সেই ভারত

আজও বেঁচে আছে···, এখনও সে মরেনি, আজও সেই জীবন্ত ভারত নির্ভীক ভাবে ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে তার নিজস্ব বাণী প্রচার করার মনোবল রাখে ; কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, এ দেশে—যেখানে তার পায়ে শিকল আঁটা কিংবা শিকলের প্রান্ত-ভাগ যারা ধরে আছে, সেই শাসনকর্তাদের মুখের সামনেও করে না। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে···, অম্লান প্রেমের, চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার চিরন্তন ভারতবর্ষ—শুধু রীতিনীতিতেই নয়, প্রেমে, বিশ্বাসে ও বন্ধুত্বে। সেই ভারতের একজন নগণ্য সন্তান হিসাবে আমি তোমাকে ভালবাসি ভারতীয় প্রেমে, বরং এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'তে তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সহস্রবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত।"

পশ্চিমের বহুস্থান পর্যটন ক'রে স্বামীজি প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় বড় মনীষীরা এসেছেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশ করতে। সকল বৈজ্ঞানিকই প্রায় পাশ্চাত্ত্য দেশীয়। স্বামীজি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন বাংলা দেশ থেকে বিশেষ কেউ আসেননি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজির ক্ষোভের নিরসন হ'ল। তিনি দেখলেন যে ঐ বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে রয়েছেন বঙ্গবাসী জগদীশচন্দ্র বসু। স্বামীজির আনন্দের আর পরিসীমা রইল না। তাঁর মনে হ'ল, ভারতবর্ষের কলঙ্ক দূর করবার জন্যই যেন জগদীশচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন। স্বামীজি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লিখেছেন,—"নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সুজনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে, আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর

মধ্য হইতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্ত্য মণ্ডলীকে প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষ-স্থানীয় জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি তো ভারতবর্ষেরই স্বীকৃতি। তাই তো স্বামীজির এত আনন্দ, এত গৌরববোধ। কিন্তু একজন জগদীশচন্দ্র থেকেই তো দেশের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। স্বামীজি চেয়েছিলেন সমস্ত জাতিকে শিক্ষিত ক'রে দেশকে জাগিয়ে তুলবেন। সে যুগের কংগ্রেসের প্রতি স্বামীজির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কারণ, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর শিক্ষার কথা এতটুকু ভাবেননি, স্বামীজি স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখলেন,—"এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বলো? খালি 'আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও' বললে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের কথা? মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কাজ করে—ইংরেজরা ডেকে রাজকার্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে, "স্বকার্য-মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ।"

"ভারত ও ইংলণ্ড" প্রবন্ধেও স্বামীজির কংগ্রেস সম্পর্কিত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি যে ও-বিষয়ে (কংগ্রেস আন্দোলনে) বিশেষ মন দিয়েছি, বলতে পারি না। আমার কার্যক্ষেত্র অন্য বিভাগে।" তিনি কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করেছিলেন। কিন্তু বুঝেছিলেন, কংগ্রেস-প্রদর্শিত পথে তাঁর আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে না। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা ও সেবায় স্বামীজির আদর্শ অনুযায়ী কাজ

কর্ছে জেনে স্বামীজি আনন্দিত। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাঁর কাজের জন্য উৎসাহিত ক'রে লিখলেন,—"জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্মবিধান আপনা হতেই আসবে, ফলাফলে আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কাজ কর, তাহলেই আমি সুখী। বাক্যি-যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত—আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চিতম্, মিথ্যে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে, লোকহিত এক পাও এগোচ্ছে না।"

ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন স্বামীজি। শরীর আবার ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দেশবাসীর দুর্দশার কথা ভেবে তাঁর মনে এতটুকু শান্তি নেই। দেশকে এত ভালবেসেছিলেন বলেই নিজের শরীরের জন্য এতটুকু যত্ন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "গোরা"র মুখে যে কথা দিয়েছেন সে তো স্বামী বিবেকানন্দেরই কথা। গোরা বলেছিলেন—"আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে, পূজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে—আমার কাছে সেইটেই সবচেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্ছে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে, সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য নয়, এ একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব।"

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজি বারে বারেই বলেছিলেন যে, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি দেশকে জাগিয়ে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু একজন মানুষ যত বড় হন না কেন, সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তুলতে পারেন না। তিনি ভাবধারা দিয়ে দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কিন্তু তাঁর চাই সহস্র অনুচর যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে যাবে মরণের পথে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবন-দানের জন্য। শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজি তাই বললেন,—"কি জানিস,

আমি চাই a band of young Bengal; এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea-গুলি যারা work out ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি।"

ভারতবর্ষের বহু সাধক নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ ক'রে গুহাবাসী হয়ে দিন কাটিয়েছেন, এর বহু নজির রয়েছে। কিন্তু স্বামীজি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, সকলের মুক্তি না হলে নিজের মুক্তি কামনা করতে নেই। তিনি শিষ্যকে বললেন,—"যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীব-কুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before. জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা জাগরিত হলে তবে বুঝব, তুই ideal-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।"

অজস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজি তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য", "ভাববার কথা", "বর্তমান ভারত" প্রভৃতি বই লিখতে লাগলেন।

"প্রাচ্য ও পশ্চাত্ত্যে" ভারতবর্ষ ও ইউরোপের তুলনামূলক আলোচনা করলেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। "ভাববার কথা" বইখানি খুবই ছোট কিন্তু এর মধ্যেও স্বামীজির দেশপ্রীতির স্বাক্ষর দেখতে পাই। ব্যঙ্গ করে, কৌতুক করে, আঘাত দিয়ে স্বামীজি জাতিকে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি অহরহ অনুষ্ঠিত হয় তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। ভোলাপুরী নামে ভণ্ড বেদান্তীর কথা উল্লেখ ক'রে তিনি লিখলেন,—"ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখ-দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হ'য়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না, মারেনও না'—এই শ্রুতি-বাক্যের গভীর অর্থ-সাগরে ডুবে যান!" লোকাচার ধর্মের স্থান নিয়েছে, আসল ধর্মের সঙ্গে কোন যোগ নেই, শুধু লৌকিক আচার ও অনুষ্ঠান নিয়েই মানুষ মত্ত। লোকাচারের উপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষ ধর্মভ্রষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। সেই লোকাচার বর্ণনায় স্বামীজি লিখলেন,—"মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দুশ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওরই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়।"

"বর্তমান ভারত"ও দেশপ্রেমে প্রোজ্জ্বল। যে স্বদেশ-মন্ত্র এই "বর্তমান ভারত"এ উচ্চারিত হয়েছে সে স্বদেশ-মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্"-এর মতনই সারা ভারতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে।

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বামীজির ভাব-রসপুষ্ট। তিনি স্বামীজির সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি বুঝতে পেরেছি। মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও সেবা বুঝেছিলেন।"

স্বদেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতি স্বামীজির কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। বারে বারে স্বামীজিই বলেছিলেন—"পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব", একথা না বলে আমি বলতে চাই "মূর্খদেবো

ভব, দরিদ্রদেবো ভব।" দেশের জন্য তাঁর জ্বলন্ত ভালবাসা ছিল। তাই তিনি দেশপ্রেমিক, আবার সমস্ত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল বলেই তিনি বিশ্বপ্রেমিক। সাধারণতঃ দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম-এর সমন্বয় আমরা দেখতে পাই না। স্বামীজি একসময় বলেছিলেন—"আমি সমাজতন্ত্রবাদী"। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদ-এর সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজের সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। এবং এই বৈসাদৃশ্যই স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদকে এক বিশিষ্ট রূপ দান করেছে। স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "Swami Vivekananda—Patriot & Prophet" এই পুস্তকে স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদের একটি দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে স্বামীজির বাণী ও রচনায় তাঁর জীবন-দর্শনে যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদের মূল সুরটুকু ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয়, বহু সরকারী মার্কস্‌বাদী স্বামীজিকে মধ্যযুগ-সুলভ হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা বলে প্রকাশ করেছেন। স্বামীজি হিন্দুধর্মের প্রচারক ছিলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা আমাদের জাতির অক্ষয় সম্পদ। কিন্তু হিন্দুধর্মের তথাকথিত ধ্বজাধারী ভণ্ড পুরোহিতকুলের প্রতি তাঁর এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। প্রত্যেক মানুষ অমৃতের সন্তান। স্নেহময় পিতা যেমন সন্তানে-সন্তানে ভেদ করেন না, তেমনি ঈশ্বরের কাছেও তাঁর প্রত্যেকটি সন্তান সমান সুখ ভোগ করবে, সমান অধিকার লাভ করবে, সে সম্বন্ধে স্বামীজির বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। সরকারী মার্কস্‌বাদ অনুসারে, ধর্ম মানুষকে আফিম-এর মতন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, স্বামীজির মতে, ধর্ম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু স্বামীজি যে ধর্মের কথা বলেছিলেন সে ধর্ম মানুষকে লোকাচারের নাগপাশে বন্দী করে না, সে ধর্ম মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধন করে। হিন্দুধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম। এ খুবই

স্বাভাবিক যে এই প্রাচীন ধর্মের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটী আছে, কিন্তু সেই ত্রুটীটাকেই কি অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে? বহু মনীষীর, বহু সাধকের ধ্যানলব্ধ যে হিন্দুধর্মের বাণী তা কি দু'একজন অর্থলোলুপ পুরোহিতের অপচেষ্টার জন্য বরবাদ হয়ে যাবে? স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে সমালোচনা না ক'রে ভালবেসে হিন্দুধর্মের দোষ-ত্রুটীগুলো দূর করে দিয়ে তাকে তার চিরন্তন মহিমার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি শুধু দোষ-ত্রুটী দেখানই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে খৃষ্টান মিশনারীদের থেকে এই সমালোচকদের পার্থক্য কোথায়? যে শিক্ষা নিজের ধর্মকে ছোট করতে শেখায় তা যথার্থ শিক্ষা নয়। "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ"। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নেই। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন যেদিন হবে সেই দিনই বিশ্বে নবযুগের সূচনা দেখা দেবে, অন্ধকার অমানিশা ভেদ করে নূতন এক জ্যোতির্ময় প্রভাত দেখা দেবে।

সরকারী সমাজতন্ত্রবাদ সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে স্বামীজির প্রতিবাদ আরও বলিষ্ঠ। তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ অনেক বড় এই কারণে যে, তিনি মানুষকে দেবতার মহিমা দিয়েছেন। "Practical Vedanta"-এ তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন প্রত্যেকটি নরনারী জীবন্ত দেবতা। কে বলে ঈশ্বরকে জানা যায় না? কে বলে ঈশ্বরকে খুঁজে বার কর্তে হয়? মানুষের মধ্যেই তো ঈশ্বর বিরাজমান। প্রত্যেক মানুষকে তিনি অমৃতের অধিকারী বলে-গণ্য করতেন। কিন্তু তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে মানুষ তো রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ মাত্র। স্বামীজির মতে, "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়" ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ।

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে মানুষের সবকিছু চেষ্টা বস্তুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা জড়জগতের বাইরে কিছুই নেই বলে মনে

করেন। স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ, জড়বাদ বা বস্তুবাদকে স্বীকার করেছে। কিন্তু জড়বাদের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় মানবাত্মার কথাও ঘোষিত হ'য়েছে।

ধনিক ও বণিকের শোষণ সম্বন্ধে স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্রবাদীরা যাদের বলেছেন Proletarian, স্বামীজি তাদের বলেছেন শূদ্র। এই শূদ্র জাতি দীর্ঘকাল শুধু লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য ক'রে এসেছে। তাদের জন্য স্বামীজির প্রাণ সহানুভূতিতে ভরপুর ছিল। কুমারী মেরী হেইলকে তিনি যে দীর্ঘ চিঠিখানা লিখেছেন তা থেকে স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদের ধারাটি সুস্পষ্ট হবে। দীর্ঘ হলেও এই উদ্ধৃতিটুকু স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ বোঝবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—

'মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারও নেই। এযুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এযুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ!

এযুগের সুবিধা এই যে বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়-যুগ অপেক্ষা বৈশ্য-যুগ আরও উদার, কিন্তু ঐ সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্র-শাসন যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহ'লে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু একি সম্ভব? প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ—এবার শেষটির সময়। শূদ্র-যুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রূপো—কোন্‌টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হ'লে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেউ জানেন ব'লে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে; সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন,—'আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হ'তে নারাজ।' রূপার দরে সব দর ধার্য হ'লে গরীবরা এই অসমান জীবন-সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে, আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি এই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল ব'লে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।"

বস্তুবাদের কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। তিনি অন্যত্র কোথাও লিখেছিলেন—"আমরা মূর্খের মত বস্তুতান্ত্রিক

সভ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলি তার কারণ আঙ্গুর ফল টক। আমরা জানি যে আমাদের দেশের পার্থিব কোন উন্নতি হয়নি। তাই পার্থিব উন্নতির নিন্দায় আমরা পঞ্চমুখ। আমার মতে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা এমন কি বিলাস-ব্যসনেরও প্রয়োজন আছে। কারণ তাহলেই দরিদ্রেরা যথেষ্ট কাজ পাবে। কিন্তু বস্তুবাদই স্বামীজির শেষ কথা নয়। তাই তিনি বলেছেন, "এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম ক'রে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়সকল পরিহার ক'রে ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।"

স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ ছিল হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি জনকল্যাণকে দেখেছেন প্রেম দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, তাই তিনি বারে বারে বলেছেন, "তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও।" কিন্তু সরকারী সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছে বুদ্ধির আলোকে। তাদের দৃষ্টিতে সহানুভূতি ও দরদ তেমন দেখতে পাই না। হৃদয় দিয়ে মানুষের দুঃখ দেখেছিলেন বলেই স্বামীজি সমগ্র মানুষ জাতির পরম আত্মীয়। কোন একসময় স্বামীজি যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমি যীশুখৃষ্টকে ভালবাসি তাঁর ধর্মের জন্য নয়, তিনি উৎপীড়িত-দের ভালবেসেছিলেন বলেই তাঁকে ভালবাসি। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।" এ বাণীতে মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের ছাপ অনেক বেশী স্পষ্ট। আমরা স্বামীজির জীবন থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছি যে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে তাঁর বুক ফেটে যেত, তাঁর চোখ থেকে শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুধারা নেমে আসত। এই প্রেমিক বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর জন্য দিনরাত কেঁদেছেন। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ হৃদয় থেকে উৎসারিত, যাঁদের এতটুকু হৃদয় আছে তাঁরা বুঝবেন হৃদয়বান্ স্বামীজির কি অসামান্য দান।

স্বামীজির অসাধারণ ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "Swami Vivekananda—Patriot & Prophet" পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এশিয়ায় যে এক বিরাট গণঅভ্যুত্থান হবে তা স্বামীজির দৃষ্টি-প্রদীপে ধরা পড়েছিল। স্বামীজি যখন রাশিয়ার গণঅভ্যুত্থানের কথা বলেছিলেন তখন গণআন্দোলন সেখানে এতটুকু আরম্ভ হয়নি। কিন্তু স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে রাশিয়াতে এক বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হবে।

তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে কতগুলো বাঁধাধরা নিয়মের জন্যই গণঅভ্যুত্থান হয়। তাঁরা "অতিরিক্ত মুনাফা", "শ্রেণী-সংগ্রাম" এবং "বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ" প্রভৃতি নিয়মকে চূড়ান্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু স্বামীজি এই জাতীয় কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের কথা উল্লেখ করেননি। তাঁর আবেদন ছিল মানবিকতার কাছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সমস্ত বাঁধাধরা নিয়মের উর্ধ্বে। তাছাড়া একই মাপকাঠি দিয়ে সমস্ত মানুষকে বিচার করা চলে না। পাশ্চাত্ত্য দেশ স্বভাবতঃই জড়বাদী, পূর্ব ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা ধর্মভীরু। তারা বস্তুবাদে ততটা বিশ্বাসী নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে স্বামীজির মতে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী বৈচিত্র্য। মানুষ শুধুমাত্র যন্ত্র নয়।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু শোষিত মানবের কল্যাণের জন্যই সচেষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ নিখিল বিশ্বের সমস্ত জীব ও প্রাণী সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে দেবতা থেকে ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত প্রত্যেকের উপরেই পরম ব্রহ্মের প্রসন্ন হাসি।

জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে স্বামীজির সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে সমস্ত বিশ্বের শোষিত শ্রমিকদের সমবেত কণ্ঠে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে দেশের চেয়ে, জাতির চেয়ে আন্তর্জাতীয়তা

অনেক বড়। স্বামীজি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার এক অপূর্ব সমন্বয় করেছেন। নিজের দেশকে ভালবাসলেই অন্য দেশকে যে ঘৃণা করতে হবে এমন কোন মানে নেই। নিজের দেশকে ভালবাসলেই অন্য দেশকেও ভালবাসা সম্ভব। স্বামীজি বলেছিলেন যে, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে আগামী ৫০ বৎসরের জন্য ভুলে যেতে হবে এবং একমাত্র দেশমাতৃকাকেই একমাত্র দেবী মনে ক'রে পূজো করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে শুধু দেশবাসী ও দেশমাতৃকাকেই সেবা করতে হবে, বিশ্ববাসীর কল্যাণের কথা ভাবতে হবে না। আমরা সাধারণ লোক। আমরা সমস্ত বিশ্বকে সমানভাবে ভালবাসতে পারি না, কিন্তু স্বামীজির দৃষ্টিতে দেশ ও বিদেশ এক হ'য়ে গিয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর "স্বামীজির জীবনও সাধনার তাৎপর্য" প্রবন্ধে লিখেছিলেন "মানুষ তৈরী করাই স্বামীজির কাজের মর্মবাণী, স্বামীজির জীবন ও বাণী, চূড়ান্ত ধর্মসাধনা ও গভীর দেশপ্রেমের পরম প্রকাশ, তাঁর মধ্যেই জাতির ভাগ্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় যা কিছু সবই তাঁর কাছে সুন্দর ও মহান্ ছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জিনিস স্বামীজির কাছে পবিত্রতার আধার।" অন্য কোন এক জায়গায় ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "দেশমাতৃকাই স্বামীজির সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যা দেবী ছিলেন। এত গভীর দেশপ্রেম সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে হয়তো প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এর মূল্য অপরিমেয়।" স্বামীজি বলেছিলেন, "স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম আমাদের আত্মার বাণী।" এই গভীর বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ধকার পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠেছে, তাদের বেসুরো জীবনের সুর হয়ে বেজে উঠেছে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি স্বামীজি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাধারণ সমাজতন্ত্রবাদীরা নিজেদের দেশের গরিমোজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। ভারতের ভাবরূপটি স্বামীজির কাছে অপূর্ব ছন্দে প্রকাশ পেয়েছিল। হাজার হাজার বৎসর আগকার ঋষিগণ

যে শাশ্বত ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় তার উপর কিছু মলিনতা দেখা যায়। কিন্তু সোনার উপর মলিনতা তো জন্মাতে পারে না। ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের উপরেও দীর্ঘকাল কোন কালিমা থাকতে পারে না। স্বামীজি সেই নিকষিত-হেম ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিজেও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দেশবাসী প্রত্যেককে শ্রদ্ধাশীল করতে চেয়েছিলেন। এদিক থেকেও বিচার করলে স্বামীজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে।

সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে স্বামীজির মিল ও বৈসাদৃশ্য দুটোই তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এই আলোচনা থেকে এই ঘোষণাটি সুস্পষ্ট যে স্বামীজির মত মানবিকতা কারুর মধ্যেই দেখা যায় না। তাঁর লেখা "জাগ্রত দেবতা" কবিতার ভিতরে তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের মধ্যেই জীবন্ত দেবতা রয়েছেন। তাঁকে উপেক্ষা ক'রে আমরা পুতুল-প্রতিমা পুজো করছি। এসব পুতুল-প্রতিমা ভেঙে ফেলে সেই জাগ্রত দেবতাকে আবাহন করা কর্তব্য। মানুষের কল্যাণসাধন পরম ধর্ম। ন হি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

দেহরক্ষা করবার কিছুদিন আগে স্বামীজি পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে একজন বারবনিতা স্বামীজিকে দর্শন করবার জন্য উপস্থিত। বাড়ীর কর্তা ও স্বামীজির ভক্তরা একটু আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ বারবনিতাকে সস্নেহে ডেকে নিয়ে এলেন। তাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন।

বেলুড় মঠের জঙ্গল কাটবার জন্য প্রত্যেক বছর অনেক দরিদ্র সাঁওতাল আসত। স্বামীজি তাদের কাছে থাকতে ভালবাসতেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা হয়ত স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কিন্তু স্বামীজির কাছে ঐ দরিদ্র সাঁওতালদের সঙ্গ অনেক বেশী আনন্দদায়ক। সাঁওতালদের দলপতির নাম কেষ্টা। স্বামীজি তাদের সঙ্গে কথা বলতে এলে কেষ্টা বলত,—"ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা আসিস্ না। তোর সঙ্গে কথা বললে

আমাদের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায় আর বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) আমাদের এসে বকে।" স্বামীজির চোখ বেদনায় ছলছল ক'রে উঠল। একদিন স্বামীজি কেষ্টাকে বললেন,—"তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা সানন্দে সম্মতি দিলে। স্বামীজির আদেশে সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই-মণ্ডার ব্যবস্থা হ'ল। স্বামীজি তাদের খাইয়ে বললেন—"তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নর-নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।" স্বামীজি জানতেন যে তাঁর মহা-প্রয়াণের দিন বেশী দূর নয়। তাই যেন সমস্ত উপস্থিত সন্ন্যাসীদের কাছে দীর্ঘদিনের সাধারণ বাণীটুকু আর একবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন:

"দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'ল? 'পরহিতায়' সর্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি, ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি ক'রে দিই, এই সব গরীব-দুঃখী-দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না। আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, "মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চূষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না?" ওদেশে ধর্ম প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজানো ঘণ্টানাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে, হায়! তাদের সহানুভূতি ক'রে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনে কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না' বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে', দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুতমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুতমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারির কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না, দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্যচোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।"

জীবনদীপ প্রায় নিভে এসেছে। কিন্তু নেভবার আগে মানবতার পবিত্র হোমশিখা আর একবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠল স্বামীজির এই বাণীতে। আজন্ম মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও জীবনের জয়গান, মানবতার জয়গান গেয়ে গেলেন। বিশ্ববাসীর অপরিমেয় দুঃখ ও বেদনার হলাহল পান করে তিনি হয়েছিলেন

নীলকণ্ঠ। "শুধু দুটি অন্ন খুঁটে কষ্টে ক্লিষ্ট প্রাণ" যারা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাদের তিনি দেহের ক্ষুধাই মেটাননি তাদের আত্মার খোরাকও তিনি জুটিয়েছেন। তিনি নিয়ে চলেছেন তাদের অম্লান আলোকতীর্থের দিকে। কারণ তিনি অম্লান আলোকতীর্থের পথিকৃৎ। তিনি বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন উন্মুক্ত আকাশে, উদাত্ত আলোকে, মুক্তির বাতাসে।

স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা

অধ্যাপক হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা

॥ সূত্রপাত ॥

পরমপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম-শতবার্ষিকীর পুণ্যক্ষণে বিশ্ব-জুড়ে চলছে শ্রদ্ধা নিবেদন। তাঁর স্বল্প-কালব্যাপী জীবনে চলেছিল সীমাহীনের সাধনা: সীমাহীন তাই কালজয়ী। দেশে-বিদেশে তাই নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে মহাপুরুষের জীবন-সাধনার বিভিন্ন পালার কথা। আলোচনা, প্রদর্শনী, গ্রন্থ-প্রকাশনা, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমকে আশ্রয় ক'রে তাঁর জীবনচর্যার কথা উপস্থাপিত হচ্ছে। পরিমাণগত বহুলতার রূপ কি তা নিয়েও সূত্র সন্ধান করবেন বিবেকানন্দ-গবেষকগোষ্ঠী। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা এখনই প্রয়োজন।

একই সন্দেহ নিয়েই এ আলোচনা করা উচিত। ভারতবর্ষে যে ক'টি জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে সব ক্ষেত্রেই অনুশীলনের মাত্রা নিতান্তই কম ছিল। যদি স্বামীপাদের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটে সে তো পরম আশার কথা। জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির সত্যে এমন আশা যেদিন বাস্তব রূপ পাবে সেই দিন স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা অতিক্রম করে সেই মহাত্মার শিক্ষাদর্শের ভিত্তি-ভূমিতে ভারতীয় মানবতা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

॥ স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা ॥

স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার পর্যালোচনা শিক্ষাজগতে তত্ত্বগত উন্নতি তথা প্রয়োগসাপেক্ষ পদক্ষেপের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ সে-বোধ এদেশে প্রবল নয়। স্বভাবতঃই তার কারণ একাধিক। প্রধান যেটি তা হল—শিক্ষাচিন্তা নিয়ে যারা কাজ করছি, তাদের সাধারণ উচ্চ শিক্ষা এবং তৎপরবর্তী বিশেষ শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুশীলন প্রধানতঃ নেতিবাচক। কর্মে, শিক্ষাসংগঠনে, শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগে, উপকরণের ব্যবহারে, ব্যক্তিগত পাঠ বা অভিজ্ঞতার বিস্তারে, একক

যৌথ, পরীক্ষণার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে আমাদের ধারণাগুলি অস্বচ্ছ এবং অস্পষ্ট। কর্মরহস্য ভেদের কৌশল না জানলে কোন কর্মই সর্বাত্মক হয়ে ওঠে না। শিক্ষার মত জটিল কর্ম সম্পাদনে এ রহস্য ভেদ কম প্রয়োজনীয় হবার কথা নয়।

শিক্ষার ধারণাগুলি সুষমা খুঁজে পায়নি—সেক্ষেত্রে পরীক্ষণার ক্ষেত্রে মতৈক্য সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথের কত যত্নশীল পরীক্ষা তাঁরই জীবদ্দশায় সহযোগিতার অভাবে 'মরুপথে হারাল ধারা—' সে আক্ষেপ বিশ্বভারতীর প্রান্তর অতিক্রম করে, শিক্ষাজগতে পৌঁছায় কিনা জানি না। গান্ধীজির নঈ তালিম নবত্বর নির্মোক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কেন তার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে শিক্ষাবিজ্ঞান এতটুকু আগ্রহ দেখায়নি। অশ্বিনীকুমারের "সমগ্র ছাত্র" গড়ার যে প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দর মনে আশার সঞ্চার করেছিল তার সূচনা ও পরিণতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ নিতান্ত উদাসীন। ভারতপ্রান্তে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দর পথ নির্দেশ মেনে শ্রীমা যে শিক্ষা-পরীক্ষায় আত্মনিবেদন করেছেন তার মাহাত্ম্য শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভব করা শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্য-তালিকায় স্থান পায়নি।

সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ধাতের বাইরে, অব্যবহারের ফলে ধাতুতে মরচে ধরে গেছে। পরীক্ষণার ক্ষেত্রে—অন্য দেশের প্রধানতঃ বিলাত-আমেরিকার প্রয়াস-প্রচেষ্টার উপর একান্ত-নির্ভরতা। পরনির্ভরতা অস্পষ্টতার নিত্যসঙ্গী—স্বাভাবিক পরিণতি। ফলে স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা আমাদের শিক্ষা-জগতের মনকে আন্দোলিত করছে না। তত্ত্বের গভীরতায় ও চিন্তার ব্যাপকতায় স্বামীজির শিক্ষাতত্ত্বকে ধরে এমন মানসিক প্রস্তুতি আমাদের হয়তো সহজে হবারও নয়।

অথচ মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রোঁলাকে তিনিই লিখেছিলেনঃ If you wish to know

India, study Vivekananda, for everything in him is positive.

"রাশিয়ার চিঠিতে" যে উদ্বেগ তার তুলনায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কি দৃঢ়প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ঃ

"আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান'।

...তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে।"

"বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী, যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্গুলকে নয়।"[১]

অনুধ্যান করতে করতে লিখেছেন মার্গারেট নোবল ঃ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ এই দেশে আমাদের অনেকের নিকট তৃষ্ণার্তের কাছে সুশীতল জলের মতো তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে। একটা ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং হতাশার ভাব গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপের মানসিক জীবনকে বিচলিত করিতেছে, আমরা অনেকে কিছু কাল ধরিয়া সেই বিষয়ে সচেতন হইয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব তাঁর বাস্তববোধে, তাঁর আপন অনুশীলনে ; সমাজ, মানুষ, দেশ ও ভগবানের সংযোগসূত্র আবিষ্কারের নিষ্ঠায়—একাধারে ভারতীয় শিক্ষাদর্শের ও ভারতের আন্তর্জাতিক ভূমিকা নির্ণয়ের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধানে, এক অপরূপ নেতৃত্বের মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন। "নরেন লোকশিক্ষা দেবে"

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

এই লিখন মানুষের চিন্তা ও কর্মের ইতিহাসের এক দুর্লভ ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাতন্ত্রে প্লেটো, একুইনাস, ভিট্টরিনা দি ফেলট্রা, বেসডো, রুশো, পেস্তালৎসি, হার্বার্ট, মন্টেসরী, ফ্রোয়েবল, ডিউঈ তত্ত্বগত, প্রয়োগগত যেসব সূত্র মানবজাতির সামনে উপস্থাপন ক'রে গেছেন সে সব আপন অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্টভাবে দেখে নেবার সুযোগ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঊনচল্লিশ বৎসরের জীবনে পেয়ে গিয়েছিলেন।

শিক্ষাদর্শন মাত্রই জীবনদর্শনের ভিত্তিনির্ভর। তাই প্লেটোর সুশাসন কামনা চেয়েছে গার্ডিয়ানদের কঠিন প্রস্তুতি। বাছাই করা সেরা ক'জনের জন্য নিখুঁত শিক্ষাদর্শ রচনা করতে চেয়েছেন অভিজাত গ্রীক লোকনেতা। কার্যকালে ডাওনোসিউসের কাছে বন্দীদশাটুকু হয়েছিল তাঁর প্রাপ্য। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন মেনে গোটা গ্রীক দর্শন সাম্রাজ্য বিস্তারের মূঢ়তায় দিশাহারা হয়ে মরেছে। গ্রীক সভ্যতাবাদীর দল বিপুল আয়তন ভূখণ্ডগুলির উপর অধিকার বিস্তার করতে গিয়েছিলেন; ফলে চিরকালের জন্য ইতিহাসের পট থেকে গ্রীক অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। বেদনার্ত চিত্তে পরবর্তী কালের গ্রীক জীবন-অনুরাগী লিপিবদ্ধ করেছেনঃ এই বিপুল পরাজয়ের মূল কারণ অলিম্পীয় দেবতত্ত্বের বা গ্রীক নগররাজ্যের শিথিল ভিত্তি নয়; এর কারণ গ্রীক সভ্যতাবাদ হেলেনিজমের প্রসারের প্রাবল্য—যা মানুষকে পূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে পারেনি; অথচ শিক্ষা দিতে এগিয়েছে।[১]

১ "Failure not only of Olympian theology and of the free state...but failure of human Government to achieve a good life for man...lastly the failure of the great propaganda of Hellenism in which a long drawn effort of Greece to educate a corrupt and barbaric world seemed only to lead to the cor. uption or barbarization of the very ideals it sought to spread."

—Gilbert Murray: *"Five Stages of Greek Religion"*

প্রধানতঃ ধর্মানুশীলনকামী একুইনাস্ চেয়েছিলেন যুক্তি-বিজ্ঞানের নিখুঁত রীতির অধিকার। গোড়ার দিকে ঈশাহী ফাদাররা চাননি যীশুর পূর্বযুগের চিন্তাধারার চর্চা। টমাস একুইনাস্ এবং তাঁর স্কলাসটিকস্ গোষ্ঠী সে যুগের ইয়োরোপময় যীশুর জয়গানের বুদ্ধিগত ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ব আর বুদ্ধিপ্রধান জীবন-দর্শনের সংঘাত ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধি আর যুক্তির শস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের প্রাকার গড়তে এসেছিলেন সন্ত একুইনাস্। ধন্য জীবন এই সন্ত বুদ্ধির পাঠপীঠে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগে বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয়বাদের সূচনাই ক'রে গেছেন। তাঁর আপন শিক্ষা-ধারাকে লঙ্ঘন ক'রে আপন জীবন দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেছেন যুক্তি-বিজ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব[১] যাকে অতিক্রম ক'রেই উচ্চতর চিন্তায় মানুষ সত্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে।

দি ফেলট্রা আর বেসডো ইতিহাসের পাতায় আছেন; শিক্ষা-চিন্তার কোন তত্ত্ব আজ আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না বস্তুনির্ভর আর হস্তশিল্পের বিশেষ শিক্ষাধারায়। 'অভিজ্ঞতা-তত্ত্ব' এসে এদের ম্লান ক'রে দিয়েছে।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের তত্ত্ব আর কেউ নেয় না। আবেগমুখর এক উত্তেজনার জনক "কর্তব্য, কৃত্য, বোঝা ও অন্যান্য ভদ্র জীবনের আনুষঙ্গিক"[২] বাদ দিয়ে পথ চলেছেন সমাজ ভাঙার বেদনায়, সমাজে ঠাঁই পাওয়ার দুর্বলতায়। সমাজের ভাঙন অব্যাহত আছে—শিক্ষা-অঙ্গনে তত্ত্বটুকুর প্রবেশাধিকার সত্ত্বেও।

১ aridity of the method of logical disputation was transcended by the higher contemplative knowledge of spiritual reality.

২ he loved tramping alone, as he once said, uncumbered by 'duties, business, luggage, and the necessity for playing the gentleman".

—L. Smith : "*Education*", p. 37.

উদাহরণ বাড়ালে শিক্ষাতত্ত্বের বাঁধাধরা পথের পথিকরা বিব্রত বোধ করবেন, শিক্ষাতত্ত্বের চৌহদ্দির বাইরের ভদ্র-পাঠক অযৌক্তিক বিবেচনা করবেন। সুতরাং প্লেটোর কল্পিত গার্ডিয়ানদের জীবন-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বরাহনগর মুন্সীদের বাড়ীর মঠের বাস্তব চিত্রটুকু একবার দেখা যাক ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়াই সকলে ধ্যান জপ করিতেন। ভিক্ষা যাহা জুটিত, তাহাই পালাক্রমে রন্ধন করিয়া সকলে আহার করিতেন। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। চাল জুটিত তো নুন জুটিত না—এমন অভাব। কোনও দিন বা শুধু ভাত। কোনও দিন বা তেলাকুচা পাতা-সিদ্ধ ও ভাত আহার করিয়া সকলকে থাকিতে হইত।[১]

একটি মাত্র 'সার্বজনীন' কাপড় ছিল, বাইরে যেতে হলে মঠবাসীরা সেটি পরে বাইরে যেতেন। নইলে কৌপিন বাস ছিল সম্বল।

স্কলাস্টিক সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রবিহিত দিনকৃত্যে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। একুইনো-বংশের টমাস "ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত" লিখতে চেয়েছিলেন পরম নিষ্ঠায়। লেখা শেষ হবার পর আর সময় পাননি সন্ত টমাস তাঁর সত্যাসত্য নির্ণয়ের। তবে যাঁর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তাঁর সান্নিধ্যধন্য হবার পর বলেছিলেন ঃ যা কিছু লিখেছি তৃণবৎ মনে হচ্ছে সে সব।[২]

সেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবোধের রহস্যে শিক্ষা পাবার পরই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্ব পরিক্রমায় মন দিয়েছিলেন। একটি চলন্ত

১ স্বামী শংকরানন্দ, "স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কথা", পৃ: ৭০-৭১

২ "Such secrets were revealed to me this morning, Reginald, that all I have written now appear to be of little value. No more work, Reginald...All my books—they now seem to be so much straw.'

=Brendan Larnen and Milton Lomask :

—"*St. Thomas Aquinas and the Preaching Beggars*", p, 181—182.

বিশ্বকোষ, একটি চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে তাঁর এই পরিব্রাজন আপন শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি সুগভীর প্রত্যয়বোধের স্বাক্ষর বহন করে।

শুধু একান্ত আপন আচরণে নয়, সমগ্র রামকৃষ্ণ-আশ্রিত মানবতার জন্য তাঁর একই নির্দেশঃ শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র। তাঁর ভাষায়—

"ব্রহ্মচারীরা কালে কালে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে।"

শিক্ষানায়ক রুশো তাঁর মানসপুত্র এমিলকে দেশ-ভ্রমণ করতে দিয়েছিলেন। দেশাচার, সংস্কৃতি, আদবকায়দা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমরা স্বামী বিবেকানন্দর ভারত পরি-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জেনেছি যে ভারতবর্ষের গোটা জীবনকে চেনা, তার সামাজিক সমস্যার সব খুঁটিনাটি বোঝা—ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনধারার কথা, ব্যর্থতা-বেদনা-আশা-অভীপ্সার মূল কি তা জানার প্রবল তাগিদে তিনি তাঁর পুণ্যযাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারত পরিক্রমার পর ব্যক্তিগত জীবন গড়ার সংকীর্ণ তাগিদে নয়, সমগ্র দেশের পুনরুজ্জীবনের[১] পবিত্র ব্রতে পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। প্রথম পুণ্যযাত্রায় তাঁর অগ্রপথিক ছিলেন ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শংকর। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বিশ্ব-পরিক্রমায় তিনিই পথ কেটেছিলেন।

শিক্ষাতত্ত্ব কল্পনা করা আর শিক্ষার ব্রত উদ্‌যাপন্ করা দুটির মধ্যে পার্থক্য কম নয়। শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসে অনেকেই স্থান জুড়ে আছেন—তাঁদের সাধন বা বিনয় আমাদের সামনে কোন উজ্জ্বল

১ "In him the national destiny fulfilled itself".

—Sister Nivedita : *"The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work"*.

দৃষ্টান্ত স্থাপন করে না। গ্রীক কবি হেসয়ড[১]-এর ভাষায় এঁদের পরিচয়ঃ

নাইকো সাধন, নাইকো বিনয়, শুধুই অহংকার
তাহার তরে চলা থামা দুই-ই হতাশার
ব্রত মানার কথা শোনায়, অনিচ্ছা তাহার ॥

পেস্তালৎসী, ফ্রোয়েবল, মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্ব পরীক্ষামুখী চিন্তার ফলে গড়ে উঠেছে। হেসয়ড্-এর ভাষায় এদের পরিচয় করানো যায় এ ভাবেঃ

নিজে খুঁজে পথের দিশা পায়নি যে পথিক
অগ্রগামীর চলার পথে পাবেন খুঁজে দিক্
ব্রতী হবার সুযোগ তাঁহার মিলিবে বারংবার ॥

আর লোকোত্তর প্রতিভায় শিক্ষাতত্ত্ব যাদের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে পথ রচনা করে তাঁদের পরিচিতি হতে পারে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু যীশু এঁদের কথাই স্বতঃ এ প্রসঙ্গে মনে জাগেঃ

কার্যধারা বিচার করা বিশেষ কঠিন নয়,
নিষ্ঠা দিয়ে নিজের পথ করেন যে নির্ণয়,
ব্রত পালন করার আশা পূর্ণ হবে তাঁর ॥

স্বামীজির শিক্ষাজীবন

॥ গৃহ-পরিবেশ, দেশ-পরিবেশ ও স্বামীজির মানসিক প্রস্তুতি ॥

হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস, আত্মা আপন পরিবেশ সন্ধান করে। আপন কর্মফল খণ্ডন এবং কর্ম প্রবর্তনের প্রেরণায় কাম্য বংশগতি খোঁজা আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। এর বিচারে স্বামীজির শিক্ষাজীবনের সূচনায় মহৎ গৃহ-পরিবেশ লক্ষণীয়।

১ Hesoid, the epic poet of Greece.

সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত। পার্শী ও ইংরেজী কেতার সঙ্গে পরিচিত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ। পাশ্চাত্ত্য উদারনৈতিকতার ভারতীয় প্রতিরূপ। সহধর্মিণী ভুবনেশ্বরী দেবী—পৌরাণিক বিশ্বাসে দৃপ্ত নারী।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম এই পরিবারে।

সমগ্র মধ্যযুগেব ইতিহাস তার বিশেষত্বগুলির ছাপ রেখে গেছে সিমুলিয়ার এই পারিবারিক জীবনে।

ঘোড়ার গাড়ী আছে—সহিস, আস্তাবল আছে। বৈঠকখানা আছে। নানান জাতের মানুষের আনাগোনা আছে। সে জন্য পৃথক্ পৃথক্ হুঁকোর ব্যবস্থা আছে।

আশ্রিত আশ্রিতা আছে। পরভৃতিকার মত জীবন তাদের কারুর কারুর। কারুর আছে যৌথ পারিবারিক জীবনের দায়-দায়িত্ব নেবার মনোভাব।

কলকাতা শহরে হিঁদুয়ানী রক্ষা করে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী। আবার একটু বেশী পাকাপোক্ত সাহেব-ঘেঁষা নর্মাল স্কুল আছে।

বাড়ীর ভিতরে রামায়ণ গান, ব্রতপালা, গঙ্গাস্নান—বার-বাড়ীতে মুসলমান অতিথিদের আনাগোনায় আলবোলা, জর্দা কিমাম, আতর-এর ঘটাও কম জোর নয়। আবার নতুন ইংরেজীনবিশদের রীতি অনুযায়ী সাহিত্য-আসরও বসে।

॥ মায়ের স্নেহে ॥

একটি সংবেদনশীল মনের পক্ষে কি বিপুল বিস্ময় এই পরিবেশ বহন করতে পারে! নরেন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে শিক্ষার সমগ্র রূপটির মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। আভিজাত্যের আর এক ধাপ ওপরে বাস ক'রে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এত নিবিড়ভাবে চিনতে পারেননি বাল্যে, প্রথম কৈশোরে।

বিবেকানন্দ-পরিবারটি সংহতিতে মজবুত। তাই বৃহৎ গোষ্ঠী-জীবনে নরেন্দ্রনাথের সহজাত অধিকার। আবেগজীবন বহু মানুষের আনাগোনায়, সান্নিধ্যে পুষ্ট।

মা—ভুবনেশ্বরী। মধুর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। পুরাতন সংস্কৃতির লিপিবদ্ধ ঐতিহ্য রামায়ণ-মহাভারত ছাপা হয়ে গেছে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে। মা পৌঁছে দেন এই ছন্দোবদ্ধ প্রাণরসকে।

"বিবেকানন্দ-জননী ভুবনশ্বরী—মাতৃত্বের ও সুগৃহিণীত্বের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার রক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। পুত্রের প্রাণধর্ম বলিষ্ঠতার সন্ধান পেয়েছে। একই সঙ্গে আত্মিক রক্ষাকবচ মিলেছে—ভাগবত বিশ্বাসে, মাতার গভীর নিষ্ঠার স্বরূপ আবিষ্কারে।"[১]

শিবের সঙ্গে যোগ আছে এই বোধে মা দুরন্ত ছেলেকে সামলাতে গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দেন। মুখে বলেন: শিব শিব।

কথকঠাকুর বাড়ীতে এসে পুরাতন ভারতের চিত্র সোনা রঙে এঁকে ধরেন—মানসদিগন্তে তা নিশ্চিত স্থিতি পায়। বর্তমানের সঙ্গে অতীত এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, কথকঠাকুর বলেন—হনুমানজী কলাবাগানেই থাকেন।[২] নরেন্দ্র খুঁজে পায় না সারা দিনেও। মার কাছে এসে তারই কথা তোলে: "কই মা আমি কেন দেখতে পেলুম না?"

বুদ্ধিমতী শিশুর বিশ্বাসে আঘাত দিলেন না।

বললেন, "হ্যা বাপ, তুমি ঠিকই শুনেছ। তবে আজ নিশ্চয় রামকার্যে কোথাও গেছেন"

১ শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ দাসানুদাস বিবেকানন্দ।"
—"ভাবমুখে" পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, পৃঃ ২৯

২ সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী. 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ', পৃঃ ৬

এই ভাবে ভারতীয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসগুলির কথা পরম স্নেহে মায়ের কাছ থেকে আয়ত্ত করলেন স্বামীজি। শিথিল-বিশ্বাস দুর্বল-যুক্তি মায়েদের কাছে শিশু কিছু পায় না।

জানি না সনাতন ধর্মের আচারগত ধারা অনুসরণে অপরিহার্য-ভাবে ধর্মের শাশ্বত ও সত্য পরিচয় মেলে কিনা? তবু মনে হয় সমন্বয় সর্বদাই আপন সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক ভিত্তিভূমির যথার্থ নির্ণয়-সাপেক্ষ। নিজের ঘর চিনতে হবে। নিজের উত্তরাধিকারের পবিত্রতা বুঝতে হবে ; সম্পদ্ বলে তাকে রক্ষা করতে হবে।

এই উত্তরাধিকার নরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছ থেকে পুরোপুরি পেয়েছিলেন। পরে বলেছিলেনও সে কথা।

॥ বাপের পাশে ॥

ঘটনাচক্রে বিবেকানন্দর পিতা বৈভবে আত্মহারা হননি। পারিবারিক প্রীতিবন্ধনের দীর্ঘ প্রবহমান সানন্দধারায় বিশ্বাসী পিতা। পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করেননি তিনি ব্যক্তিত্বের অস্মিতায়। একটি প্রবল সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অখণ্ডতার বোধকে দৃঢ় ক'রে তুলেছিল বিবেকানন্দর জীবন-প্রভাতে।

রায়পুরের দিনগুলি বিশেষভাবে স্মরণে জাগে।

"অখণ্ড অবসরে পিতা তুলে নিলেন পুত্রের শিক্ষার ভার আপন হাতে ···। নরেনের বিকাশ-উন্মুখ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশ্বনাথ তাকে শ্রেণীগত বিদ্যার ক্ষুদ্র আবেষ্টনে বদ্ধ না রেখে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনের বই পড়াতে করলেন সুরু···

শুধু তাই নয় তর্কের সাহায্যে স্বাধীন মত প্রকাশের দিলেন অবাধ সুযোগ।

কলকাতায় ফিরে এসেছে নরেন্দ্রনাথ।

এটর্ণি বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় আসে কত জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক। হয় কত আলাপ-আলোচনা। পিতার আদেশে নরেন্দ্র সেই সভায়

থাকে উপস্থিত···পিতৃবন্ধুর বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনাকালে আহূত নরেন্দ্রনাথ এসে যোগ দিল। তার জ্ঞান-গভীরতা, স্থির গাম্ভীর্য লেখকের চোখে জাগাল আশার ঝলক।

আবার তিরস্কারের বদলে····কৌশলে শিক্ষা···।

সঙ্গীরা হয় ব্যস্ত···নরেন্দ্র স্তব্ধ। খুঁজতে খুজতে নজরে পড়ে যায় কারণ···দেয়ালে লেখা আছে 'নরেন্দ্রবাবু আজ তার মাতাকে কটু কথা বলিয়াছে'।

॥ বাড়ীর বাইরের দেশ ॥

বাড়ীর বাইরে দেশ জেগে উঠেছে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায়। একটি ধারা রয়েছে ইয়োরোপ-বিমুখ হয়ে—যাদের চিত্ত নতুনের প্রবলতায় সংকুচিত। যাদের দুশ্চিন্তা—'মেয়েরা সব এ বি শিখে চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে।'

আর একটি ধারা ইয়োরোপ-পাগল। যারা অন্ধের মত পরানুকরণে ব্যস্ত, সোনার শিকল পরে, দেশের সব কিছুকেই তারা বর্জন করতে সচেষ্ট।

দুটি ধারার ধারকদল হলেন নতুন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী।

তাঁদের কেউ কেউ নেতৃস্থানীয়—ধর্মের সংস্কার করতেও প্রস্তুত, ইংরেজী শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের সম্ভাবনায় স্থির বিশ্বাসে তাঁদের মতে 'অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য হলেও হিন্দুধর্মের কিছু সংস্কারসাধন অত্যাবশ্যক।'[১]

বেদের পুরাণের সার খুঁজে বার করার প্রেরণায় জন্ম নিল ব্রাহ্ম-সমাজ। হিন্দুসমাজের আচারগুলি শোধরানো—পুতুল পূজার অভ্যাস খারিজ করা, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে বরণ করার জন্য আধুনিক মনোভাব অর্জন করা—এই সব উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি, পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে লাগল।

১ প্রবোধচন্দ্র সেন: "বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা" দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭০, পৃঃ ১৫১

সমাজ-সংস্কার, কল্যাণ কর্ম, লোকহিত সংগঠন, এই সব নূতন ধারায় ইয়োরোপীয় সমাজ যে ভাবে তাদের প্রাচীন অস্তিত্বটাকে ঝেড়ে ফেলে শিল্পমুখী জীবনধারাকে গড়তে চেয়েছিল S.P.C.K.[১] প্রভৃতির মাধ্যমে, ভারতবর্ষেও তার ভাবতরঙ্গ এসে পৌঁছলো।

রামমোহন ঘোষণা করলেন—"স্বাধীনতা নয় পরস্পর নির্ভরতাই" সভ্যতার লক্ষ্য।[২] ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার দাবী করলেন মূলগত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। শিল্প বা ফলিত জ্ঞান হবে এর অনুগামী।[৩]

এই পরিবেশের সামাজিক জটিলতার উত্তরাধিকার লাভ করলেন শিক্ষার্থী বিবেকানন্দ।

॥ স্বামী বিবেকানন্দর মানসিক দিগন্ত ॥

এই বিপুল ভাবনার আবর্তে সহজেই একটি বৃত্ত রচনার অনায়াস-প্রবণতা জন্মায়। নরেন্দ্রনাথ যে চাইছিলেন মহাবৃত্ত রচনার স্বাদ! তাই ইয়োরোপীয় দর্শন, ব্রহ্মচিন্তা এসব নিয়ে মন ভরে ওঠেনি তাঁর। তিনি সকল দর্শন, সকল তত্ত্বের সংবেদ্য কি তাই নিরূপণ করতে চাইলেন।

এই নিরূপণকালে তাঁর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে কৌতূহল নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সভায় সমিতিতে প্রজ্ঞাবানদের কাছে—নিভৃতে সাধকজনদের কাছে আপন হৃদয়ের আকূতি জানাতেন।

মূর্ত হয়ে উঠল ক্যান্টের প্রশ্ন : কোথায় সেই অনুপস্থিত গৃহস্বামী যাঁর বাগান এই সুন্দর শোভন ধরিত্রী জুড়ে।[৪]

স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইল জীবন-জিজ্ঞাসা। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এঁদের লেখা বই পড়লেন ভারতীয় জীবনসত্যের স্বাদ পাবার আশায়। পড়লেন ইয়োরোপীয় চিন্তানায়ক—হিউম, হেগেল, ক্যাণ্ট প্রভৃতির অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবাদ, দ্বান্দ্বিক মতবাদ বুঝতে চাইলেন।

১ Society for Promotion of Christian Knowledge,
২ Not independence but interdependence of nations.
৩ Technology should be the hand-maid of fundamental science.
৪ "Where is the absentee landlord of the garden".

আচরণের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সত্তার বৈভব বুঝবার প্রয়াস সুরু হল। ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্মচিন্তার উপাসনা সভায় যোগ দিয়ে তৃষ্ণা বাড়লো, মিটলো না।

প্রথম যৌবনের সমস্ত ব্যাকুলতা এই ভাবে সমর্পিত হল অজ্ঞাতকে জানার কাজে জীবন-রহস্যের সূত্র আবিষ্কারের প্রেরণায় নিবেদিত হল সমগ্র অস্তিত্ব।

জিজ্ঞাসুর লক্ষণ সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসুর ক্রম সম্বন্ধে বোধ হয়নি। জিজ্ঞাসাই একমুখী হয়ে ওঠেনি। তাই উত্তর গ্রহণের যোগ্যতাও অর্জিত হতে পারেনি।

এমন সময়ে এল আত্মস্বরূপের সান্নিধ্যের পরম শুভক্ষণ। সামাজিক, পরিবারগত, বিদ্যালয়গত, পুঁথিগত সকল শিক্ষাপদ্ধতির বাহ্য মাধ্যম অতিক্রম ক'রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কাল সূচিত হল। শ্রীঠাকুরের ভাষায় "সময় হল"।

সকল শিক্ষার্থী, সকল শিক্ষানায়ক জীবনে এমন একটি প্রেরণা, এমন একটি ক্ষণে এসে থমকে দাঁড়ান; কেউ ঐকান্তিকতা আর বিচারবোধের কোন বিশেষ সূত্রে বিভোর হয়ে পথ হারান—কেউ সূত্রতে না থেমে সমগ্র আস্তরণটিকে গ্রহণ ক'রে ধন্য হন। মানবতা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁদের রূপ দেখে, সেই কালে আর চিরকাল ধরে।

॥ অধ্যাত্ম শিক্ষার আনুকূল্য ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতঃসান্নিধ্যে আসার পর অধ্যাত্ম শিক্ষার বিপুল আনুকূল্য পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ধন্য হয়েছিলেন। বৈদিক যুগের সর্বপ্রকারের শিক্ষাধারা নিয়ে তিনি অনুশীলন করেছেন; ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করা, জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য সৎকর্ম প্রবর্তন করা, স্বাধ্যায় ও তপস্যাদি করা, অনিকেত সর্বত্যাগী হয়ে কর্মপ্রবণতার অভ্যাসমুক্ত হওয়া, এসব সাধন-জীবনের গূঢ় কথা। অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রমগুলি অতিক্রম করতে

স্বামীজিকে কি ভাবে সাহায্য করেছে তা জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে আছে।

সংক্ষেপে এর তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে কয়েকটি ধারণা স্বচ্ছ হয়ে আসে।

স্বামীজি জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবনকে বলেছেন: 'প্রতিকূল অবস্থা-চক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ বিকাশেরই নাম জীবন।'

এই কারণে জীবনবোধ হল সবচেয়ে বড় বোধ। ব্যক্তি-জীবনে তাই বস্তু বা উপকরণগত সহায়তার চেয়ে বিদ্যার সহায়তার মাহাত্ম্য বেশী। আর আধ্যাত্মিক দান বিদ্যা দানের চেয়েও মহৎ দান।

অধ্যাত্ম শক্তির জন্য দম শমাদি ষট্ সম্পত্তি প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যত্র অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন নিবিড়তর। দেবতারাও "ক্ষীণে পুণ্যে"—পুণ্য ক্ষীণ হওয়াতে মর্তে পুনরায় আসেন—তাঁরাও চান এই ভারতভূমিতে স্থান পেতে।

স্বামীজির নিজের ভাষায়: যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি বলা যেতে পারে···এমন কোন দেশ থাকে যেখানে মনুষ্য জাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি···ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ, আধ্যাত্মিকতা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে তবে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষের—বন্ধুগণ বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার শেষ পৈঁঠায় স্বামীজি পা দিতে পেরেছিলেন এবং তাতে স্থিত হতে পেরেছিলেন প্রধানতঃ গীতা-উপনিষদাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপলব্ধি ক'রে। আর সেই বোধে প্রাক্তন দুই অবতারপুরুষ ভগবান বুদ্ধ এবং ভগবান যীশুর অনুধ্যান সংযুক্ত ক'রে।

উনচল্লিশ বৎসর ব্যাপী জীবনে অখণ্ড ঈশ্বরবোধে যুক্ত থেকে নিঃসন্দেহে তিনি অধ্যাত্ম শিক্ষকরূপেও অদ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন।

আগামী যুগের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যাত্ম শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বে আস্থা স্থাপন করবেন যে পরিমাণে মানুষের দেবত্বের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সেই অনুপাতে বাস্তব হয়ে উঠবে এ আমাদের বিশ্বাস।

প্রসঙ্গতঃ মদীয় গুরুদেব-এর একটি প্রবন্ধে ধর্ম প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ একথা ধ্রুব সত্য যে ধর্ম, তার মূল কথা নিয়ে আমাদের চেতনা যত দিনের তত দিনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। আর সে এত দৃঢ়-মূল যে কোন মানবিক বা জাগতিক শক্তিই সে দৃঢ় ভিত্তিকে বিচ্যুত করতে পারবে না।[১]

॥ ভাবগত সংহতি, বিশ্বসৌভ্রাত্র ধর্ম-শিক্ষা ॥

সাম্প্রতিক শিক্ষাচিন্তার তথ্য এবং পদ্ধতির প্রাধান্য অবিচলিত আছে। তবু মূল্যবোধের প্রসঙ্গে কিছু নূতন ধারণা এবং মনোভঙ্গীর অনুশীলন সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অবহিত এবং যত্নশীল হয়ে উঠছেন। তারই অঙ্গরূপে ভাবগত সংহতি, বিশ্বসৌভ্রাত্র, ধর্ম ও নীতিশিক্ষা আজ শিক্ষাতন্ত্রে স্থান ক'রে নিতে চাইছে।

সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, সমাজ-বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রয়োজন পূরণ করতে পারতো। কিন্তু শিক্ষাতন্ত্র অন্ধ-ভাবে নানা গোঁড়ামীর সঙ্গে যুক্ত। সে বন্ধন এড়ানো কঠিন। সাহিত্য এক বিশেষ মানসিকতা ও মূল্যবোধের জন্য রচিত হয়! তার ব্যাখ্যাও চলে ঐ মানসিকতার জট পাকানো বাঁধনের স্বপক্ষে। সুতরাং মানবতার ক্রমবর্ধমান উদারমুখী মনোভঙ্গী তাতে ব্যাহত হয়। শুধু ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাস ও সমাজ-

[১] Religious sentiment in its broadest sense and in its primitive form of superstition, has, as we have seen, an origin almost as ancicnt as conscience. It is universally distributed and solidly rooted. No catacylisms of human or material origin can shake it."

—Le Oomte du Nony : "*The human destiny*", p. 173

বিদ্যার ক্ষেত্রেও মূল্যবোধ অনুযায়ী তথ্য ও বিশ্লেষণ রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

স্বামীজির ভাবাদর্শে এই স্বখাত সলিলে ডুবে মরার দুর্বল পরিস্থিতিকে বিচার করা যাক ঃ

আমাদের মানুষকে এমন এক জায়গায় লইয়া যাইতে হইবে যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই। তবুও এই আদর্শে পৌঁছাইতে হইলে বেদ, বাইবেল ও কোরানের সামঞ্জস্য প্রয়োজন। মানুষকে শিখাইতে হইবে যে বিভিন্ন ধর্মগুলি এক বিরাট ধর্মের অভিব্যক্তি। সেই ধর্ম হইল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরম একতা। ইহা মনে রাখিয়া যে যাহার নিজের পথ বাছিয়া লউক। আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লাম এই দুই বৃহৎ আদর্শের সম্মিলন প্রয়োজন। বৈদান্তিক অস্তিত্ব ও ইস্‌লামীয় সংহতি—ইহাতেই দেশের আশা।

এ প্রত্যয় কত দৃঢ় তার পরিচয় মেলে স্বামীজির আর একটি বক্তৃতায় যাতে তিনি অবতার-সান্নিধ্যর অনুভূতির কথা নিবেদন করেছিলেন ঃ

I began to go to that man, day after day, and I actually saw that religion could be given. One touch, one glance, can change a whole life. I have read about Buddha and Christ and Mohammad, about all those luminaries of ancient times, how they would stand up and say, "Be thou whole," and the man became whole. I now found it to be true when I myself saw this man, all scepticism was brushed aside.

আর জীবনপথে!

কাশীপুর বাগানে সাধু অঘোরনাথ প্রণীত "বুদ্ধচরিত" পাঠ করায়, "ললিতবিস্তরে"র শ্লোক—ইহা মনে শুষ্যতু মে শরীরং···

কণ্ঠস্থ করায়—গোপনে ১৮৮৬-র এপ্রিল মাসে বৌদ্ধগয়া যাত্রায় এবং সেখানে বোধিদ্রুম পাদদেশে ধ্যানাদির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধমাহাত্ম্য আস্বাদন করেছিলেন।

ওঁ নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্মুদ্ধস্‌স—এই বৌদ্ধ প্রশস্তিটির অর্থ সেই সম্যক্ সমুদ্ধ ভগবান তথাগতকে প্রণাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রণতি : ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নম-র বুদ্ধপ্রণতির গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পূজারীতি প্রসঙ্গে ও তৎসঙ্গে বিধি লক্ষণীয়—"ঠাকুরঘরের পূজা-সামগ্রী বা রীতি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন নির্দেশ নাই—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমরা তাঁহার পূজাদি করি।"

আবার অন্যত্র 'Buddhism is the fulfilment of Hinduism' এরূপ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দর বুদ্ধপ্রণতি নিবেদিত হয়েছে।

যীশুর কথায় তো স্বামীজি চিরতন্ময়।

টমাস এ. কেম্পিসের লেখা 'খ্রীষ্টানুসরণ' নিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে এসেছেন। খ্রীষ্টপ্রেমিক টমাস সত্তর বৎসর কাল সেণ্ট্ এগনেস সংঘে থেকেছেন—মঠের নিত্যকর্ম ছাড়া ব্যক্তিগত জপধ্যান, তপস্যায় দিনরাতগুলি ভরিয়ে তুলেছেন। বাইবেল অনুলিপি করেছেন আর বাইবেলাদি পড়ে প্রভু যীশুকে বুঝতে চেয়েছেন; ঘটনাচক্রের কোন পরিস্থিতি আর প্রসঙ্গে প্রভুকে কি ভাবে অনুসরণ করতে হবে তারই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সাধক টমাসের কাছে। খ্রীষ্টানুসরণ এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন ক'রে চিরকালের লিপিবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছে।[১]

১ "The Imitation of Christ" is a work worthy to rank second to Bible and is likely to survive in the literature of the world as long as the Bible itself." —From the Preface of 15th Edition.

প্রভু যীশুর কথা বলতে বলতে তাঁর ভাবদ্যোতনায় প্রেমগাম্ভীর্যে স্বামীজির মুখশ্রী অপরূপ হয়ে উঠতো। বাইরের লোক আন্তরসম্পদ কি তা জানে না—প্রশ্ন করতো, আপনি কি যীশুর ভক্ত? চোখের জলের ধারায় হিন্দু সন্ন্যাসী বলতেন—"আজ যদি প্রভু যীশু আমার সামনে থাকতেন তাহলে চোখের জলে নয় বুকের রক্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে কৃতার্থ হতাম।"

আঁটপুরে গুরুভাই বাবুরাম মহারাজের মায়ের আহ্বানে রাত্রির তপস্যায় সমর্পিতপ্রাণ হয়েছিলেন স্বামীজিরা। সেখানে বার বার আসছিল প্রভু যীশুর ভাবতরঙ্গ। স্থান-কাল-বোধ ফিরে আসার পর সচেতন মন যখন লক্ষ্য করল, সে রাত্রি ছিল প্রভু যীশুর ধরায় অবতরণের চিহ্নিত দিন, তখন 'জয় প্রভু' ধ্বনি উঠেছিল অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে।

তাইতো ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি—Religion is the manifestation of divinity already in man.

নিজ ধর্মের উত্তরাধিকারের পবিত্রতা বুঝবার প্রেরণায়, শুধু মাত্র আপন সম্পদ রক্ষা করার কথা তাঁর মনে জাগেনি। অন্যের ঘরে আচারের সত্য, অভ্যাসের পবিত্রতা, অনুভূতির সাক্ষ্য কোথায় তা ধরতে হবে। এটি না হলে বিভিন্ন ধর্মের বিচারের ও আচারের সুন্দর তোড়া সাজানো হবে মাত্র। মানবসাধারণের চিরনির্ভর "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠ্যতেকঃ" পেতে হলে সব ভাব-তরঙ্গর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে হবে। ধর্মের ভিত্তিভূমি এক। 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ'—সকলের মনের অন্তর্যামী এক, পুণ্যবান্‌দের স্মৃতি ও জ্ঞান এতেই।[১]

১ তুলনীয় "In silence and quiet the devout soul advances, and learns the hidden things of the Scriptures."

—Thomas A. Kempis : "*Imitation of Christ*", ch. XX, 6, p. 35

তিনিই তো কথা কন একান্তে। শিক্ষায়তনের পাঠের প্রগতিকে সব দিকে ছাপিয়ে যায় তাঁর শিক্ষা। তিনি যখন শেখান তখন যুক্তি স্তব্ধ হয়, তর্ক থেমে যায়।[১] স্বামীজি বিবেকানন্দ তাঁরই শিক্ষা চেয়েছিলেন যীশুর কাছে।

পরবর্তীকালে স্বামীজি এই শিক্ষার মর্মবাণী পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বধর্মসভার বেদীতলে :

প্রত্যেকে অপর ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে ভাল করিয়া বুঝুন, কিন্তু নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, নিজের ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়িয়া, বিশ্বধর্ম সম্মেলন যদি জগৎকে কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই—বিশ্ববাসীর কাছে উহা প্রমাণ করিয়াছে যে সাধুত্ব, পবিত্রতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য পৃথিবীর একটি মাত্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। প্রত্যেক ধর্মেই মহনীয় চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রামাণিক তথ্য সত্ত্বেও যদি কেহ অন্যান্য ধর্মের ধ্বংস ও একমাত্র নিজের ধর্মটিরই টিকিয়া থাকার স্বপ্ন দেখেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক অনুকম্পা বোধ করি এবং তাঁহাকে বলিতে চাই যে প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও অচিরেই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লেখা থাকিবে—'সংগ্রাম নয়, সাহায্য', 'বিনাশ নয়, সমাদর', 'মতদ্বৈধতা নয়, সামঞ্জস্য ও শান্তি'।

স্বামীজির ব্যক্তিগত ধর্মবোধের দৃঢ় ভিত্তি ছিল সনাতন হিন্দুধর্ম, চির-সহিষ্ণু ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর যুগায়ত সাধনা। সে গৌরবের কথাই তিনি বিশ্বসভায় উচ্চারণ ক'রে ধর্মশিক্ষার সেরা পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন :

১ তুলনীয় 'I teach without noise of words, without confusion of opinions, without ambition of honours, without contention of arguments.'

—Ibid. ch. XLIII, 3, p. 173

আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নহি, আমরা সকল ধর্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্যতম বলিয়া গর্বিত। আমি আপনাদের গর্বের সহিত বলিব, যে বৎসর রোমকগণ ইহুদীদের পবিত্র দেবালয় ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইসরাইল-বংশীয়দের দক্ষিণ ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়াছিলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তরপন্থী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং অদ্যাবধি লালন পালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্বিত।

বিদ্যোৎসাহী পাশ্চাত্ত্যবাসী সর্বদাই স্বামীজির কাছে ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ পেয়েছেন।[১]

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজকুটিল নানাপথজুষাৎ
নৃনামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥

শ্রীগীতায় যে বোধ স্বামীজির ধর্মশিক্ষা, বিশ্বমানবিকতার মূলে সেই পরম অনুভব। "নদনদীসকল যেমন বিভিন্ন পথ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্য হেতু সরল কুটিল নানা পথগামী মানুষের, হে প্রভো, তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।"

পাশাপাশি রাখতেন গীতা আর খ্রীষ্টানুসরণ। উপনিষদের সঙ্গে বাইবেল।

আশ্চর্য বেদবিদ্ মানুষটির মনোজগতে আত্মার যে উদ্ভাস ঘটতো তার সম্পূর্ণ পরিচয় হারিয়ে গেছে প্রমাণের জগৎ থেকে।

১ 'It may be the growth of Aryan Civilisation, or it may be the Vedas, Islamism or Christianity, the Swami was ready with an appropriate answer'.
—ডঃ অধীর দে "সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ" 'ভাবমুখে' পত্রিকা ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২০

কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ বিবেকের প্রমাণে স্বামী বিবেকানন্দর উত্তর-সাধক খুঁজে পাবেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সূত্র।

টমাস কেম্পিসের অনুভূতির সূত্র: The voice of books is the same, but it teacheth not all men alike; because I am the Teacher of truth within, the Searcher of the heart, the Understander of thoughts, the promoter of action: distributing to everyone as I judge fitting.[১]

মানবমনের সত্য জিজ্ঞাসায় কঠ উপনিষদ্ সংক্ষেপে এর উৎস বিবৃত করেছেন:

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমানঃ—

নিদ্রিতদের মাঝে যে পুরুষ জাগ্রত থেকে স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী সকল সৃষ্টি ক'রে থাকেন "সেই নির্মাতাই অমৃত ও শুদ্ধ"।[২]

শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ইব ভবতি। ব্রহ্মানুসন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন মানব-পর্যায়ের সকল বিকাশের স্তরের সত্য পৌঁছে গেছে স্বামী বিবেকানন্দর প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকোষ্ঠে। তাঁর কাছে সব সত্যই আপেক্ষিকতার নির্মোক ছিন্ন ক'রে স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন জীবনে সব আপেক্ষিকতার[৩] স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সত্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁরই উত্তরাধিকার মাথায় নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দর অধ্যাত্ম অভিযান দুর্মদ গতি এবং যুগোপযোগী রূপ পরিগ্রহ করেছে। সব ধর্মর বাহ্যিক পার্থক্য থাকবে, অন্তর্নিহিতি এক—শিক্ষাতন্ত্রে এ বোধ গভীর মর্যাদা দাবী করে।

১ "*Imitation of Christ*", Ch. XLIII, 4, p. 173.

২ কঠ উপনিষদ্, ২।২।৮

৩ Ramkrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned man but they are pages from the book of life. They are revelations of his own experience. —M. K. Gandhi.

॥ যুগ-বিচার, সমাজ-চিন্তা ও সমন্বয়ের সাধনা ॥

স্বামী বিবেকানন্দর একটি প্রিয় পদ্ধতি ছিল স্বস্থ হবার—তিনি অতীতের রূপ, ঘটনাচক্রগুলির বিশেষত্ব ও পালা লক্ষ্য ক'রে পরবর্তী কর্ম ও গুণজ ভোগকে নির্ধারণ করতে চাইতেন। শ্রীগীতার পুরুষোত্তম তত্ত্বে এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে ঃ

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥[১]

যুগ পরিবর্তনের প্রধান ক্রমগুলি তাঁর বোধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারত ইতিহাসের পাতাগুলি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে নির্ভুল পারম্পর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যুগাচার্যের কাছে।

বৈদিক যুগের জীবনছন্দ চিরপ্রসন্ন।

সুসমঞ্জস ঋজুতার যুগ। সামাজিক লক্ষ্য ও সংহতি দুই দিকেই জাগ্রত দৃষ্টি ছিল ঋষিদের। তাঁরা ছিলেন যুগযাত্রী। গৃহ-জীবন, যৌথ-জীবন, বৃহত্তর কর্ম-জীবন, ব্যাপকতম ধর্ম-জীবন একটি কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় ক'রে আবর্তিত হয়েছে। কোথাও ঋষি-অধ্যুষিত ভারতভূমি এমন কিছুকে বিন্যস্ত করেনি যাকে সে শিক্ষার পরিপন্থী বলে গণনা করে। কাল এসে যদি সমাজ-জীবনের কাঠামোতে কোন রূপান্তর অনিবার্য করেছে, শিক্ষার ধারা বিস্তৃত হয়েছে। পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান, উপকরণ, বিষয়বস্তুর সংযোজন হয়েছে, তো শিক্ষাধারার, জীবনধারার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। এ নিয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

দুটি বিদ্যাই শিক্ষণীয়। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈরাপরা চ। তবে পরাবিদ্যাই ক্রম-বিচারে উন্নত। এতে তাঁর কথা অধিগম্য হয়।[২]

এযুগে বনবাসী নিজ আশ্রয়স্থলকে অরণ্য বলে জানতেন—সেখানে রণের স্থান নেই। অরণ্যের কাষ্ঠসমিধ অরণি নিয়ে কল্যাণ-

১ শ্রীগীতা ১৫।১০

২ পরা যয়া—তদক্ষরং অধিগম্যতে।

যজ্ঞ করতে হত। ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হয়ে তবে শিক্ষার্থী পেতো জ্ঞানার্জনের অধিকার। আচার্য বলে দিতেনঃ অনবদ্য যা-কিছু তা গ্রহণ করবে—ইতর, বা নিম্ন মানের কিছু নেবে না।[১] পাঠ সাঙ্গ করার পরও নিজে নিজে অনুশীলন করতে হবে—ঋষি প্রবচনাদির চর্চা রক্ষা করতে হবে।[২] স্বামীজি শিখলেন এযুগের তত্ত্ব।

নূতন সমাজ-চিন্তা বহন ক'রে এল বেদবিরোধী চিন্তাধারা। বুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের প্রয়াস আত্মপ্রকাশ খুঁজে পেল। সর্বতোভাবে বৈদিক চিন্তাধারার বিকল্প স্থাপনের প্রবল আগ্রহ তাঁর মধ্য দিয়ে কাজ করল। ছড়িয়ে পড়ার, দিক থেকে দিকে ব্যাপ্ত হবার জন্য যুক্তি ও মননের নূতন ধারা উদ্ভূত হল। বিচার, যুক্তি, সংঘ-জীবন, প্রচার, পরিব্রাজন প্রভৃতির পূর্ণতর ভিত্তিই হবে মার্গানুসরণকারীর জীবনবেদ। এর উত্তরাধিকার দিয়ে ভারতবর্ষের বৃহত্তর ভারতে অভিযাত্রার প্রেরণা জুগিয়ে গেলেন তথাগত।

বেদ-বেদান্তের অনুভবসাপেক্ষ সত্যকে বুদ্ধির আলোয় চিনতে চাইলেন বুদ্ধ। যে নীতি বৈদিক জীবনকে ধরে রেখেছিল তার যুক্তিগত ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বললেন দুঃখ, দুঃখের হেতু এবং তার নিরোধ-এর তত্ত্বই বুদ্ধ মতবাদের মূলসূত্র।[৩]

সংসার কর্মের মূল অনাসক্তির দ্বারা ছিন্ন করার কথা শ্রীগীতায় আলোচিত হয়েছিল।[৪] বুদ্ধপন্থায় তার নীতিগত ব্যাখ্যা

১ অনবদ্যানি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

২ স্বাধ্যায় প্রবচনেভ্যো ন প্রমদিতব্যং।

৩ "যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদত
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ."

৪ অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা—শ্রীগীতা ১৫।৩

উপস্থাপিত হল।[১] নব তেজে করুণার ভাবনা ভারতবর্ষে জেগে উঠলো—ছড়িয়ে পড়লো দ্বীপময় ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সে বাণী বলে উঠলো বুদ্ধনীতি—যে অকুশল কর্মের সূত্রপাত হয়েছে তা বন্ধ কর; অকুশল কোন কর্ম যদি সুরু না হয়ে থাকে তো অনুৎপন্নই থাকুক। যে কুশল কর্ম সুরু করা হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে থাক—অনারব্ধ কুশল কর্মের সূচনা ত্বরান্বিত কর।

কর্মময়তাকে শুভবোধে আহ্বান জানালেন ভগবান বুদ্ধ।

বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এসব এসে সাহায্য করতে চাইল সত্যকে। কত উত্তাল মন শান্ত হল। সম্ভাবনায় যুগ পরিবর্তনের দীপ-ধূপকে গ্রামে, জনপদে, রাজ্যে অনির্বাণ ক'রে রাখতে চাইল।

নিজ নির্বাণলগ্নে বুদ্ধ ঘোষণা ক'রে গিয়েছিলেন: সমস্ত অর্জিত কালপ্রবাহে হারিয়ে যেতে পারে। এ ঘোষণায় তাঁর নিজ চিন্তারাশির এবং চিন্তাধারার সমগ্র কাঠামোটিকেও স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা-হীন বলে তিনি চিহ্নিত ক'রে গেছেন।

সংধর্ম তার শাসন হারালো ভারতবর্ষে। দ্বীপময় ভারতে ও অন্যত্র প্রচলিত ধর্ম হয়ে আজও আছে বুদ্ধের ধর্ম—কিন্তু বড় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে বুদ্ধ-শাসন সে সব দেশেও।

স্বামীজি জানতে পেরেছিলেন এই যুগ বদলের মূলকথা।

আবার এল ব্রাহ্মণ্যবাদের নব জাগরণ। কালের প্রহর পার হতে না হতে—গেল তা স্তিমিত হয়ে।

১ উপ্পন্নানং অকুসলানং পহানায় বায়মো
অনুপ্পন্নানাং অকুসলানং তানুপ্পাদায় বায়মো
উপ্পনানং কুসলানং ভিয়োভাবায় বায়মো
অনুপ্পন্নানং কুসলানং উপ্পাদায় বায়মো—সচ্চবিভঙ্গ সুত্র

এলো মুসলিম মানবগোষ্ঠী। নূতন গোষ্ঠীজীবনের আচরণে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল ভারতীয় সমাজ-জীবন। নানা সমস্যা—প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত···তারপর সমন্বয়। কোথাও দাগ মিলিয়ে গেল—কোনও দাগ স্থায়ী আঘাত স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য টিকে রইল। জীবনের মৌল রূপায়ণে এর গতিপ্রকৃতির পরিমাপ আজও রয়ে গেছে নির্ণয়ের বাইরে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজির অধ্যয়ন ও চেতনার রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়েনি সর্বতোভাবে। তবু তাঁর চেতনা-স্তরে এ যুগ-বৈশিষ্ট্যও আপন বার্তা রেখে গেছে, সন্দেহ নেই।

তারপর ভারত ইতিহাসের নিয়ামক এনে দিলেন খৃষ্ট-মতাবলম্বী বণিকদের প্রবল বন্যাপ্রবাহ। আধুনিক যুদ্ধ, যানবাহন, বাণিজ্যের ব্যাপক সংগঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার জটিল ধারণা ও প্রয়োগ এসব উপকরণসমৃদ্ধি নিয়ে সমাজ-জীবনের মূলে এরা আঘাত হানলো। শুধু তাই নয় প্রবল ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল ভারতীয় মনকে। স্বামীজির কালের সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ প্রবল ধারায় তাঁকেও স্নান করিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসব ধারার মূল সত্য নির্ণয় করার জন্য সব ধর্মের সাধনা পালা ক'রে ক'রে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর অনুভবে ধরা পড়ল এদের মিল কোথায়—যোগসূত্র কতটুকু। যুগ-বিচারের সার কথা হয়ে দাঁড়াল : যত মত তত পথ।

স্বামীজির যুগ-বিচারে তাই এতটুকু ভুলের সম্ভাবনাও রইল না। ভারত-পথিক রামমোহন হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করতে এগোলেন, বিদ্যাসাগর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর সামাজিক অব্যবস্থার সুষ্ঠু নিরসন করতে জীবন উৎসর্গ করলেন। জমিদার-প্রধান সমাজ দেশের শিল্পায়নের বা সাক্ষরতা অভিযানের উন্মাদনায় মাতলেন। কেউ মাপতে পারলেন না ভাগ্য কতটুকু। সবাই "মত" স্থির ক'রে দল গড়তে ব্যস্ত হলেন।

নরেন্দ্রর তো মতুয়ার বুদ্ধি থাকতে দেবেন না শ্রীঠাকুর। তাঁর কাজ ভারত-সাধনার চিরস্থায়ী সত্যে প্রতিষ্ঠিত—যুগ অনুযায়ী তার মাধ্যম পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু সত্য নির্ণয়ের সূত্র তো ভাষ্যের কারিকুরী দিয়ে ঢাকা পড়তে পারবে না। সে সত্য নিত্য—অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্বা।

স্বামীজির শিক্ষা-চিন্তার যুগ-বিচারের মূল প্রশ্ন ঃ ভারতের সেই মহিমা এখন কোথায়? ধ্যানে হৃদয়ের গভীরে ঐ প্রশ্নের জবাব তিনি পেলেন ঃ ভারতকে জাগতেই হবে। পুনরায় উঠতেই হবে। শুধু নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার কথা তো সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদের কথা। যুগ যে দেশের সীমানার বাইরেও যোগাযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এই ভাবনার স্বাভাবিক পরিণতি হল ভারতকে বিশ্বসভায় আধ্যাত্মিক যুগসৃষ্টির মহৎ কাজের পবিত্র দায়িত্ব দিতে হবে।

"দারিদ্র্য, পরাধীনতা, অশিক্ষা, সামাজিক অনাচার প্রভৃতির কৃষ্ণ ছায়ার পশ্চাতে যে শাশ্বত ভারতের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলজ্বল করিতেছে, তাহারই আলোক জগতের কাছে তুলিয়া ধরিবেন। প্রতীচীকে প্রাঙ্‌মুখ করিবেন। প্রাচীকে প্রতীচীর উদ্বেল প্রাণ-প্রবাহ হইতে শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুত করিবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পারস্পরিক আদান-প্রদানেই সমগ্র জগতের কল্যাণ।

"শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় সারা জগতের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-দাস তাঁহাকে এই কল্যাণের বাস্তব রূপায়ণে জীবন অর্পণ করিতে হইবে।"[১]

যুগাবতারের পুণ্য স্পর্শে যুগরহস্য স্পষ্ট হয়েছে। "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী"—তাঁকে সেই আদি

১ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা, পৃঃ ৬২

পুরুষের স্মরণ নিয়ে সংসার-বৃক্ষের চিরন্তনতা কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে—তা বুঝতে পারলেন স্বামীজি।

দুটি সমাজ-চিন্তা তাঁকে একসঙ্গে করতে হল। এক ভোগ, উপকরণময় আত্মিক মাহাত্ম্যবঞ্চিত পাশ্চাত্ত্য সমাজ। আর জীবন পূরণের প্রাথমিক উপকরণবঞ্চিত ধুলাচাপা ভারতীয় অধ্যাত্ম সম্পদের সোনা।

ভারতবর্ষের শুদ্ধাত্মা, নিত্য মুক্ত, স্বভাববান যাত্রা করলেন পাশ্চাত্ত্যের আরোপিত উপাধি সরিয়ে তার আত্মার ঐশ্বর্য দেখতে। বাইরের উপলক্ষ্য লোককর্ম, জনকল্যাণ।[১] আর অন্তরের কথাটি চিরসমুজ্জ্বল ভাগবত বিশ্বাসের চিরন্তন বাণী।[২]

ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্বর একটি কথা সমাজের নানা স্তর আছে—এগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন হল সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য যে রাষ্ট্র পালন করে তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলা চলে।

এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্যে প্রচণ্ড আহমিকা আছে। আর এর মাধ্যমে "অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন," স্বামীজির মতে "ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে নাই।" "অল্প কয়েক-জন লোকের কতকগুলি বিষয়দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না···প্রথমে লোকশক্তি গঠন কর··· সুতরাং সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।"[৩]

১ For the sake of Dharma, for the sake of India's poor, for the sake of the very life and soul of India, I would go to the West in order that means and ways might be found for the raising of the Indian masses and for the recognition amongst the nations the value of the Indian experience.

২ গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর ভরসা রাখিও না; দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর। আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে।

৩ স্বামী বিবেকানন্দ: "সমাজশিক্ষা"—স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃঃ ১

সম্প্রতি ইউনেস্কো তাঁদের মূলগত শিক্ষা-পরিকল্পনায় অনুভূত সংস্কার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা জনতার সক্রিয় অংশ গ্রহণের তত্ত্বকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। স্বামীজির সমাজ-চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁর ভাষায় পরিস্ফুট: "সংস্কার—এই সমস্যাটি এইভাবে দাঁড়ায় —সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর।"[১]

সমাজ-চিন্তার নির্ভুল দৃষ্টিপাতে ভারতভ্রমণকালে রাজার সঙ্গে পারিয়ার জীবনধারার খুঁটিনাটির সঙ্গে স্বামীজি পরিচিত হয়েছেন। তাই তাঁর মর্মমথিত বাণী—Remember, the nation lives in the cottage.

আরও উচ্চগ্রামে তাঁর দৃপ্ত আহ্বান:

হে বীর সাহস অবলম্বন কর—সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল: মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

শুধু উচ্চারণ নয়, দ্বিধাহীন হতে হবে আচরণে। এই মেঘমন্দ্র ধ্বনি আবার জাতির আত্মাকে জাগাতে চাইছে:

তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণে আমার কল্যাণ।

সচেতন লোকাচার্য!—এ বাণী তাঁর আধারকে আশ্রয় ক'রে উর্ধ্বলোক থেকে উৎসারিত হচ্ছে। তাই ভগবান বুদ্ধ যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে তাঁর মহৎ বাণী সহিষ্ণুতার সঙ্গে ছড়িয়েছিলেন

১ স্বামী বিবেকানন্দ: "সমাজশিক্ষা"—স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃঃ ১

সেই ভাবে এ যুগের সমাজ-আচার্য ঊর্ধ্বলোকের প্রার্থনায় স্থির বিশ্বাসে বললেন গোটা সমাজমনের সঙ্গে :

আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

সমাজে সমন্বয় আনতে হবে। এতে বিশ্বাস জাগাতে হবে। অসুন্দরকে ভাঙলেই চলবে না, গড়তে হবে সুন্দরতরকে।

দখিনাপুরীর দেবতা ভুল শুধরে দিয়েছিলেন—পুরাতন যুগের ভাষাকে নব যুগের ভাবের সঙ্গতি অনুযায়ী নতুন ক'রে শুনিয়েছিলেন—জীবে দয়া কি···শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

একটু তুলির আঁচড়ে ভেদবুদ্ধির সমস্ত মালিন্য ঘুঁচে গিয়ে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল; ভাগবতে বিশ্বাসী নব ভারতের সেবক সাধকদের রূপ বুঝি আর ধরে না।

স্বামীজির সমন্বয়-সাধনার প্রথম সূত্র হল : ভগবানকে পেতে চাও, মানুষের সেবা কর।

"আমাদের মিশন নিঃস্ব, গরীব, নিরক্ষর চাষী এবং মজুরের জন্য। তাদের জন্য সমস্ত কিছু করার পর যদি সময় অতিরিক্ত থাকে তাহলেই ভদ্রলোকদের জন্য সে সময় নিয়োজিত হবে।"[১]

"ধনীর প্রতি সন্ন্যাসীর কিছু করণীয় নেই। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে গরীবের নিকট, তাদের সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক এবং সানন্দে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তাদের সেবা করবেন।"

"আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের সর্বনাশের মূল কারণ বিত্তশালী লোকের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং তাদের সম্মান করা। সত্যিকারের সন্ন্যাসীর উচিত এই ধরনের আচরণ সর্বতোভাবে পরিহার করা। এই ধরনের আচরণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা বারবনিতারই শোভা পায়।"

[১] স্বামীজির পত্র, ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০

॥ স্বামীজির শিক্ষা-চিন্তা ॥

শিক্ষা-চিন্তা বলতেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ভেসে ওঠে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে যে সংস্কারাদি অর্জন করানো চলে আসছে তারই কথা। এ শিক্ষায়তনগুলি সমাজ-মনের একটি প্রতিফলন। সমাজ-মন চায় বৃত্তি বা জীবিকা, চায় সাধারণভাবে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয়, আর চায় কিছু শ্রমগত নিপুণতা ও বৌদ্ধিক বিকাশ।

সমাজ-মন যৌথ মন—তাই অন্ধ মনও বটে। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে আছে ব্যক্তিমানুষ—তাই এমন নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু এক একটা প্রবণতা আসে—আর অভিভূত হয় গোষ্ঠীমন। নানা সংস্কারে জড়িয়ে থাকে—ঘটনাচক্রের বিভিন্ন আবর্তনে আবর্তিত হয়। আপেক্ষিক নিম্নতর সত্য থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সত্যে নিয়ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। একটু পিছটান এসে যদি পথে বাধা দিচ্ছে তো একটু জোর পাল্লার ডাক এসে বাধা ঠেলে এগোবার শক্তি জুগিয়ে দিচ্ছে। এজন্য শিক্ষার একটা সামাজিক সাধারণ লক্ষ্যও থাকবে।

পৃথিবীর সব শিক্ষাবিদ্ নূতনের প্রস্তুতিকে শিক্ষা বলে স্বীকার করেছেন। পুরাতনের প্রতি জ্বালা নিয়ে তাঁরা ঢেলে সাজতে চেয়েছেন। তার ফলে প্রবলভাবে যারা নূতন সংস্কারকে অর্জন করতে এগিয়েছে তারা সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে। আভিজাত্যে বা সুবিধাভোগীর দলে ঠাঁই পেয়ে গেছে তারা। পিছনে রয়ে গেছে পিছিয়ে-পড়া মানবতার বিরাট অংশ।

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবাচক চিন্তায় হীনমন্যতার স্থান নেই। অশুভ সংস্কার পরিবর্তন করে শুভ সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেরণা তিনি দীনতম মানুষকেও দিতে চান। তাই মন্দ বা হীন বলে কোন কথা তাঁর ভাষায় পাওয়া যাবে না। তিনি বলতেন:

আমাদের সমাজ যে মন্দ তাহা নহে,—আমাদের সমাজ ভাল।

আমি কেবল চাই আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্যে, মন্দ হইতে ভালতে যাইতে হইবে; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়, আরও ভালয় যাইতে হইবে।

এ তো হল শ্রেয়। কিন্তু প্রেয় যে আচ্ছন্ন করেছে মানুষের অজ্ঞান-আশ্রিত সত্তা!

তাই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ—ব্যক্তির শিক্ষার আয়োজন, প্রতিভাশীলকে এগিয়ে দেওয়ার প্রলোভন এসে উপস্থিত হয়েছে।

ভোগ উপকরণে বা জীবন পূরণের সম্বলে যে দীন বা বুদ্ধির ব্যবহারিক ধাপে যে অপটু, তাদের প্রতি "দয়া" দেখানোর পালা শিক্ষার সর্বজনীনতাকে খণ্ডিত করছে।

এ বিষয়ে স্বামীজির চিন্তা দ্বিধাহীন। তিনি জানতেন দুটি রুটি পেলে অপূর্ব সহিষ্ণু দরিদ্র মানবতা আপন মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হবে— "ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।"

মানবতার মূল্যবোধে সম্ভবতঃ নয়, বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের স্বার্থে পাশ্চাত্ত্য মানুষের ন্যূনতম জীবন উপকরণ জোগানোর সামাজিক দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামো যাতে সবাইকে ঠাঁই দেয় সেজন্য ন্যূনতম শিক্ষার দায়ভারও ইয়োরোপ মেনে নিয়েছে।

তার সূচনাতেই স্বামীজির আনন্দ! ভারতবর্ষ ও অবহেলিত প্রাচ্যখণ্ড এটুকুও যেন করে—মনুষ্যত্বের নিম্নতম পৈঠায় মানুষ যেন ঠাঁই পায়। স্বামীজি জানেন তাহলেই মুমুক্ষুত্বর কার্যকরী সূচনা সম্ভব, নইলে নয়। তাঁর ভাষায়ঃ

ইয়োরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন।

॥ ভাষার সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ॥

সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর স্তর অতিক্রম ক'রে ভাষা আজ উন্নততর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ বর্ণ-পরিচয় না ক'রে শব্দ-পরিচয়—ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞানের নির্দেশ। শব্দকে এককভাবে ব্যবহার না ক'রে, শব্দগুচ্ছকে ব্যবহার ক'রেই ভাষা শিক্ষা আজ দৃঢ়তর হচ্ছে। পুরাতন যুগের সংজ্ঞা শিখে ব্যাকরণের নিয়ম আয়ত্ত করার বদলে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্য বা বাক্যাংশর গঠনগত, রূপগত ও ভাবগত বিশেষত্বর অনুশীলনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

মানুষ ভাষা শিখে সেই একই পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখে, চিন্তার সূত্র অনুকরণ করতে শেখে—এ তত্ত্ব আজ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

ভাষার রূপগত বিন্যাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা করেছেন ; সুরগত দ্যোতনা এবং বর্ণ আঁকার সুষমা ভাষায় কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন সাধনা করেছেন। রামমোহন গদ্যের ব্যবহারিক রূপ গড়ে বাংলা ভাষাকে চলমান জীবনের নানা কর্মের বাহন করতে চেয়েছেন ; বিদ্যাসাগর সেই রূপচর্যায় দেবভাষা সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে নানা উপকরণ সযত্নে আহরণ করেছেন।

স্বামীজি চেয়েছেন ভাষার শক্তিতে জাতির ভাবনাপ্রবাহে প্রাণবন্ততার সূচনা করতে। তাঁরই কথায় :

"শক্তি চাইরে ! শক্তি চাই ! কাজেকর্মে কথায়বার্তায় লেখায় সর্বত্র একটি শক্তির খেলা পৌরুষের ভাব চাই। আজ এই শক্তি জিনিসটারই বড় অভাব। তাই মনে করেছি, এক নূতন ধরনের জীবন্ত ভাবে বাংলা লিখব।"

ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্ব রেখেছিলেন—সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের ঝরনা বয়ে চলেছে—"কোনটা মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনটা জানায় তার নব জাগরণের"। "মানুষের সাহিত্যরচনা দুটো পদার্থ নিয়ে—এক যা তার চোখে

অত্যন্ত ক'রে পড়েছে···আর একটা মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা ক'রে"[১] স্বামীজি সাহিত্য-সাধনায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই যা চোখে পড়েছে তাকে ঘিরে মহামানুষের মহত্তম ইচ্ছা রূপ পেয়েছে।

॥ জোরালো ভাষা ॥

ভাষার জীবন্ত ভাব সম্বন্ধে মদীয় গুরুদেবের একটি ছোট্ট নিবন্ধ[২] আছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

গঙ্গার দৃশ্য বর্ণনা করেছেন অনেকে। বঙ্কিমবাবুর গঙ্গা-যমুনা তীরের প্রাবৃট্ দিগন্তের কথা আমরা ভুলতে পারি না—"আয় আয় আয়, জল আনিগে, জল আনিগে চল"—এখানে 'পল্লীবালাদের মল' যেন আপনিই বেজে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গঙ্গার শোভা যে দেখেনি তার বাংলার শোভাই দেখা হয়নি। "গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো এক একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল"। স্বামীপাদের হৃষীকেশের গঙ্গার কথা···যার দশ হাত নীচে মাছের পাখনা গোনা যায়—সে গঙ্গাও যেন আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ে।

আর কানে বাজে 'হর হর ব্যোম ব্যোম'।

অন্যত্র বলেছিলেন গঙ্গার শোভা দেখে নাও···এর পরে এসব শোভা থাকবে না। এ আর বেশী দিন থাকবে না।[৩]

১ রবীন্দ্রনাথ, "ভাষা ও সাহিত্য", "সাহিত্য"।

২ শ্রী-ম, 'বিবেক কথা", 'ভাবমুখে' বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২৮২

৩ "সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে-কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার—তার নীচে ঝোপে ঝোপে তাল, নারিকেল, খেজুরের মাথা যেন চামরের মত ঝুলছে ···হরেক রকমের বুজ্জ কাঁড়িচালা—আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে, আর সকলের নীচে ইয়ার-কান্দি-গালচে হার মানানো জলের কিনারা পর্যন্ত ঘাস। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইঁটের পাঁজা—নামবেন ইঁটখোলার গর্ত্ত—আর ঐ তাল, তমাল, আম, লিচুর রং আর ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওর জায়গায় দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট—, আর সেই গাধ, বোট। আর পাথুরে কয়লার ধোঁয়া···আর তার মাঝে মাঝে ভুতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি···"

ভাষার বাহুল্য[১] শিক্ষাবিজ্ঞানে নিন্দিত। স্বামীজির 'সুয়েজ-খালে'র বর্ণনা বা পাশ্চাত্ত্য মা-জননীদের সপ্রতিভ পদসঞ্চারের পরিচিতি ভাষার মাধ্যমে জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছে, সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে জীবন্ত ভাষা বাংলাকে মুক্ত করার জন্য রামমোহন গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তাতে হরিণের মত লাফকে হরিণিয়া লাফ[২] বলা হয়েছিল—রূপগত বিন্যাস এই ভাবেই সূচিত হয়; রবীন্দ্রনাথের "ওগো ঘুম ভাঙানিয়া'র প্রয়োগে এরই প্রভাব আছে মনে হয়।

চলিত ভাষার ব্যাকরণ যেদিন সংকলিত হবে সেদিন "ইয়ার-কান্দি-গালচে হার মানানো" জলের কিনারা পর্যন্ত ঘাসএর ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আর বর্ণাঢ্য চিত্ররূপ আঁকার সূচনা করার কৃতিত্ব স্বামীজির নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থ-তত্ত্ব এবং ভাষার উপাদানে ধ্বনি-তত্ত্ব জটিলতর নানা উপাদানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতারপুরুষদের মত সাবলীল ভাষার প্রবাহ রচনা করেছিলেন। তাতে শব্দার্থ প্রধানতঃ অধ্যাত্ম ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জীবন-সংস্কৃতির প্রসন্ন সহজ ভাবকে মর্যাদা দিয়েছে। নরেন্দ্রের মত লোকোত্তর সত্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন "বাহাদুরী কাঠ"। "ঈশ্বরের পথে যত এগোবে তত কর্মত্যাগ" এ গভীর তত্ত্বর ঘরোয়া প্রতিরূপ এঁকেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর:

গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্ম ত্যাগ। মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা এরা সব করে।

১ Verbalism

২ শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহন সম্পর্কে বক্তৃতা মিলনমন্দির॥

৩ শ্রী-ম—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" প্রথম ভাগ, ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২, পৃঃ ৯৪

ভাষা ব্যবহারের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ মনোভঙ্গীর প্রকাশশীলতা ফুটে ওঠে—শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতঃ-সান্নিধ্যে স্বামীজির এ বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চলিত ভাষায় শিল্প-নৈপুণ্য সম্ভব এ প্রত্যয় জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে-ছিলেন[১]। তাতে তাঁর মত নিম্নরূপ ছিল :

"স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে ?···ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত। মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই। এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

আবার ভাষার দার্ঢ্য প্রতিষ্ঠায়ও স্বামীজির অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে।

"হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিতা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে—এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে।···

···তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"[২]

ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষার বলিষ্ঠতার সঙ্গে ভারতের জন-জীবনের সম্বন্ধ নিরূপণ করা ভাষা-সাহিত্যের গবেষকদের প্রিয় প্রসঙ্গ। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে একটি মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে যার মূল কথা—মানুষ শুধুমাত্র দৃশ্যমান পরিবেশে থাকে না—তাঁর অস্তিত্ব এক প্রতীকময় পরিবেশের[৩] সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ভাষা এই প্রতীকময়তার অন্যতম উপাদান।

১ স্বামীজির পত্র, উদ্বোধন সম্পাদককে লেখা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

২ স্বামীজি—"বর্তমান ভারত"।

৩ We no longer live in a merely physical universe, man lives in a symbolic universe. Language, myth, art and religion are parts of this universe. They are the tangled web of human experience.

—Ernest Cassiru : *An Essay on Man*, Yale University Press, 1944.

ভাষা ছাড়া বুদ্ধির প্রয়োগ নিতান্তই বস্তুকে আশ্রয় ক'রে থাকতে বাধ্য হত। বের্গসঁর এই মত[১] মানলে স্বামীজি আমাদের দৃশ্যমান জগতের বস্তুসামগ্রীর আড়ালে চিরায়ত ভারতীয় ভাবগত গাম্ভীর্যের কাছে টেনে নিয়েছেন, কোন সন্দেহ তাতে নেই।

॥ শিক্ষাতত্ত্বে ভাষা ও অস্মিতা ॥

ভাষা আমাদের অস্মিতা গঠনের একটি মাধ্যম—এটি শিক্ষাতত্ত্বের ধারণা। স্বামীজি এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। ভাব বিনিময়ে ভাষা স্বচ্ছতা লাভ করে। ভাববস্তু দৃঢ়ভাবে মানসপটে ঠাঁই পায় এ তত্ত্ব মেনে শ্রীশ্রীঠাকুর বহু সময় স্বামীজিকে আলোচনার মধ্যে অংশ নেওয়াতেন।

"তোমরা দুজনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো।"[২]

আবার শ্রীশ্রীঠাকুর অনুভূতিহীন বিচারে আগ্রহশীল ছিলেন না।

"যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই···। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।"[৩]

পক্ষান্তরে অযথা পুনরুক্তির উত্তেজনায় অস্মিতার ঘাটতি হয়, এ সম্বন্ধে স্বামীজি তাঁর মত প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—হে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ পুনঃ পুনঃ উক্তির দ্বারা উত্তেজনায় আপন শক্তির ক্ষয় করিও না।

রচনাশৈলীর ত্রুটিহীনতা সম্বন্ধে স্বামীজির আগ্রহ অত্যন্ত কম ছিল মনে হয়। বস্তুতঃ তাঁর সময়ই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

১ "Without language...intelligence would have remained riveted to the material objects." —H. Bergson.

২ শ্রী-ম—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : ১ম ভাগ—৬ই মার্চ, ১৮৮২, পৃঃ ৫০

৩ শ্রী-ম— ,, ,, —১১ই মার্চ ১৮৮৫, পৃঃ ৩০৪

এ কারণে পরিমার্জনের সুযোগ নেওয়ার সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর চিন্তা এত দ্রুত প্রণালীতে আসতো যার ফলে আবেগকে সংহত করা বহু ক্ষেত্রেই তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। স্বামীজির মানসদিগন্ত বহু বিস্তৃত ছিল, বুদ্ধি মালিন্যমুক্ত ছিল—এ না হলে হয়তো "মন ও ভাবনার সামঞ্জস্যবিধান করার বাধা"[১] জন্মাতো।

॥ শিক্ষাতত্ত্বে মৌখিক ভাষার গুরুত্ব ॥

ব্যক্তিত্ব গঠনে মৌখিক ভাষার বাধাহীন অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয়। নিজ বাল্যে এ অনুশীলন পিতা বিশ্বনাথ দত্তর স্নেহশীল পরিচালনায় সম্ভবপর হয়েছিল। ভিক্টোরীয়-অনুশাসন—Children are to be seen, not heard—বিশ্বনাথ মানেননি।

বাধা অনেক সময় সহায়তার মধ্য দিয়েও আসে। রুশো একে ধিক্‌কার জানিয়ে বলেছিলেন অর্ধেক কথা বলার আগেই শিশু পুরো মনোযোগ পায়; আর পুরো কথা বলার আগেই সে নির্দেশ দিতে শেখে।[২]

লণ্ডনে গুরু-ভ্রাতা অভেদানন্দকে তাঁর ইংলণ্ড অবস্থানের একমাস কালের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গটিতে স্বামীজির[৩] এ বিষয়ের মতামত স্পষ্ট বোঝা যাবে :

—তোমাকে এবার বক্তৃতা দিতে হবে।

—সে কি কথা! আমি কি ক'রে বক্তৃতা দেব! আমি বক্তৃতা করতে জানি না।

—ও কথা শুনব না, বক্তৃতা দিতেই হবে।

১ "Language...often a barrier between the mind and its idea in their present form". —Bishop Berkeley,

২ J. J. Rousseau : *Emile*.

৩ স্বামী শংকরানন্দ, "স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা, লণ্ডনে", পৃঃ ১১২-১১৪।

—আমার সে ক্ষমতা নাই। আমি কিছুতেই বক্তৃতা কর্তে পারব না।

—তবে এখানে এলে কেন?

—তুমি ডেকেছিলে তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে জানলে কখনই আসতুম না।

—তা হবে না। এখানে তোমাকে থাকতে হবে এবং বক্তৃতা দেওয়া শিখতে হবে।

—আমি পারব না।

—তুমি তাহলে আমাকে অপদস্থ করতে চাও।

—কেন অপদস্থ হবে?

—এ সভায় আমাকেই বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি আমি বক্তৃতা করব না। আমার এক গুরু-ভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা করবেন। তাঁরা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপতে দিলেন।

—তুমি আমাকে না জানিয়ে ঐ রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?

—নিয়ে ফেলেছি এখন আর কি হবে?

—তবে বক্তৃতা কি ক'রে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় বলে দাও।

—আমাকে কে বলে দিয়েছিল? Out of the fullness of heart the mouth speaketh. তোমার অন্তর যে ভাবে পূর্ণ রয়েছে তা দাঁড়িয়ে বলবে। তুমি তো কালী বেদান্তী—এতদিন বেদান্তের আলোচনা করলে—সেই সম্বন্ধে বলবে।...ইংরেজীতে লেখ। লিখে পাঁচবার পাঠ কর—পরে সভায় দাঁড়িয়ে তা-ই বলবে।

—ইংরেজীতে লেখা আমার অভ্যাস নেই।

—চেষ্টা কর, Try, try, try again, Practice কর—practice makes perfect.

বস্তুতঃ মৌখিক আলোচনার সঙ্গে লিখিত প্রবন্ধাদির সম্পর্ক নিবিড়। সকল আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী একমত যে লিখিত রচনাদি

—তা পত্রলেখা বা ভাবসম্প্রসারণ বা প্রবন্ধ রচনা যাই হোক না কেন —শিক্ষা ও অনুশীলনকালে মৌখিক আলোচনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এবিষয়ে Sidney Irwin-এর পরীক্ষার প্রসঙ্গ[১] ভাষা শিক্ষার ছাত্রদের অনেকেরই জানা আছে। এঁর হাতে হেনরী নিউবোল্ট আর আর্থার কুইলারকুচ রচনা লেখার তালিম পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

॥ মা ও শিশুমনের বিকাশ ॥

মাতৃ-হারা রুশো আধুনিক মা-দের মাতৃত্ব গুণের অভাবকে ব্যঙ্গ ক'রে তাঁর শিক্ষাগ্রন্থ 'এমিল' সুরু করেছিলেন। মধ্যযুগে রোমের পরিবারে মার মর্যাদা ছিল অসাধারণ। কিন্তু গ্রীক সভ্যতায় যে কোন বয়স্ক পুরুষ এমন কি দাসরাও ছিল শিশু-শিক্ষক। পেস্তালৎসী শিশুর আবেগজীবনের সুস্থ রূপায়ণে মার ভূমিকার কথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য মন মাকে শিশুর বিকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে মেনে নিয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এক বিবরণীতে[২] বহু তথ্য সমাবেশ ক'রে এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন যে শিশুর আনন্দময় শৈশবে মা-বাবার—বিশেষ ক'রে মায়ের প্রভাব অপরিসীম। ভবিষ্যৎ মানসজীবন এর উপরেই দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পায়।

সাধারণ গতানুগতিক আবেগজীবনে রচনার এ তত্ত্ব মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের মাতৃত্ব কোমলে কঠোরে এক বিশেষত্বর উত্তরাধিকার পেয়েছে। মা শিবপূজা করেন, পালাব্রত করেন, ধর্ম-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে তাঁর পুত্র কামনা।

১ Art of Teaching of English. —J. H. Fowler, 1949, p. 45

২ Dr. John Bowlby : *Maternal Care and Mental Health Report.* —World Health Organization

আর মদালসার মত মায়েরা পুত্রকে শৈশবে বীর্যবানের জীবনাদর্শে দীক্ষিত করেন।

স্বামীজি ভারতীয় মায়ের কাছে শিশুমনের বিকাশের দৃঢ়তম সূত্র দাবী করেন। তাঁর নিজের ভাষায় আছে—আমার যদি একজন পুত্র থাকিত তো মদালসার মত আমি বলিতাম—অলখ নিরঞ্জন।

পাশ্চাত্ত্য অনুভব লিপিবদ্ধ হয়েছে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং[১]-এর কাব্যার্ঘ্যে :

Women knew
The way to rear up children (to be just)
They know a simple, merry, tender knack
Of stringing pretty words that make no sense
And kissing full sense in empty words
Which things are corals to cut life upon,
Although such trifles : Children learn by such
Love's holy earnest in a pretty play.

ঐ পাশ্চাত্ত্যের মার্গারেট নোবেল যখন ভারতের নিবেদিতা হলেন তখন স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন :

"The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one,"

১ "Aurorah Leigh 10" Quoted by Otto Jesperson, in *"Language : Its development and origin"*, p. 142

এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে "লোকমাতা" নাম পেয়েছিলেন নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ; শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "শিখাময়ী"। মায়ের প্রভাব প্রসঙ্গে স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার পরিণতি এই শিখাময়ী লোকমাতা।

হিন্দু শাস্ত্রে আছে "অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ-সমো গুরু"—এই তিন লোকে মায়ের মত গুরু নেই। স্বামীজি ভারতের এ মত মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

গুরুর কাজ স্নেহের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা, মনের অন্ধকার দূব করা, চলার পথ কি রকম—আর পথ চলতে কি চাই তার অনুশীলন শিশু পাবে মায়ের কাছে। ঈশ্বরপ্রণিধান স্তোত্রে তিনি কি তার কথা বলতে গিয়ে ঋষি সর্বপ্রথম বলেছেন তুমি মাতৃ-স্বরূপ[১]। তারপর অন্য উপাধি আরোপ করেছেন।

মায়ের এই প্রেম-ভাবনার মহত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে অধ্যাত্মজীবনের অপরূপ বাণী বুদ্ধদেব উপস্থাপন ক'রে বলেছেন—মা যেমন তাঁর পুত্রকে ভালবাসে তেমনি প্রেমভাবনায় করুণায়[২] বিশ্বর সব কিছুকে গ্রহণ করলে তবে দ্বাদশ চক্রবৎ প্রতীত্য-সমুৎপাদ-এর অনিবার্যতাকে মানুষ অস্বীকার ক'রে কর্ম-চক্রমুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

বুদ্ধ বিচারে এই দ্বাদশাঙ্গ চক্রে তৃষ্ণার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে ঃ

মাতা স্বীয় রুধির ও দুগ্ধের দ্বারা সন্তানকে পোষণ করেন। সন্তান কিছু বড় হইলে তাহাকে খেলনা···ঘটিকা, লাড্ডু, বন্দুক, গাড়ী, ধনু প্রভৃতি লইয়া খেলা করিতে থাকে। আরও

১ ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥

২ মাতা যথাহি একপুত্তং অনুরক্ষে···

বড় হইলে পাঁচ প্রকার ভোগ্য বিষয়ের[১] সেবা করে। সে তাহার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অনুযায়ী অনুরোধ-বিরোধে পড়িয়া সুখ-দুঃখ ও না-সুখ-দুঃখময় বেদনা অনুভব করে। উহাদিগকে অভিনন্দন করে। এই প্রকার অভিনন্দন করায় তাহার নন্দী (তৃষ্ণা) উৎপন্ন হয়। বেদনার বিষয়ে এই যে নন্দী ইহাই তাহার উপাদান (গ্রহণ করা বা গ্রহণের ইচ্ছা)।

পাশ্চাত্ত্য দেশ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অর্ধ-অবহিত থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপকরণবাহুল্যর বিধিকে বরণ করেছেন। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা মায়ের ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে উপকরণের সুদৃশ্য শোভন মনোলোভন রূপ। এমন কি মা না থাকলেও চলে এইরূপ বিশ্বাসে মায়ের কোলের মত দোলনা—মাতৃস্তনের পীযূষের বিকল্প-রূপ দুধের বোতল, মায়ের ঘুমপাড়ানী গানের সুরের বিকল্পরূপে গ্রামোফোনের সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজনে মাতৃহীন শিশুদের বৃদ্ধির নিশ্চয়তাত্মক পরিবেশ রচনা করা হচ্ছে।

মারিয়া মন্তেসরী কেন মাতৃজাতিকে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিচালিকা[২]-রূপে চেয়েছিলেন—কেন তিনি নীরবে প্রতিটি শিশুর মানসপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করার জন্য পরিচালিকাকে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলায় আপত্তি জানিয়ে গিয়েছিলেন তার মূল কারণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞান আজও ধরতে পারেনি। তার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মন্তেসরী পদ্ধতিকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষাসংস্থা গড়ে ওঠেনি। শিশুর নিয়মানুবর্তিতার সামাজিক প্রয়োগের উপর জোর দিয়ে এই শিক্ষানেত্রীকে অবহেলার পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি হীনবুদ্ধি ছাত্রদের সামাজিক প্রস্তুতি চেয়েছিলেন ; হীনবুদ্ধি সমাজ তা সার্বজনীন বলে মেনে নিয়েছে চিন্তা না করেই।

১ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ।

২ Directrix

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানে অবশ্য মন্তেসরীর উপকরণ-নির্ভরতার সমালোচনা সুরু হয়েছে। সমালোচকরা বলেছেন মন্তেসরী পদ্ধতিতে যে উপকরণ নেই তা দিয়েও তো শিশুমন বিকাশমুখী অনুশীলন করতে পারতো। হায়রে উপকরণবাহুল্য নির্ভরতা! অন্তঃকরণের বিষয় যে সমগ্র বহির্জগৎ—সারা পৃথিবীর সব উপকরণই যে বিষয়রূপে শরীরস্থ আত্মার ভোগ্য!

ভারতীয় শিল্প-চেতনায় মাটির জিনিসটাও ঊর্ধ্বলোকের উদ্দেশে নিবেদিত। কাঠের চোঙ্ আর ঘুঁটি—ধাতুর টুকরো—বালির কাগজ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শিক্ষার পাশ্চাত্ত্য উপকরণে আছে কি সেই ঊর্ধ্বায়নের কোন দিশারি দৃষ্টি? মন্তেসরী যদি বুঝতে চাইতেন স্বামীজির শিল্প-বোধের রহস্য কথা, যদি শুনতেন স্বামীজির সেই ভাবনা:

"প্রকৃত শিল্পকলা পদ্মের মত, মাটি থেকেই তার উদ্ভব, মাটি থেকেই তার পুষ্টি, মাটির সঙ্গে যোগ তার নিত্য অথচ মাটি থেকে তা অনেক ঊর্ধ্ববর্তী। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ থাকবে, কিন্তু তা হবে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।"

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানে না হোক, পাশ্চাত্ত্য চিন্তার ইতিহাসে আছে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী, যেখানে মাকে ছুঁয়ে মাটি-মার স্পর্শে অমোঘ শক্তিতে লড়াই করতেন গ্রীক বীর, অপরাজেয় থাকতো যতক্ষণ এই স্পর্শ নিবিড় হয়ে তাঁকে রক্ষা করতো। বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ মুদ্রাও এই সত্যের বার্তা বহন করে।

স্বামীজি নিবেদিতার দ্বিতীয় জন্মে শিশুর বিকাশের মূল তত্ত্বটি দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন:

নবজাতককে তারা যা বলে, আমিও তাই আজ তোমাকে বলছি—অবশ্য উলটো ক'রে। যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি যদি গড়ে থাকি, তুমি টিকবে না। আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন, অনৃতা হবে।

মা—মাটি মা—বিশ্ব মা—তিনটি মাতৃ-চেতনার স্তর স্বামীজির কাছে অখণ্ডভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ছিল।

॥ পরিবার ও বিদ্যালয় ॥

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলছে ধীরে ধীরে বড়দের প্রভাবমুক্ত হতে পারাই শিক্ষার প্রধান সূত্র। শিশু ও শিক্ষার্থা দুই পরিচয় নিয়ে অপরিণত মানব সন্তানরা প্রথম বয়সটি কাটায়। রুশো শিশুদের শৈশবের অধিকার কেড়ে তাদের প্রধানতঃ শিক্ষার্থীরূপে চিহ্নিত করার ব্যবস্থাকে নিন্দা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাচিন্তা অনুসরণ ক'রে শৈশবের খেয়াল খেলার সঙ্গে শিক্ষার্থী হয়ে ওঠার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাই ইতিহাসের গল্প বলতে বলতে শিক্ষার্থীদের কাছে তদ্গত চিত্তে তিনি বলতে পারতেন—বল, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ—মা, মা, মা! এক সূত্রে, আবেগজীবনে গল্প বলার পাঠ উত্তীর্ণ হতো ভারতবর্ষের চিন্ময়রূপের সান্নিধ্য-বোধের মহিমান্বিত অভিজ্ঞতার

পরিবারগুলির মধ্যে শিশুকে ঘিরে যে আশা বিদ্যালয় তারই প্রতিফলন করার কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত। এ দুয়ের মাঝে অতি নিবিড় যোগ। জীবনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শিক্ষার্থী যার আস্বাদ পাবে সব কিছুর সেরা রূপ সে দেখতে পাবে বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় হতে উঠবে সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবার!

এ প্রসঙ্গে স্বামীজির পরামর্শ চেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শিক্ষায়তন গড়ার কালে। স্বামীজি হেসে বলেছিলেন:

তোমার কাজ তুমিই কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা তো ভালই, এখন তাকে হাতে-কলমে ঘাটামাটাই হল আসল কথা। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান, কি পারিয়ার সঙ্গে খেয়েছেন, তাদের পোশাক পরেছেন,

তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য—যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন।

ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব শিখতে পারবে। এর পরে—অনেক দিন পরে পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ ক'রে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে।

স্বামীজির শিক্ষা-চিন্তায় পরিবার আর বিদ্যালয় পরিপূরক হয়ে উঠেছিল।

ইয়োরোপ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সংস্কার কিছুটা ঝেড়ে ফেলেছে। সেখানের পরিবার তাই তিন রকমের—এক, অবৈধ পরিবার, অর্থাৎ যা গড়েই ওঠেনি। দুই, ভাঙাচোরা পরিবার, যা সংহতির অভাবে মঙ্গল-স্বরূপ হয়ে উঠতে পারছে না, আর তিন, ভেঙে যাওয়া পরিবার, যা সংহতির আকর্ষণ ছিঁড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।[১]

আমেরিকা সংস্কারভাঙা দেশ। গর্ব ক'রে সে বলে—আমরা ইয়োরোপের সভ্যতার মৃত বোঝার হাত থেকে মুক্ত।[২]

স্বামীজি বলেছিলেন ধুলোর মাঝে আছে অমূল্য স্বর্ণখণ্ড—তাকে বেছে নিতে হবে। আমরা জানি ভগিনী নিবেদিতা ভারতের পুঞ্জীভূত সংস্কারে জড়িত সুপ্ত আনন্দময়ের সত্তাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন—তাঁরই চেষ্টায় ভারতবর্ষে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রানী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপরূপ জীবন-কাহিনী বালিকাদের মনের নিভৃত কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সোনার কাঠির স্পর্শে ভারত-নারীর সুপ্ত অন্তরাত্মা জাগরিত হয়ে উঠেছিল।

১ (1) never established, (2) not effectively functioning, (3) broken-up.
—Collected by Dr. John Bowlby, W.H.O. Specialist.

২ Free from the dead weight of European tradition.

বিদ্যালয়ের কাজই তো এই প্রসন্নভাবে জীবনের নানা ঘাতের আশা-অভিজ্ঞতার কথা পৌঁছে দেওয়া; শিশুচিত্ত না হলে নানা টানের আবর্তে দিশাহারা হয়ে পথভ্রান্ত-মানসিকতার দুর্বলতায় পঙ্গু হয়ে পড়বে। শিক্ষক-অভিভাবক মৈত্রীর যে স্তর সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব চিন্তা করছেন তা তো যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবসায়িক স্তর মাত্র। এতে শিশুর সমগ্রতার রূপ নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা তো বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না। সাধারণ সৌজন্য তো একটি প্রাথমিক লক্ষ্য। তথাকথিত ভদ্রতা প্রসঙ্গে—যা প্রায়শঃই মাতৃদিবস বা অভিভাবক সপ্তাহ প্রভৃতির উদ্‌যাপনের পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়—স্বামীজির মন্তব্য স্মরণীয়ঃ

কী মিষ্টি, কী সুন্দর—এ সব বাঁধি গৎ চলবে না। আর অনবরত বাইরের দিকে নজর। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে, তখন আকাশ হতে বজ্রের মতো ভেঙে পড়বে দুনিয়ার উপরে।

বিদ্যালয়ের কাজ হবে পরিবারের সহযোগিতায় ভবিষ্যৎ মানবতার পদসঞ্চারের ক্ষেত্র রচনা করা। পরিবার যতদূর পর্যন্ত পেরেছে, তার সেই করাটুকু মূলধন ক'রে ছাত্রদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।[১]

পরিবারের অভিজ্ঞতা এক রকমের জীবনের স্বাদ দেয়। তাতেও ক্রম আছে—বিকাশের পালা আছে। নির্বাচিত অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়া এবং অভিজ্ঞতাসমূহের ধারাবাহিকতার সুযোগ সৃষ্টি করা হল বিদ্যালয়ের প্রধান কৃত্য। এর জন্য বিশেষ পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কৌশল-সমূহের উপর অধিকার স্থাপন করতে পারবে। যান্ত্রিকভাবে

১ 'If the school cannot give more vital experiences than the child can get anywhere else, in the world, it has no valid claim upon his time.'

—Prof, W. Franklin Jones.

কৌশল অর্জন লক্ষ্য নয়। বৌদ্ধিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতা রক্ষা ক'রে কৌশলগুলি অর্জন করতে হবে। স্বামীজি একেই বলেছিলেন :

কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই হল শিক্ষা।

অন্তর্নিহিত পূর্ণতার অভিব্যক্তি লাভই হল শিক্ষা।

কৌশল অর্জন আর অভিজ্ঞতার স্তর—এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান বিস্তৃত তালিকা রচনা করেছেন। এই তালিকার প্রথম দিকে আছে :

১। ভাষা, লিপি ও ভাব আদান-প্রদানের যোগ্যতা অর্জন।

২। গাণিতিক প্রতীক ব্যবহারের এবং প্রাথমিক গণিত-বোধ অর্জন।

৩। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, নাগরিকতার আদর্শ, সামাজিক কর্ম সম্পাদনে নিপুণতা।

৪। যথাযথ কর্মসংক্রান্ত অভ্যাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়-ব্যবহারের নিপুণতা।

৫। চিন্তা ও মূল্যায়ণের অভ্যাস অর্জন।

এই তালিকাটি আমেরিকায় শিক্ষাবিদ্ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে[১] স্থির করা হয়েছিল।

স্বামীজির ভক্তিযোগ গ্রন্থে এই সব কৌশলের উল্লেখ নেই। কিন্তু কিভাবে এ কৌশলগুলি সম্ভবপর হবে চিন্তার সম্যক্ বিন্যাসের মাধ্যম ছাড়া? স্বামীজি সে প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

তাহাদিগকে শিখাও যে তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান। এমনকি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও।

১ White House Conference on Education, 1955—attended by 2000 delegates at Washington [Selections. "*Great issues in education.*"

—The Great Book Foundation, Chicago]

বাল্যকাল হইতে তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থই সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সরল করিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ হিত হইবে।[১]

শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক করার স্বপ্ন যে শিক্ষানায়ক দেখেছিলেন পেস্তালৎসীর কথাও[২] ছিল "মানবমনকে ইচ্ছাশক্তিতে উদ্দীপিত করা"; "লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন।"

একমাত্র পরিবারই পারে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে শিক্ষার্থীদের মনকে এমন সব চিন্তায় বিভোর করতে "যাহাতে তাহাদের যথার্থ হিত হইবে"—যাতে "মানবমন ইচ্ছাশক্তিতে উদ্দীপিত" হবে।

শুধুমাত্র ভাবগত ভিত্তি রচনার অধিকারই পরিবারের বিশেষ অধিকার নয়। আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রেও পরিবার শিক্ষা-জীবনের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে দিতে পারে। স্বামীজির নিজ জীবনেও পরিবার এ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। পাশ্চাত্ত্য গৃহ-পরিবেশ বিষয়ের গবেষকরা এ সত্য আজ মেনে নিয়েছেন।[৩]

॥ জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষার ভূমিকা ॥

শিক্ষা-বিজ্ঞানের মতে পরিবারের কাছ থেকে বংশগতির ধারা এবং সামাজিক পরিবেশের প্রাথমিক উত্তরাধিকার পেয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয় সমাজ-সভ্যতার জটিল এমন কি পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয়-সাধন ক'রে শিক্ষার লক্ষ্য

১ স্বামীজি, "ভক্তিযোগ", পৃঃ ৬৭

২ An experimental school can be a means whereby the human mind is fired with a will, and the human heart is filled with a desire to alter the state of the world"—Pestalozzi, 1805—[Quoted by Elizabeth Rotten : *The Pestalozzi children village*. "Sec. V, Ch. 7, Year Book of Education, 1946]

৩ "Steady growth of evidence that the quality of parental care which a child receives in his earliest years is of vital importance for his future mental health".

—John Bowlby : "*Child care and the growth of love*", p. 11.

নির্ধারণ করে কিংবা নির্ধারিত লক্ষ্যকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে। পাঠ্যপুস্তক, নির্বাচিত প্রসঙ্গ বা অভিজ্ঞতা এই লক্ষ্যানুগ। পদ্ধতি ও উপকরণ এই লক্ষ্যর সহায়ক। পরীক্ষা লক্ষ্যর সাফল্যের সূচক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ধারণা-কর্ম প্রভৃতির ব্যবস্থাপক।

শিক্ষা-বিজ্ঞান ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে আগ্রহশীল। প্রবৃত্তি প্রক্ষোভগুলির কার্য পরিবর্তন তথা সমাজীকরণে সচেষ্ট। সমাজের রুচি এবং প্রয়োজনের বিভিন্নতার মধ্যে একটি কার্যকরী সর্বগরিষ্ঠ মান আশ্রয় ক'রে ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার পরিচালক বা কার্যকরী অংশীদারশিক্ষক।

রাষ্ট্র ও সমাজ প্রচেষ্টাটির সহায়তা করতে পারেন—শিক্ষা-বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ কাম্য বলে মনে করেন-না।

স্বভাবতঃই এই চিত্রটির মধ্যে, সমাজ কি ভাবে পরিবারের ও বিদ্যালয়ের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উপর এমন প্রভাব ফেলে যা অস্বীকার করার শক্তি বিদ্যালয় অর্জন করেননি তাহলে পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয় সে প্রভাবমুক্ত রেখে পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের বিকাশ ঘটানো। অবশ্য পরিবার পারে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে আসতে। সাধারণতঃ তেমন সম্ভাবনা আজ আর সহজ নয় কোন ক্রমেই। মিশনারী এডাম জাতীয় জীবনের তালে তালে গড়ে-ওঠা সাধারণের বিদ্যালয়গুলি যা চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, সমাজহিতার্থী বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসীর দালানে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল তাকে আশ্রয় ক'রেই আধুনিক শিক্ষার আবাহন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজকে ভেঙে জন্ম নিচ্ছিল সরকার ও রাষ্ট্র; তাঁরা পুরাতনের সব শক্তিকেই উৎপাটিত করতে ব্যগ্র ছিলেন। এডামের বিবরণী[১] ও তাঁর শুভ-

১ Adam's Report,

কামনার শক্তি দুইই ইতিহাসের দলিল হয়ে রয়েছে জাতির মহাফেজ-খানায়—জাতির বিবেকে আজও তা অনুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বর্তমান ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শগত সংঘর্ষ শেষ হয়ে এলো ; ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত এবং পাশ্চাত্যের বিলাসময় সুখ এই দু'টির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার কথা উনবিংশ শতাব্দীর কিছু কিছু পরিবার ভেবেছিলেন। আজ ভাবনার বোঝা মহাকাল তুলে নিয়েছে। স্বামীজি "বর্তমান ভারতে" পার্থক্য বিচারের সূত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—কার্যকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্র-নীতি। ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"

সম্প্রতি পাশ্চাত্যে তার ফল কি হয়েছে সে কথা আলডুস, হাক্সলী আলোচনা ক'রে বলছেন : আমাদের মূল্যবোধে এখন একটি জিনিসই স্থান পেয়েছে তার নাম হচ্ছে ভোগ। তার ফলে সমাজ-জীবনের সর্বত্র এক নিদারুণ অসাম্য প্রকট। এই সুবিপুল ভোগোপকরণ সৃষ্টির কার্যে আজ যাদের প্রাধান্য সেই ধনিক বা বৈশ্য শ্রেণী আজ সমাজ-জীবনের কর্ণধার।[১]

কর্ণধার তরীকে সংবরণ করতে জানে না এই হল পাশ্চাত্য জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনার ঘটনা। এ নিয়ে হাস্যকৌতুক-চিত্রও আঁকা হচ্ছে ও দেশে। তার একটি উদাহরণ বিচার করা যাক :

হেনরি অলড্রিস এখনও বিশ বছরে পা দেয়নি। অশিষ্টভাবে সে বয়ঃসন্ধিক্ষণে বিচরণ করছে। আত্মনিয়ন্ত্রণহীন, আত্মপ্রতিষ্ঠাশালী জীবনে বিভ্রান্ত এই তরুণটি। যে বিদ্যালয়ে সে যায় তারা তাকে নিম্ন মানে চিহ্নিত করেছে। সামাজিক বা শিল্পবোধের কোন বিচারবোধ তার নেই ; কোন রকমের ধর্ম সে অনুসরণ করে না। প্রধানতঃ তার সময় কাটে বৃথা, করুণ হাস্যকর

দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা—অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তার অনুবাদ

ব্যর্থপ্রয়াসে। সে ঘটনার দাস; ভিড়ের মতবাদ তাকে নাচিয়ে বেড়ায়। কি কি মানতে হয় তা জানতে সে সচেষ্ট। টম মইয়ার বা হাকলবারী ফিন থেকে সে কত পৃথক্।

তার বোন মেরি তারই মতন তরুণী। শ্রীযুক্তা এলকটের মেগ, জো, বেথ, অ্যামি প্রভৃতি তার তুলনায় প্রাণবন্ত তরুণী।

এদের মাতা-পিতার অবস্থা আরও বেদনাবহ-কৌতুককর। তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম, বিচারের মাপকাঠি তাদের জানা নেই। তাঁরাও বয়ঃসন্ধিকালে বিচরণ করছেন—মধ্য বয়সের বয়ঃসন্ধি। অবশ্য তাঁরা তরুণ নন, তবে তাঁদের বাড় থেমে গেছে। বিশ্ব-পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁদের ভাবার অভ্যাস নেই। তাঁরা বুঝতে পারেন না কেন ভোগ-উপকরণবহুল জীবনেও তারা এত অসুখী, নিরাপত্তাবোধহীন, এত অশান্ত। তাঁরা ইচ্ছা ক'রে কিছু হননি—তাঁরা সামাজিক শক্তির হাতে ঘুঁটি হয়ে রয়েছেন।[১]

পরিবার ও বিদ্যালয় প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে ত্যাগী মাতা-পিতা ও ত্যাগপন্থায় বিশ্বাসী শিক্ষাব্রতীর জীবন-সাধনায়। তাঁরাই পারেন জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষার ভূমিকার স্বরূপ চিনিয়ে দিতে।

শিক্ষাবিজ্ঞান তত্ত্ব ও পদ্ধতির পারের সাধনার পালাক্রম সম্বন্ধে নীরব।

স্বামীজির শিক্ষাচিন্তায় প্রথমটি অর্থাৎ পরিবার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তব্য যা আছে তা নিয়ে একটি সার্থক গবেষণাকর্ম শিক্ষা-

---

১ The Aldrichian civilization has been based largely on the assumption that the great, significant happy man is the one who has been able to acquire a superabundance of possessions···who lives in a house larger than his family needs for reasonable comfort, who has a motor car without good reason, who has more clothes than he can wear out and a wife who dressess with conspicuous expensiveness. How great a triumph to lift oneself to such a state of being!

—On the programme called 'The Aldrich Family' by Clifford Goldsmith.
[Quoted by Bernard Iddings Bell in "*Crisis in Education*" *1949*.]

বিজ্ঞান করতে পারেন। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা, ধারণা ও স্বীয় অনুশীলন অনন্যসাধারণ। শিক্ষাবিজ্ঞান দীর্ঘকাল ধরে এ নিয়ে চিন্তা ও পরীক্ষা করার খোরাক পেয়ে গেছে। তবে ব্যবহারের অধিকার অর্জন করা হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে শ্রদ্ধাশীল পরিবার ও বিদ্যায়তনগুলি থেকে এ বিষয়ে অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করাই হবে শিক্ষাবিজ্ঞানের নিষ্ঠাশীল সাধকের প্রাথমিক কর্তব্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে স্বামীজির ভাবধারা কোন্ বিশেষত্বকে আশ্রয় ক'রে সৃজনাত্মক রূপ পেয়েছে তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে সংকলন করার প্রয়োজন আছে।

বিশেষ ক'রে স্বামীজির বক্তব্য ছিল শিক্ষার লক্ষ্য হবে ইতিবাচক এবং সর্বাত্মক। তিনি সংকট বিচার করেছিলেন মানব-বিকাশের মূল দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই বলতে পেরেছিলেন :

বর্তমান শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, কারণ তাহা সম্পূর্ণ নেতিমূলক। যথার্থ শিক্ষা বলতে পুঁথিগত বিদ্যা, নানা বিষয়ের জ্ঞান, কতকগুলি শব্দসংগ্রহ বুঝায় না। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতঃ বর্তমান তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা জীবন গড়িয়া ওঠে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, চরিত্রের উন্নতি হয়, মানুষ স্বাবলম্বী হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। চাই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস।[১]

এই আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন সন্ন্যাসী দেশের ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভরতা রেখে 'জীবনে জীবন যোগ করা'র কথা বলেছিলেন। সংহতি হল তাঁর কাছে বড় কথা, সংগ্রহ মাত্র নয় :

অপরের নিকট ভাল যাহা পাও, শিক্ষা কর। কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে। অপরের

১ স্বামীজি, "শিক্ষাপ্রসঙ্গ"।

নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়। শ্রীগীতার মহাবাণীর এ ভাষ্য জীবন্ত : স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

পাশ্চাত্ত্যে সমাজ নিয়ন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা করেন না। ভারতবর্ষে তাঁদেরই মান্যতা দেওয়া হয়। মাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজি[১] ভারত ইতিহাসের এই শিক্ষার কথা নির্ভুলভাবে বলেছিলেন :

কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল সমাজের নেতা। আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে। তখনই আমাদের মুখ হইতে যে-বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে।

এই অমোঘ শক্তিসম্পন্ন বাণীর জন্যই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো[২] পেয়েছেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আকাশ-বিচারী কবির এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ইয়োরোপের মাটিতে স্থান পায়নি।

প্রাচ্যখণ্ডে অতীতের মাহাত্ম্যকে অতিক্রম ক'রে মহত্তর জীবন-রচনার পরিকল্পনা ছিল স্বামীজির। তাই ভগিনী নিবেদিতাকে শিক্ষাব্রতে উৎসাহ দিতে গিয়ে মূলতঃ জীবনের লক্ষ্যই স্বামীজির কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে :

"মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর বেদীতলে।

---

১ অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, "বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা—দ্বিতীয় পর্ব", উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৭০, পৃঃ ৪৮১

২ "He first, and perhaps last, maintained that a state ought to be governed, not by the wealthiest or the most ambitious, or the most cunning, but by the wisest." —Shelly
[Quoted by Sir Ernest Barker in *Plato and his predecessors*"]

এ সব তোমারই হ'ক আরো ইহা ছাড়া—
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে-মহামানব
সেবিকা-বান্ধবী-মাতা তুমি তার সব ॥"

বর্তমানের মধ্যে অতীতের সত্য আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা[১] দেখে জন ডিইঈ শিক্ষার লক্ষ্যকে জীবনমুখী করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যালয়কে চলমান জীবনের কাঠামোর সঙ্গে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দর সত্যদৃষ্টি শিক্ষার মূল কথাকে নির্ণয় করেছিল। 'অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা, অনাগত ভারতের যে-মহামানব' তার প্রস্তুতি কোন্ পথে এ কথা স্বামীজির শিক্ষাচিন্তায় প্রধান হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষা যদি সংস্কারসমষ্টির অর্জন, জীবন তাহলে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে জীবের স্বরূপের বিকাশ এই ছিল স্বামীজির মত। জীবনের সত্য পূর্ণতর, শিক্ষা সেই পূর্ণতরের পথের প্রস্তুতি। সুতরাং তথ্য বা কৌশল মাত্র নয়, তাৎপর্যবোধ হল বড় কথা। মনে রাখা কোন কঠিন কাজ নয়, মনোভঙ্গীতে স্থান পাবার পর জীবনে কিভাবে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে তা নিয়েই ভারতবর্ষ চিন্তা করেছে[২]। পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে অস্পষ্টভাবে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে[৩]! শিক্ষাবিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন কিন্তু পথ খুজে পাচ্ছেন না। তাই জীবনমুখী ক'রে শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য নানা পরীক্ষায় নেমে পড়েছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানী।

১ Present is the saddleback of time···it draws the trails of the past, inklings of future into the vortex of living present—linking up tho reminisences, experiencos with the forebodings.—[Quoted by Major B. Sen. *"Symposium on Teachers' Day" 1962*]

২ তেজস্বিনাবমধীতমস্তু।

৩ 'Not only to inform, but to form···to develop bias, slant, altitudes and to vitalize.'

॥ শিক্ষণ প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির ভূমিকা ॥

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন যে "শেখানো যায় না"। পড়ানো যায়, শিক্ষক পাঠ দান করতে পারেন—কিন্তু তা অর্জিত হচ্ছে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই[১]। সংস্কার অর্জন করাকে শিক্ষা বলে স্বামীজি মত প্রকাশ করেছিলেন। বিকাশের স্তর অনুযায়ী—সংস্কার অর্জন সহজ হয় বা কঠিন হয়। সাধারণ সংস্কার এবং প্রবৃত্তি অভিমুখী সংস্কার অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু উর্ধ্বমুখী সংস্কার যাকে আশ্রয় ক'রে মানুষ দেবত্বে পৌঁছবে তার উপর অধিকার বিস্তার কঠিন।

শিক্ষার লক্ষ্য জৈব সংস্কারগুলির ন্যূনতম ভিত্তি বজায় রেখে জৈবজীবনে উর্ধ্বের সংস্কারে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্যই যা-কিছু বলা যায় বা পড়া যায় তা অনিশ্চিতভাবে মানুষের সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয় না। শ্রীঠাকুর এই তত্ত্বটিই বুঝিয়েছিলেন—পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, গুরুমুখে শোনা আরও ভাল।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অন্তঃকরণের রহস্য ভেদ করতে চাইছেন কিন্তু অন্তঃকরণকে উপকরণ দ্বারা আচ্ছন্ন করা যায় এ বিশ্বাসকে মূলধন ক'রেই তাঁদের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবেগজীবন এবং ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ বিন্যাসেই জ্ঞানলাভ হয়—বুদ্ধির কাজ এইগুলিকে সুসংবদ্ধ ক'রে মনোরাজ্যে রক্ষা করা। সুতরাং আবেগজীবন কি তা নির্ণয় করা, বুদ্ধির স্থির মান কি তা নির্ধারণ করা এবং প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্য ও কার্যকারিতা জানাই হল শিক্ষাবিজ্ঞানীর প্রাথমিক কাজ। এই বিশ্বাসের উপর শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

অভ্যাস এবং প্রণোদনার গুরুত্বও স্বীকৃত হয়েছে। চিন্তন প্রণালী এবং অভিজ্ঞতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

১ 'Teaching cannot be equated to learning.'

স্নায়ুগুলির মধ্য দিয়ে কিভাবে অনুভব-প্রয়াস-জ্ঞানের তরঙ্গ প্রবাহমান এবং এই তরঙ্গায়িত প্রবাহর পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের গতিপথের বিশেষত্বর জন্য অভ্যাস গঠিত হয় এ তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাচিন্তা এই তত্ত্বগত সকল ধারণার উপর বিশেষ আলোকপাত করতে পারে।

প্রথমে দেহ-মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বামীজি স্বামী-শিষ্য-সংবাদে কি বলেছেন তা দেখা যাক :

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সহিত লৌহের মত শক্ত স্নায়ু থাকিলে জগৎকে পদানত করা যায়।

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

আর শরীরের ভিতর এমন একটা মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীজ।

পাশ্চাত্ত্য-চিন্তায় পবিত্র নদীজলে[১] শিশুকে অবগাহন করিয়ে তাকে তেজোময় করার চেষ্টা হত। দৃঢ় শরীরে দৃঢ় মন বাস করে[২] এ তত্ত্বও তাদের বিশ্বাসের সামগ্রী। কিন্তু দৃঢ়ত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে ধারণা পেতে গেলে দেহকে আশ্রয় ক'রে যিনি থাকেন তাঁর স্বরূপটি বুঝতে হবে এমন কথা তারা ভাবেনি।

স্বামীজি চেয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য—শুধু ছাত্রদের নয়—তার মনকে, তার জীবনকে নিয়ে যিনি কাজ করবেন সেই শিক্ষাব্রতীরও।

তিনি চেয়েছিলেন বিবেক। এজন্য তিনি আহার শুদ্ধির কথা তুলেছিলেন। ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিবেশন রীতি শোভন—রন্ধন উপকরণ ও নীতি অপরিচ্ছন্ন। ভারতবর্ষে রন্ধন-পদ্ধতি পবিত্র।

১ Dip them in the water of styx.

২ Sano in corpore sano.

পবিত্র আহারে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়[১]। আর সত্ত্ব শুদ্ধ হলে স্মৃতি ধ্রুব হয়[২]।

স্বামীজি চেয়েছিলেন বিমোক। 'বিমোক' অর্থে ইন্দ্রিয়-সকলের বহির্মুখী গতি নিরোধ করা ও নিজের অধীনে আনা।'[৩]

পাশ্চাত্ত্য তথা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন আবেগ ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে অবহিত। এর সুসমঞ্জস বিন্যাসে তাঁদের আগ্রহ আছে। স্বামীজির চিন্তায় বিবেক, বিমোক ছাড়া আরও চাই অভ্যাস, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ।

অভ্যাস বলতে তিনি স্নায়ুপথের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ ভাবতরঙ্গের গমনাগমন মাত্র বুঝতেন না। সেই অভ্যাস আয়ত্ত করা সম্বন্ধে তিনি একক্ষেত্রে বলেছিলেন—কোন অভ্যাসই ভাল নয়, সদভ্যাসও নয়, কু-অভ্যাসও নয়। অভ্যাসকে আচরণের স্তর থেকে বোধের স্তরে উন্নীত করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'ভক্তিযোগে' তিনি অভ্যাস অর্থে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস বুঝিয়েছেন।

অভ্যাসের "স্নায়ুগত" প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের যথেষ্ট আগ্রহ থাকার কথা। স্বামীজিও বলেছিলেন—education is the nervous association of certain ideas, এই সংযোগ স্নায়ুতন্ত্রে যদি একপেশে সামঞ্জস্যর দুর্বলভিত্তি রচনা করে তাহলে সর্বাত্মক বিকাশ ব্যাহত হবে। অথচ অভ্যাস স্নায়ুমণ্ডলীর বিন্যাসে এক দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি রচনা করতে পারে। বিজ্ঞাপন বা প্রচারকর্ম বা চিন্তানিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যক্তি-সত্তার জ্ঞান ও বিচারলাভের শুদ্ধতাকে নানাভাবে আঘাত করতে পারে। সে আঘাতে আঘাতকারীরও অধঃপতন—যেমন গ্রীকদেশে হয়েছিল[৪]। যেমন ভাবে

১ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি।

২ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি।

৩ সন্ন্যাসিনীবৃন্দা, "বিবেক-যোগ", পৃঃ ১১

৪ —২-দ্রষ্টব্য।

বন্দী হয়েছিল গ্রীক চিন্তাধারার কাছে বিজয়ী রোমকরা। আধুনিক সভ্যতা অভ্যাসের বেড়াজালে গোটা মানবতাকে বন্দী করতে চাইছে। শুধুমাত্র চেতনভাবে অসৎ ভাব বা অভ্যাস আমাদের চরিত্রে ও জীবনধারাতে অধিকার বিস্তার করছে তা নয়; অর্ধচেতন এবং অবচেতনে এর প্রভাব প্রায় অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে।

তাই স্বামীজি আলোচনা করেছেন—সৎ-অভ্যাস সৎ-স্মরণকে দৃঢ় করে। অভ্যাসের সচেতন প্রয়াসের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ভক্তিযোগে বলা হয়েছে:

যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল সৎ-অভ্যাসের দ্বারা নাশ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যথাযথ কর্মের অভ্যাস[১], মানসিকতার ও চিন্তার উপযুক্ত রীতি[২], সম্বন্ধে বিশেষ পর্যালোচনা হচ্ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নিয়ে বিচার চলছে।

বস্তুতঃ অভ্যাস মনের উপর যে অধিকার স্থাপন করে তারই প্রাধান্যে চিত্ত যথাক্রমে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র, নিরুদ্ধ এই স্তরে বিচরণ করে। প্রথমটিতে অনবরত ইতস্ততঃ বিচরণের অভ্যাস কার্যকরী; দ্বিতীয়টিতে সামান্য নিয়ন্ত্রণ আছে তাই—একটু থামে আবার দৌড় দেয়, ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে এতটুকু যোগ নেই। মূঢ় স্থির-চিত্ত—এখানে অভ্যাস দৃঢ় কিন্তু ভুল ইচ্ছা-শক্তির তাগিদ সে মেনে নিয়েছে। এসব পার হয়ে আসে একাগ্রচিত্ত—যেখানে একমুখী হয়েছে মন। অভ্যাস ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে স্থায়ী যোগ খুঁজে পেয়েছে। একাগ্রচিত্ত পর্যন্ত জগৎপ্রবাহ—তার পারে এলো নিরুদ্ধচিত্ত। যোগীদের অধিকার আছে তাতে প্রতিষ্ঠ হবার। সাধারণ গুণাধিকারীর জন্য একাগ্রতাই শ্রেষ্ঠ ধাপ।

১ habit of work.

২ appropriate slant or attitude.

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্ ডাঃ স্টার্চ[১] অভ্যাসের স্বয়ংক্রিয়তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন চিত্তসংযোগ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আসবে। পদ্ধতির রহস্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান তথা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে এখন যোগ-মনোবিজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবার জন্য দীর্ঘ সাধনায় ব্রতী হতে হবে। স্বয়ংক্রিয়তার মূল রহস্যভেদ তার আগে হবে না।

স্বামীজির মতে ব্রহ্মচারীর জীবন অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে আমূল সংগ্রাম। নবীন মঠবাসীদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় তালিকা[২] তিনি তৈরী করেছিলেন:

সকালে উঠে খুব জপ-ধ্যান-তপস্যা। তারপর স্বাস্থ্যরক্ষা আর খাওয়া-দাওয়ার উপর নজর দেওয়া। কথাবার্তা হবে শুধু ধর্ম প্রসঙ্গে।

প্রথম অবস্থায় খবরের কাগজ পড়া হবে নিষেধ। অতি আলাপী পরিচিত হলেও গৃহস্থের সাধুর বিছানায় শয়ন, উপবেশন, তাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন ছিল নিষিদ্ধ। এমনকি গৃহস্থের সঙ্গে মেলামেশা হবে অনুচিত। অর্থবান্ লোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। গরীবদের যত্ন করবে, সেবা করবে, ভালোবাসবে।

'ভক্তিযোগে' শিষ্যর সুলক্ষণ সম্বন্ধে স্বামীজি বলেছেন:

শিষ্য হবে কায়মনোবাক্যে পবিত্র, সত্যকার জ্ঞানপিপাসু আর অধ্যবসায়ী।

অভ্যাসের মূল কাজ সর্বসময়ে একটি কর্ম বা ভাবনাকে সুসম্পন্ন করার প্রস্তুতি আয়ত্ত করা। এজন্য বুঝতে পারার আগেই হয়ে গেল—automatically start...before you realize it—

১ "If you have difficulty...just begin to go through the motions of work··· sit down, take hold of book, paper or pencil or whatever may be needed, and begin to write or read or figure. This will automatically start the mental process···before you realize it. —Quoted by Sir John Adams, p. 159,

২ সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী, "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ", পৃঃ ২৩৬

এরূপ কথা অভ্যাসের নিম্নতর বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। মানুষের ক্ষেত্রে এগুলি হবে পশুসুলভ ও প্রবৃত্তিআশ্রয়ী অভ্যাস।

স্বামীজি এই অভ্যাস-চৈতন্যকে দৃঢ় করার জন্য তাঁর অনুগামী তরুণদের উদ্দেশ্য ক'রে বলতেন ঃ

তূরী, ভেরী কি ভারতে হয় না ? ঢাক-ঢোল কি দেশে মেলে না ? হরহর বমবম শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে—খেয়াল-টপ্পা বন্ধ ক'রে লোককে ধ্রুপদ শুনতে অভ্যাস করতে হবে।[১]

এই তো অভ্যাসের সচেতন অনুশীলন! চেতনের হাতে অবচেতন অভ্যাসের লোপ!

আবার অভ্যাসপ্রসঙ্গে দিনচর্যার ক্ষেত্রে স্বামীজির প্রয়াস[২] লক্ষ্যণীয় ঃ

'ধ্যানের ঘণ্টা পড়েছে অথচ যদি কেউ না আসত, অসুস্থ না হলে সেদিন ছিল তার মাধুকরীর ব্যবস্থা। ক্ষুধার সময় ছেলেরা মঠ থেকে চলে যাবে না খেয়ে স্নেহময় সংঘপিতার এও তো সহ্য হয় না—তিনিও চলে যেতেন কলকাতায়—পরের দিন রঙ্গ চলত—ওরে কিছু জুটেছিল কি ?

এমনকি ভাবনার অভ্যাস পরিবর্তনের জন্যও তিনি সচেষ্ট থাকতেন। চণ্ডালকে বলতে বলতেন ঃ বল আমি শিব। দ্বিধা-কুণ্ঠিত শিষ্যকে বলতেন, যদি হীন সাহস হয়ে পড়িস্....ভাববি আমি কার সন্তান ? হীনবুদ্ধি হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে—"আমি বীর্যবান আমি মেধাবান, আমি প্রজ্ঞাবান" বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবি। আমি অমুকের চেলা, ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী—এই অভিমান রাখবি।

সমগ্র জড়বাদী অভ্যাসের পটভূমিকায় এ কি চৈতন্যের মহিমায় উদ্ভাসিত নব-অভ্যাস রচনার বেদমন্ত্র! মহাকাল স্তব্ধ হয়ে শোনে—

১ সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী, 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" পৃঃ ২৪৯-৫০
২ " " " " " " ২৫৬

আমি চন্দ্র সূর্য গ্রহতারার গতিরোধকারী—আমিই সেই। তুলনায় ম্লান হয়ে যায় অভ্যাস গঠনের শিক্ষাবিজ্ঞানের যান্ত্রিক মত যা বলে: অভ্যাস হয়ে গেলে আর সে লিখন মুছবার উপায় নেই।[১] কিংবা বলে: জোর করে অভ্যাস ধরতে হয়—প্রতিদিন তাকে চর্চা করতে হয়—সুযোগ পেলেই অভ্যাসটি কাজে লাগাতে হয়—সম্ভব হলে একটু বেশীবার ক'রে তাকে পাকাপোক্ত করতে হয়।[২] ঢিমে তেতালায় সে অভ্যাস আসে না! দৃঢ়তার উৎস অন্যত্র। বিপরীত সংস্কার না গড়া পর্যন্ত অর্জিত সংস্কারই অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

আধুনিক শিক্ষারীতিই বিপরীতমুখী। বিদ্যা বন্ধনে পর্যবসিত হয়। মানবমনকে শিক্ষার আলোক উচ্চতম চেতনার স্তরে রাখতে পারেনি—জীবন ও মনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে। স্বামীজির মতে বিদ্যা মুক্তির[৩] সন্ধান দেয়। তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল-কথা ছিল—যা কিছু শিখছি তারই অভ্যাসে দিন-রাত্রিকে[৪] ধরে রাখবে—কোন ছেদ থাকবে না।

শিক্ষার্থীদের চিন্তার অভ্যাস সম্বন্ধে স্বামীজির বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি শিশুকাল থেকেই এটি অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতেন। শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশে তাঁর এ কথাটি হল:

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান চিন্তার ধারাটি সম্বন্ধে একটু অস্পষ্ট। জন লকের অভিজ্ঞতার তত্ত্বে মনকে[৫] ধোয়ামোছা শ্লেটের মত

১ তুলনীয়: The moving finger writes
২ William James—laws of habit talk of teachers.
৩ সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
৪ অনেনাধীতেনাহোরাত্রীন্ সংদধামি—"স্তব কুসুমাঞ্জলি"।
৫ Tabula rasa theory of mind. —John Locke

বলে কল্পনা করা হয়েছিল। তারপরে লাইবনিজ বলেছিলেন মন পুরাতনের সাহায্যে নূতন[১] ভাব ও অভিজ্ঞতাকে বোঝে। হার্বার্ট এই তত্ত্বের পরিণতি টেনে বলেছিলেন কিছু ধারণাসমষ্টি আছে যা নূতন ধারণাকে বোধ্য করতে ও আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে এবং এই ভাব-জটকে[২] আশ্রয় করেই শিক্ষাদান চলবে। কোথা থেকে এলো এই ভাব-জট ? কেনই বা তা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে পৃথক্ ? যদি পৃথক্ হয়—তাহলে নূতন বোধ্য ধারণার সাঙ্গীকরণ কি ভাবে সম্ভবপর ? এ সব প্রশ্নের উত্তর আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান কিছু কিছু দিয়েছেন—কিন্তু হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি শিক্ষা-রীতির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ পেয়ে গেছে।

স্বামীজি এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে :

ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—আবিষ্কার। মানুষ যাহা শিক্ষা করে প্রকৃত পক্ষে সে উহা আবিষ্কার করে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম গবেষণা তথা গিল-ফোর্ডের বোধের ত্রি-বিধ বিশ্লেষণ জড় ও চেতনের সম্পর্ক রচনার সূত্রটিকে নানা ভাবে বিচার ক'রে দেখছে। গিলফোর্ড অবশ্য রুশ স্নায়ুবিজ্ঞানীদের জড়বাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি; ঐ স্নায়ু-বিজ্ঞানীরা চিন্তন ও মনন পরিপূর্ণ ভাবে স্নায়ুগত স্থিতি ও বিন্যাসের যান্ত্রিক যোগাযোগের ফলে ঘটতে পারে এমন আলোচনাই করেছেন তাঁদের শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে। তাঁরা মননশক্তিকে স্নায়ু নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংহত করার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ

১ Law of apperception. —Leibnitz.

২ Apperception mass. —Johann Fridrich Herbart.

৩ Herbartian five steps of teaching.

করেছেন[১]। গিলফোর্ড জড় আর চেতনের যোগসাধনে যে ত্রি-বিধ প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয় তার প্রথমটিকে বলেছেন পঞ্চমুখী প্রক্রিয়া—মনের মনাতীত বা বহিস্থ বিষয় সম্বন্ধে সচেতেনতা। বিষয়-বোধ বা স্মরণ, বিষয় সম্বন্ধে বিশ্লেষণী চিন্তন, বিষয় সম্বন্ধে সংশ্লেষণী চিন্তন। বিষয়ের মূল্যায়ণ বা গুরুত্ব তথা তাৎপর্য বিচার[২]। বিষয়ের অন্তর্নিহিতির রূপ চার প্রকারের—প্রতীক, উদাহরণ, শব্দার্থতত্ত্বসাপেক্ষ ভাষা, চিন্তনময় মানুষের ব্যবহারমুখীনতা[৩]। ফল হয় ছ'রকমের[৪]।

স্বামীজির চিন্তনতত্ত্ব জড়ত্বের সকল নির্মোকরহিত। তাঁর মতে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। তত্ত্বান্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে বাহ্য বস্তুর রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্বিদ্ নিজের মনের সমূদয় শক্তি একত্র করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন আর অমনি তারা, সূর্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই আপনাপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে।"[৫]

বৌদ্ধশাস্ত্রে কামাবচর ও রূপাবচর চিত্ত কি ভাবে সৌমনস্য, উপেক্ষা এবং দৌর্মনস্য সহগত হয়—তারপর দৃষ্টিগত ও প্রতিম-সম্প্রযুক্ত ও বিপ্রযুক্ত হয় ও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়-বিজ্ঞানকে

১ Simon : Book on Recent Russian Neuro-phychological studies, London.

২ Guilford : 5 factors of operation—becoming aware of entities (extra-mental aspects of mind), remembering (stamp of entities on mind), thinking divergently on them, thinking convergently on them, Evaluating (attaching varying amount of importance),

৩ 4 factors of contents—symbol, illustration, semantic oi words, behavioural ends in certain conduct.

৪ 6 factors of products—units, classes, relations, systems (meaningful orders), transformations, implication (meaning to the individnal).

৫ স্বামীজি, "রাজযোগ"।

আশ্রয় ক'রে তার জটিল বিচার আছে।[১] সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় স্বামীজি এই চিত্ত-চৈতসিক তত্ত্বর কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিচারে মনে কিছু আবরণ আছে। এই আবরণ সরার নামই জ্ঞান। কোন কোন আবরণ বহিঃপদার্থর সম্প্রয়োগেই মন সরাতেই পারে। সেই জ্ঞানই বহিস্থ পদার্থের জ্ঞান। তাঁর ভাষায়ঃ

বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল মানুষের অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে।

এই মতে স্বামীজি ক্যান্টের সহিত প্রধানতঃ মতৈক্য পোষণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে অ-রূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত-ভূমি বলে নির্দেশ করা হয়েছে সেখানে ক্যাণ্ট বাণীহীন। স্বামীজির জ্ঞানাভ্যাস সে ক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে পেরেছে ঃ

একরূপ, অ-রূপ নাম-বরণ-অতীত আগামি-কাল-হীন দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।

শিক্ষাতন্ত্রে এ জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া জানা নেই।

বুদ্ধিকে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা সংজ্ঞার সীমানায় বাঁধতে পারেননি। তাই কেউ বলছেন কার্যকারণসম্পর্ক বিচারের ক্ষমতা[২]—কেউ বলেছেন পরিস্থিতিবোধে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার সৃজনাত্মক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি[৩]। তাৎপর্য নির্ধারণ করার এবং তার সঙ্গে

১ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, "পরমার্থ পরিচয়" অভিধম্মপিটক অনুসারে।

২ 'to evoke relevant ideas...to discover relevant qualities and relation of the objects of ideas that are before us.

৩ 'capacity for relational, constructive thinking directed to the attainment of some end.'

সঙ্গতি রেখে অনুরূপ ভাবনা মনে জাগানোর ক্ষমতাকেও বুদ্ধি বলা হচ্ছে।[১]

বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব কিনা জানি না।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বলেন ষোল বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। স্বামীজির ব্রহ্মচর্য ব্রতে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার সঙ্গে এর বোধ করি একটু সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বীর্যবান, বিবেকবান, সংযত চরিত্র মানুষ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর থাকতে পারে এই স্বামীজির কথার তাৎপর্য। স্যাণ্ডউইক[২] ৪২৩ জন ছাত্রকে নিয়ে তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সেরা চল্লিশ জনের মধ্যে ৫২% সর্বপ্রকার দেহযন্ত্রের বিকলতামুক্ত আর পিছনের দিকের চল্লিশ জনের সবাই-ই দেহযন্ত্রের কোন-না-কোন বিকলতায় ভুগছে।

চরিত্র গঠন ও বুদ্ধির কার্যকরী রূপ সম্বন্ধে স্যর সিরিল বার্ট দেখেছেন অপরাধী কিশোরদের ৮০% বুদ্ধিরেখার মধ্য স্তরে। মাত্র ৮০% হল বুদ্ধিহীন। বার্ট অবশ্য বলেছেন হীনবুদ্ধি বালক বুঝতেই পারে না কোন্ কাজটা অসৎ, আর অসৎ কাজ ঠিক নয়।[৩] সমাজের বিচারে বার্ট যা বলছেন সেই সত্য ব্যক্তির বিকাশমুখীনতার দিক দিয়ে স্বামীজি পর্যালোচনা ক'রে দেখিয়েছেন। তার লক্ষ্য প্রেয়তে নয়, তার পরের ধাপে ঃ

যখন মন অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

১ 'sieze upon the significant aspects of the objects or ideas before one and to bring to mind other ideas that are relevant.'

২ Quoted by Rex Knight in "*Intelligence and Intelligence Tests*"

৩ "The defective child is without necessary insight to perceive fc- himself or to hold effectively in his mind, that what tempts him is dishonest, and that dishonesty is wrong." —Sir Cyril Burt, "*The Young Delinquent*", p. 296.

যে রিপুর বশীভূত সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না। সে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সে বড় কাজের লোক হয় না।

কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়া থাকে।

সুতরাং স্বামীজির মতে বুদ্ধির সঙ্গে সংযম চাই। নাহলে কিছু হবে না। জগৎ-ইতিহাসে দেখা গেছে শ্রেষ্ঠ সংযমী মানুষরা অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এর বিপরীতটি অবশ্য সত্য নয়; অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী মাত্রই সংযমী ছিলেন না, মহৎ ছিলেন না। বুদ্ধির এই অপচয় স্বভাবতঃই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বামী মলিনবুদ্ধিকে অপছন্দ করতেন। তাঁর মতে মলিনবুদ্ধি আর হীন-বুদ্ধি এক নয়। প্রথমটি হল সংযম-অভাবজনিত; দ্বিতীয়টি হল কর্মফল বা অর্জিত সংস্কারজনিত। তাই হীনবুদ্ধিদেরও শোনাতে হবে—তুমি অমৃতের সন্তান।

বুদ্ধিকে মালিন্যরহিত করার উপায় নির্দেশ ক'রে স্বামীজি বলেছেন ঃ

বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান। অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। একটু একটু ক'রে পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটাকে খুব পাতলা করে ফেলতে পারি।

হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধিকে যে ভাবে দেখা হয়েছে তাতে আত্মার জ্ঞান জানাই বুদ্ধির কাজ। কাম মোহর সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে বুদ্ধি নাশ

১ Goering was in the top percentile of Intelligence scores'.

—Quoted by Rex Knight

হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের পক্ষে এরূপ বিচার করা যুক্তিপূর্ণ হতে পারে যে, মানুষ পশু ও দেবতার মধ্যস্তরে আছে—জৈব প্রবৃত্তি এবং দিব্য জীবন এই দুটি স্তরে তার বিচরণ সম্ভবপর। স্বামীজি বুদ্ধিকে উর্ধ্বগামী করার মতটিই প্রচার করেছেন। তাই এমনকি যাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ তাদেরও শেখাতে বলেছেন—তুমি অমৃতের সন্তান।

তাহলে তো প্রবৃত্তির প্রবলতা সম্বন্ধে স্বামীজি সচেতন ছিলেন! তবে কেন তিনি বললেন:

অপরের প্রবৃত্তি উল্টে দেবার নামটি পর্যন্ত করো না। তাতে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে।

এ প্রশ্নের উত্তর প্রবৃত্তির প্রবলতায় স্বামীজি আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি প্রবৃত্তির প্রবলতা সম্বন্ধে অবহিত হতে এবং তার বিস্তৃতি কতদূর তা নিরূপণ করতেই উৎসাহ দিয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী প্রবৃত্তির শক্তি সম্বন্ধে অসহায়। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রবৃত্তির উদ্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রবৃত্তিগুলিকে গঠনমূলক কাজে এবং সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিযুক্ত করবেন। সম্ভব হলে মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শ ও ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে প্রবৃত্তিগুলির উর্ধ্বায়নে সচেষ্ট হবেন।

স্বামীজির চিন্তার বিশ্লেষণে শ্রীগীতার প্রবৃত্তি সংক্রান্ত দুটি আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এক, মানুষ যদি বাইরে তার ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত ক'রে রাখে অথচ মনে মনে সে ইন্দ্রিয় বিষয়-গুলি স্মরণ করে তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে।[১] দুই জ্ঞানবান মানুষও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করেন। অন্যরাও

১ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।—শ্রীগীতা ৩।৬

তাই করে। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ কিভাবে করবে?[১] প্রকৃতি অনুযায়ী প্রবৃত্তি—জীবের প্রবৃত্তি স্বভাবের অনুবর্তন করে,—জন্মকালেই এই প্রকৃতির সূচনা—এই অনুযায়ীই চলতে হবে সবাইকে। শিক্ষাবিজ্ঞানী উদ্ধত হয়ে এর পরিবর্তন আনতে পারেন না। বরঞ্চ প্রকৃতি-প্রবৃত্তির গতিপথটি স্বাভাবিক ক'রে তোলাই শিক্ষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব। সমস্ত প্রবৃত্তির নিবৃত্তি যেখানে তাঁর দিকে যদি দৃষ্টি সঞ্চার করানো সম্ভবপর হয় তবেই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই স্বামীজি কর্মযোগের আহ্বান শুনিয়েছিলেন দেশবাসীকে। বিবর্তনবাদের মূল কথাই স্বামীজিপ্রবর্তিত লোককল্যাণ কর্মের আড়ালে কাজ করেছে। লোককল্যাণের দ্বারা আত্মশুদ্ধি—আত্মনো মোক্ষায় জগদ্ধিতায়। জগতের হিত সাধনে আমার কল্যাণ, আমার মুক্তি।

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন শিক্ষার্থীর মনের স্বাধীনতা সেটিই শিক্ষার্থীর প্রবৃত্তির স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন এর গুরুত্ব আছে, তেমনি রয়েছে দেশগত ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও। তাই কোন ধর্মকে বা কোন আচারকে, দেশভেদে আদর্শভেদকে স্বামীজি ছোট ক'রে দেখেননি। সবই বিকাশের এক একটি স্তরের প্রকাশ।

জাতীয় প্রকৃতির প্রাধান্য স্বীকার ক'রেই মার্গারেট নোবলকে তিনি কিছুতেই ভারতে সহজে আসতে দিতে চাননি। তাঁকে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেও সন্ন্যাসের দীক্ষা নিবেদিতাকে তিনি দিয়ে যাননি। মাদ্রাজবাসী যুবকদের তিনি যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন—বাঙালী যুবকদের সেই এক আহ্বানে ডাকেননি। তিনি একঘেয়ে হননি। অবস্থাভেদে তিনি ভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন।

'কর্মযোগে' এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি সূত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে ঃ

১ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥—শ্রীগীতা ৩।৩৩

সুতরাং শিক্ষার একটি কথা সকলকে মনে রাখতে হবে যে অপর দেশের আচার, শিক্ষা-রীতি বিচার করতে কখনও নিজের মাপকাঠি ধরলে চলবে না। আমাকেই সমুদয় জগতের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হবে।

"আমার সমর নীতি" বক্তৃতায় স্বামীজি এ তত্ত্বটি আরও প্রাঞ্জল ক'রে শুনিয়েছেন ঃ

ব্যক্তির মতো প্রত্যেক জাতির ও জীবনের একটি মূলনীতি, একটি ভাবকেন্দ্র—একটি প্রধান সুর আছে—যাহাকে বেড়িয়া অন্যান্য গৌণ সুরগুলি ব্যঞ্জিত হয়। যদি কোন জাতি···যে অভিমুখীনতা লাভ করিয়াছে উহার মোড় হঠাৎ ফিরাইতে চায়···তাহা হইলে সেই জাতির মৃত্যু সুনিশ্চিত।···

কোন জাতির পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইল তাহার প্রাণ-শক্তি —যেমন ইংলণ্ডে। কোনও জাতির ক্ষেত্রে উহা সৌন্দর্য-প্রিয়তা বা এইরূপ অন্য কিছু।

শিক্ষানেতা স্বামীজি প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সংরক্ষণে কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার একটি কাহিনী আছে।[১] মাদ্রাজের শ্রীঅলসিংগ পেরুমাল—শ্রীমতী জোসেফাইন মেকলিয়ডকে স্বামীজির নির্দেশে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সন্তান অলসিংগের ললাটে সুদীর্ঘ তিলক-টানা দেখে শ্রীমতী মনে মনে না হেসে পারেননি। পরবর্তী কালে একদিন তিনি স্বামীজির কাছে আক্ষেপ জানিয়ে বলেছিলেন ঃ What a pity that Mr Alasinga wears those Vaishnavite marks on his forehead! নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে স্বামীজির সমর্থন প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু ফল হলো উলটো! দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে

১ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "দক্ষিণ ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ",
—স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৭

স্বামীজি বলে উঠলেন: Hands off! What have you ever done?

তিনি নিজেও প্রবৃত্তি তথা প্রকৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীপনা রক্ষা করতেন।[১]

প্রবৃত্তিসমূহ তো থাকবেই। স্বামীজি শিক্ষাতত্ত্বে ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রাধান্য দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে—'যে শিক্ষায় ইচ্ছা-শক্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফল হয় তাই শিক্ষা"।

মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে চাওয়ার তীব্র ইচ্ছাশক্তিই প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির সত্যকার নিয়ামক হতে পারে।[২]

বিশ্বপ্রকৃতিতে বারবার পরিবর্তন আসে—ব্যক্তি-মানুষের প্রবৃত্তিতে কোন অদলবদল আনতে গেলে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অবদমন, ঊর্ধ্বায়ন কি ছন্দে চলছে তা বোঝাও প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী যে 'জাতিগত উত্তরাধিকারের'[৩] কথা বলে থাকেন তা শুধুমাত্র সংস্কৃতির প্রসঙ্গেই বলেন না—প্রবৃত্তি-প্রবণতার প্রসঙ্গেও বলেন। স্বামীজি নিজের জীবনে যাঁদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন তাঁদের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্প্রদায়, বর্ণ, বংশ প্রভৃতিকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল তার কাঠামোতে স্বামীজি কোন বদল আনেননি—এনেছেন তার শক্তি প্রয়োগের গতিতে, বিকাশের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে।

ভগিনী নিবেদিতার ইয়োরোপীয় পোশাককে স্বামীজি প্রসন্ন ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

১ "In manner Vivekananda was natural, uneffected and unconventional. There was none of that solemn gravity, measured utterance and even temper that we usually associate with a sage."

২ তুলনীয়: Be noble! and the nobleness that lies
In other men, sleeping but never dead
Will rise in majesty to meet thine own.
—James Russel Lowell

৩ স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, "স্বামীজির সন্নিধানে"
—উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৫০২।

ডাঃ জন হেনরী রাইট (ডকি) স্বামীজির ধর্মপ্রসঙ্গের ক্লাসে দেরীতে আসতেন। স্বামীজিকে ডাঃ রাইট ব্রহ্ম আলোচনার কালে বারবার জিজ্ঞাসা করতেন—তাহলে আমিই ব্রহ্ম, আমি শাশ্বত। যখন ডাঃ রাইট সামান্য দেরী করে শ্রেণীতে আসতেন তখন স্বামীজি অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখে হাস্যোদ্দীপক মিটমিট ভাব এনে বলতেন—এই ব্রহ্ম আসছেন, এই দেখ শাশ্বত।

প্রবৃত্তি কি স্থান নিয়ে আছে তা শিক্ষকের দেখানো কর্তব্য বলে স্বামীজি মনে করতেন। শ্রীমৎ সদানন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই বর্ণসচেতনতার প্রবৃত্তিটির অস্তিত্ব স্বামীজি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অন্তরঙ্গ ভক্তদের :

আজ এই ভট্চাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তো আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি ?[১]

ব্যক্তির প্রবৃত্তি এই ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের ছুতমার্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। স্বামীজি বোধকরি দুটিকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

নিজ সংঘ-জীবনেও যৌথ মনস্তত্ত্বর কার্যকরী রূপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এক পত্রে মানব-প্রবৃত্তির এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন :

···এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে কারও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majorityর (অধিকাংশের) হুকুমে হবে···সেই মত ট্রাস্ট-ডীড্ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি। এখন তোমরা যা হয় কর। গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা করে দিচ্ছি। কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই ক'রে দিয়েছি।[২]

ম্যাগডুগালের[৩] বিশ্লেষণে কোন প্রক্রিয়ার কর্তা, নেতা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২৩

২ স্বামীজির পত্র, আগস্ট ১৯০০

৩ Modougall : Social Psyohology···"*Positive self feeling*".

বিবেকানন্দর কত্তাক্তির প্রবৃত্তি ধুয়েমুছে গেল? তেরো বৎসর আগের নরেন্দ্রনাথ এবং মঠের একজন ভাইর কথোপকথন এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

নরেন্দ্র—আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।

মঠের ভাই—আচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ?

নরেন্দ্র—তুই কি বুঝবি? Servant class. তুই ঈশ্বরের সেবকের থাক আমার সবাই পা টিপবে। শরতা মিত্তির আর দেসো পর্যন্ত। তুই মনে করছিস বুঝি সেসব তুই বুঝিছিস্। লে তামাক সাজ।

মঠের ভাই—সা-জ-বো।[১]

স্বামীজির প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য আদর্শ। তিনি সবাইকে সহজে গ্রহণ করতেন। আনন্দময় সেই সত্তা ধুলামাখা সব সন্তানকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা বুঝতেন ধুলার মালিন্য ঝরে পড়ছে। এমন একটি স্বীকৃতি:

"ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদপের মত কথা বলছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম।[২]

সমস্ত প্রবৃত্তির বিস্তার ঘটেছে পরমপুরুষ থেকে—শ্রীগীতার তত্ত্বে যাকে বলা হয়েছে...পুরুষং...যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।[৩] স্বামীজি এই তত্ত্বের উপর তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রবৃত্তির তত্ত্বকে মেনে নিয়েই তার নিবৃত্তির সম্ভাবনা স্বামীজির জীবনব্যাপী শিক্ষাব্রতে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

১ শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ পরিশিষ্ট (৯ই মে ১৮৮৭) পৃঃ ৩৮৫
২ ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ৩৯৭
৩ শ্রীগীতা ১৫।৪

॥ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ॥

প্রথম জীবনে যখন শ্রীঠাকুর লিখেছিলেন : নরেন লোকশিক্ষা দেবে।

—স্বামীজি তখন বলেছিলেন, ওসব আমি পারবো না।

শেষ জীবনে স্বামীজির পত্রে শিক্ষাদান প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। —"শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।"

স্বামীজি মনেপ্রাণে শিক্ষকের একটি গুণকে শ্রদ্ধা করতেন—সেটি শিক্ষকের জীবনব্রত। যে ব্রতের দুটি দিক—এক, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর জ্ঞান বিকিরণ করা। শিক্ষকের কাজ চিত্তের উদ্বোধন, তথ্য পরিবেশন মাত্র নয়। তাঁর ভাষায় :

'আমরা গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না।'

'কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে, শিক্ষাপ্রদান অর্থে বুঝায় ভাব সঞ্চয়।'

'সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু আচার্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।'

একেই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান "গুরু-শিষ্যের সাক্ষাতে ও সহযোগে শিক্ষা" বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্বামীজির মতে জ্ঞান ভিতরের সামগ্রী। সুতরাং ভিতরের অবস্থা বুঝে শিক্ষককে এগোতে হবে। তাই তিনি বলেছেন :

যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। আর শিষ্য যে অবস্থায় রয়েছে তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে।

তা নাহলে মনের যে কুঠুরীতে শিষ্য আছেন, আর গুরু যে কুঠুরীতে আছেন তার মধ্যের যাতায়াতের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে

না। শিক্ষকের কর্তব্য হবে 'অধীরতাকে দমন ক'রে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কুঠরীতে ঘুরিয়ে লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করা।"[১]

আচার্যরূপে স্বামীজি সর্বতোভাবে জিজ্ঞাসু মনোভাবকে উৎসাহ দিতেন। জিজ্ঞাসার মূল পর্যন্ত যেতে তিনি চাইতেন। এজন্য তাঁর ক্লান্তি হত না।[২] হয়তো প্রশ্নকর্তা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন —কিংবা অমনোযোগী বলে পুনরায় প্রশ্ন করছেন। কিন্তু স্বামীজি স্মরণ রাখতেন যে তাঁরা জানতে চান। এই চাওয়ার সাধ্যমত পূরণ করার জন্য শিক্ষক তাঁর সাধ্যাতীত প্রয়াস করবেন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব স্বামীজির এই বিশেষত্বর জন্য তাঁকে আদর্শ শিক্ষক বলেই গণ্য করেছেন।

স্বামীজি নিজেই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক শিক্ষককে ছোট নজরে দেখেছেন। তিনি চাননি শিক্ষাদান কখনও নিষ্প্রভ গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়। তাই তার দোষটি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন :

শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা ; শিক্ষক যেখানে দাতা, ছাত্র শুধু গ্রহীতা—সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের যষ্টি'। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না ; সে সর্বদাই নিজেকে অক্ষম ও দুর্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখে।

বিকাশই জীবন, বদ্ধতাই মৃত্যু। ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় বিকাশ সম্ভবপর হয় জ্ঞাননদী, শিক্ষাজীবন প্রবহমানতায় সাগর-সন্ধানে এগোয়।[৩]

১ শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, "বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি", পৃঃ ১৯।

২ "He encouraged questions at the end of each lecture, and once when someone suggested that they were tiring him with too many questions, he said, 'Ask all the questions you like, the more the better. That is what I am here for and I won't leave you until you understand'." —Ida Ansell.

৩ 'Fettered and cramped, life is like a little sluggish rivulet. Free, it becomes the boundless ocean'. — Iqbal.

কত বিচিত্র ভাবেই শিক্ষকমনের অনুভবগুলি স্বামীজি প্রকাশ করেছেন! জড় মন যদি থাকে ছাত্রদের, সে ক্ষেত্রে বাহিরের সাহায্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিষ্য সদানন্দকে এ বিষয়ে তিনি বলেছেন:

—'বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র।'

—'বাহিরের সহায়তারও আবশ্যক আছে মহাশয়?'

—'তা আছে। তবে কি জানিস, ভিতরে পদার্থ না থাকলে পর সহায়তায়ও কিছু হয় না।'[১]

'উর্ধ্বগতি থাকলেই মানুষ মানুষ। তা না হলে সে পশুর চেয়েও অধম' বলে স্বামীজি শিক্ষায় প্রয়াসের গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২] উর্ধ্বগতির অর্থ পশুজীবনের উত্তরাধিকার লঙ্ঘন করা—অতীত অভিজ্ঞতার আলোয় পরবর্তী ক্রমের জীবনে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করা।[৩]

শিক্ষানায়ক স্বামীজি শিক্ষাধারার পারম্পর্য রচনা করেছেন। গভীর স্নেহ দিয়ে স্নেহধারা বইয়েছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দিয়ে অন্তর্দৃষ্টির শক্তি জুগিয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতার লেখায়[৪] দুটির উত্তরাধিকার অপরূপ বিশেষত্ব নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"Even an ignorant mother by teaching her boy to love and to act on his love, can be the biggest of educators."

—জ্ঞানহীন মাও হয়ে উঠতে পারেন সেরা শিক্ষানেত্রী ছেলেকে প্রেম-স্নেহের শিক্ষা দিয়ে!

১ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, দ্বিতীয়া বল্লী।

২ "Man is man, so long as he struggle to rise higher, otherwise he is worse than a brute". —Swamiji

৩ "Man differs from the lower animals because he preserves his past experience". —John Dewey

৪ Nivedita: "*Civic and National Ideals*" 1918

"This generation may well cherish the hope that they shall yet see the hand of the great mother shaping a womanhood of the future so fair and noble that the candlelight of the ancient dreams shall grow dim in the dawn of that modern realization."[১]

শ্রীমা তাই তো প্রার্থনা জানিয়েছিলেন :

আমি প্রার্থনা করিতেছি এই বিদ্যালয়ের উপর যেন জগজ্জননীর আশীর্বাদ থাকে এবং যে সকল বালিকা এখানে শিক্ষালাভ করিবে তাহারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয়।[২]

"জড় অচেতন ভূত কখনও জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতর যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানিগণের সর্বদাই আমাদের নিকটে থাকার প্রয়োজন।[৩]

"সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন।"

শিক্ষক যে সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে বুঝান—একটি প্রদীপ থেকে আর প্রদীপগুলি জ্বলে ওঠে এই বোধই স্বামীজির উপরের কথায় ফুটে উঠেছে। শিক্ষার সাঙ্গীকরণের চিন্তাও তাঁর শিক্ষাদর্শে খুব জোরালো হয়ে উঠেছে—যার ফলে তথ্যার্জনের বদলে ভাব ধরতে পারা এবং তার ভিত্তিতে জীবন গড়তে তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন।

উৎসাহ দেবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব, কথ্য জোরালো ভাষা, পরিহাসপ্রিয়তা, সর্বকর্মে যুক্ত হবার নিরন্তর প্রয়াস স্বামীজির ছিল।

১ তুলনীয় : 'By the past, through the present, to the future'.
—Auguste Comte.

২ নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শ্রীমায়ের আশীর্বাণী—"বিশ্ববাণী" পৌষ ১৩৬০, পৃঃ ৫৪৯।

৩ পুস্তকপ্রত্যয়াধীতং নাধীতং গুরুসন্নিধৌ
ভ্রাজতে ন সভামধ্যে ইত্যাদি ......

প্রসন্ন কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত প্রাণধর্মের বিরাটত্ব, ব্যক্তিমনের অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তির খেলা যাঁরাই স্বামীজির কাছে গেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন। তাঁর কথোপকথন সর্বদা জীবন্ত হয়ে উঠতো—চিঠিতেও এই জীবন্ত ভাবটি রূপ নিয়েছে। মানুষের মনের গড়ন বুঝে সজীব, সরস ও গতিশীল ভাষার ব্যবহার শিক্ষানায়ক বিবেকানন্দর একটি বিশেষ গুণ ছিল। আবার আপন সত্তার বৈভব ও ভাবগত ঐশ্বর্য বহন ক'রে বাচনভঙ্গী, উচ্চারণ, স্বর-গ্রামের নিয়ন্ত্রণ, উৎসাহ বা নিন্দাসূচক বা অন্য কোন আবেগপ্রবাহ বাচ্যকে অসামান্যতা দান করেছিল। আত্মপ্রকাশ চাইছে অথচ পাচ্ছে না এমনতর অবস্থা স্বামীজির মৌখিক ভাষার কখনও হয়নি; —লিখিত ভাষণে বা পুস্তকে লোক-শিক্ষক বিবেকানন্দ সংহতির প্রয়োজনে ভাষার কোন স্তরকে প্রাধান্য দিয়েছেন আবার সাবলীল-তার স্বার্থে লৌকিক স্তরকে আশ্রয় করেছেন এটি লক্ষণীয়।

দুই ভাষা ব্যবহারের অসামান্য শক্তি তিনি তাঁব শিষ্য ও সহগামী-অনুগামীদেব মধ্যে সঞ্চাব করেছেন। মানসিক প্রশিক্ষাই ভাষার উৎকর্ষব গোড়ার কথা—ভাবনার স্বচ্ছতা ও ভাবনা প্রকাশের প্রত্যয় দুই-এ মিলে ভাষাকে শক্তিময়ী করে।

ভগিনী নিবেদিতার ভাষা বা স্বামী শুদ্ধানন্দের ভাষা যাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাই অনুভব করতে পারেন শিক্ষকাগ্রগণ্য যীশু যেমন ক'রে তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে একটি সহজ, ঋজু অথচ দৃঢ়, মধুর ভাষার শক্তির উত্তরাধিকার দিয়েছেন—সক্রেটিস যেমন প্লেটোর সামনে মহৎ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন—এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস যেমন সন্ত টমাস একুইনাসকে যুক্তির শৃঙ্খলমালা অথচ যুক্তিবিচার অতীত ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করার পাঠ দিয়েছেন—সেই ধারারই অনুপ্রেরণা ও আদর্শ তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। দীর্ঘকাল অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্ভাসিত ভাবনাগুলি স্বামীজির ভাষাদর্শকে সামনে রেখে প্রকাশ খুঁজে পাবে।

স্বামীজির শিক্ষাদান আসলে আপন দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাদান। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মানবতার বিষয়াদি বলে কিছু কিছু জ্ঞানক্ষেত্রকে বিশেষ ক'রে চিহ্নিত করেছেন। এই ক্ষেত্রের জ্ঞানানুশীলনে বা অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব হল শিক্ষক নিজে যে ভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন—কোন কোন বাধা বা অস্পষ্টতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং কি ভাবে তার কতটুকু অতিক্রম করতে পেরেছেন তার পথ-পরিচয়, মানসিকতার পুরো মানচিত্রটি ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করা ; স্বামীজি এই বিশেষত্ব শুধু মাত্র বোধে জেনেছিলেন তা নয়, প্রয়োগে স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলেনও। স্বামীজির যুগশিক্ষাযজ্ঞে তাঁর সহ-যাত্রী স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী-তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দর বক্তৃতা, লোক-ব্যবহার ও রচনা স্বামী বিবেকানন্দর পথ-সঞ্চারী শক্তি বিশেষ আনুকূল্য দান করেছে।

শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থবোধ এই হল স্বামীজির মূলতত্ত্ব :

ছাত্রের প্রবৃত্তিকে সদভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে আমরা কখনও উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না। যিনি মুহূর্তে ছাত্রদের সঙ্গে অভিন্নাত্মা হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি একেবারে ছাত্রের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে ছাত্রের আত্মায় একীভূত করিয়া তাহারই মন দিয়া সব কিছু দেখেন ও বুঝিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ, অন্যে নহে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উৎস ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষকের উপস্থিতি অনিবার্য বলে মানেন ; কিন্তু চান না যে শিক্ষক পুনঃ পুনঃ আপন উপস্থিতি ও অস্তিত্ব-প্রাধান্য দাবী

করেন।[১] মারিয়া মন্তেসরীর শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথাই হল শিক্ষককে পটভূমিকায় থাকতে শেখানো[২]—যাতে করে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাঝে ব্যবধান দূর হয়ে যায়।

স্বামীজির শিক্ষাচিন্তা স্বামী অভেদানন্দর ভাবনায় কি ভাবে ধরা পড়েছিল তার একটি উদাহরণ আছে তাঁর শিক্ষাদর্শ সংক্রান্ত গ্রন্থে: We will have to raise the vibration of our minds to the level of the vibration of the mind of the author.[৩]

এই ভাবসাযুজ্যর মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়—এ মাধ্যমটির প্রচলিত নাম শ্রদ্ধা। স্বামীজি তার ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন:

পিতৃপুরুষ ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ, শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধও সেরূপ। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের অন্তরে যদি বিশ্বাস, বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে ছাত্রের কোন চিত্তোন্নতি হইতে পারে না। সে সকল দেশ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রাখিতে অবহেলা করিয়াছে, সেই সকল দেশে শিক্ষক কেবল বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতা মাত্র।

ভারতের তরুণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি-দৃপ্ত ভবিষ্যৎ রচনার আগ্রহ তাঁহাকে ছাত্রমনের কত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে তা যৌবনের প্রতি বিবেকানন্দর আহ্বানে পরিস্ফুট:

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ![৪] বীর্যবান হও। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার প্রথম বাণী। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা

১ 'if he is continuously interposing himself and saying "instead of looking at trutht my children, look at me and see how skilfully I do my work. I thought I taught you admirably to day. I hope you thought so too'."

'No, the teacher must keep himself entirely out of the way...'

—George Herbart Palmer: *The Ideal Teacher*.

২ "Montessorianism is a consistent sweeping away of everything including the teacher, except perhaps the apparatus that can obscures our view of the living child." —Sir John Adams.

৩ Swami Abhedananda: *Ideals of Education*, p. 14. 1921.

৪ তুলনীয়: 'teacher is the friend, philosopher and guide.'

স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। তোমাদের পেশীগুলি কিঞ্চিৎ সবল হইলে তৎসাহায্যে তোমরা গীতার মর্ম অধিক বুঝিতে পারিবে। তোমাদের রক্ত একটু সতেজ হইলে তোমরা কৃষ্ণের অপূর্ব প্রতিভা ও অদম্য শক্তির সুন্দর পরিচয় পাইবে।

উপনিষদের "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" লোকগুরু বিবেকানন্দর মুখে তাঁর যুগোপযোগী ভাষান্তর গভীর শিক্ষা-চিন্তার শক্তিতে তরুণদের জীবনাদর্শকে স্পষ্ট ক'রে তুলেছে এ আমাদের বিশ্বাস।

সংখ্যাহীন শিক্ষায়তন, বিচিত্র পদ্ধতি, বহুবিধ উপকরণের সমারোহে আধুনিক পৃথিবীতে ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের গোড়ার কথাটি হারিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে কল্পনাও বাধাহীন দৌড় দিয়েছে—একদল কল্পনা করছেন শিক্ষকহীন শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষণযন্ত্রগুলি ছাত্রদের বৌদ্ধিক এবং আবেগগত পরিস্থিতি যথাযথভাবে বুঝে শিক্ষা দিতে থাকবে। আর অন্য দল পরিকল্পনা করছেন শিক্ষণযন্ত্রের মতো শিক্ষক সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের শিক্ষা দিয়ে যাবেন, ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও আবেগগত সমগ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে।[১]

মনুষ্যজীবনে যতদিন বিকাশের বিভিন্ন ক্রম থাকবে ততদিন এ কল্পনা পরিকল্পনার সব কিছুকে ছাপিয়ে শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষকের উপস্থিতির প্রয়োজনবোধ থেকেই যাবে এমন মত শিক্ষাবিজ্ঞানীরা পোষণ করেন। যদি এই মত টিকে থাকে তাহলে শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তাধারা বার বার এসে সেই মতকে অন্তর্নিহিতি জোগাবে। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশের মনন স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার প্রভাবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ ক'রে নিয়েছে। সেই বরণের একটি দীপ জর্জ

১ George Oswell : "*Nineteen Eighty*".

হার্বার্ট পামারের আদর্শ শিক্ষক সম্বন্ধীয় সূত্রচতুষ্টয়ে শিখাময়ী হয়ে উঠেছে।[১] ছাত্রের স্তরে নেমে এসে, জ্ঞানবান, জীবন্ত চেতনার সঞ্চারে সক্ষম ও বিশ্বাসবান শিক্ষকের কথাই তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানের সূত্রধারদের কাছে তুলে ধরেছেন। এই আদর্শে শিক্ষক ছাত্রকে উজাড় ক'রে দিয়ে কাজ সাঙ্গ করেন। শ্রীঠাকুর তো স্বামীজিকে সেরা শিক্ষা দিয়ে বলতে পেরেছিলেন—তোকে সব দিয়ে আজ আমি ফকির হলাম।

শিক্ষাবীর স্বামী বিবেকানন্দও কর্মচক্র সাঙ্গ ক'রে, সব উজাড় ক'রে নিজের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা মুছে দিতে চেয়েছিলেন। জো-কে চিঠিতে তাই স্বামীজির এ ভাবটি স্পষ্ট :

ঐ বালক ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের আরোপিত একটা উপাধি মাত্র।

এই তো জাতশিক্ষক!

এই জাত শিক্ষকের এক পড়ুয়া লিখেছেন :

স্বামীজি অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গ-রস চলিতেছে, বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিত—উহার ভিতর এত শক্তি!

মহাভারতকার পণ্ডিতের এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—স্বামীজির সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য :

১ "First, a teacher must have an aptitude for vicariousness; and second, an already accumulated wealth; and third, an ability to invigerate life through knowledge; and fourth, a readiness to be forgotten."

—George Herbart Palmer : *Ideal Teachers.*

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথঃ উহবান প্রতিভানবান
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥

আত্মার সম্পদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ব্রহ্মচর্যব্রত অনুসরণের মধ্য দিয়ে। স্বামীজি বার বার ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীর পরে শিক্ষার ভার দিতে চেয়েছেন। শিক্ষাব্রতীদের বলেছেন—ব্রহ্মচর্য, সংযম, ত্যাগ অনুশীলন কর। নিজে এর সুফল পেয়েছেন। নিজ গুরুর কাছে শিখেছেন। ভারতের শিক্ষাচিন্তার এই মহামূল্য সম্পদ্ সযত্নে রক্ষা ক'রে তিনি শিক্ষাদর্শের মূল্যবোধ বাড়িয়েছেন। স্বামীজির শিক্ষাচিন্তায় এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শিক্ষাদর্শগত পুস্তকে ভারতের এই বিশেষ বাণীর কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামীজি বলেছিলেন জগৎকে ভারতীয় জীবনাদর্শ শিক্ষা দেবে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে, ভগিনী নিবেদিতা তারই অনুরণন তুললেন—পৃথিবীর শিক্ষার্থীর আদর্শ সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান ছাত্রদের ধর্ম—ব্রহ্মচর্যব্রতানুশীলন।[১]

ব্রহ্মচর্যবান শিক্ষক, ব্রহ্মচর্যব্রতী শিক্ষার্থী যখন মুখোমুখী বসেন তখন জগতে না-জানার মত কিছু থাকে না। আপন উপলব্ধির সমগ্রতা সর্বাত্মকভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করতে পারেন—ছেদ থাকে না।[২] বিদ্যালাভের দুশ্চর তপস্যায় বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তরেন্দ্রিয় সংযত রেখে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতে হয়।[৩]

১ "No country in the world has an ideal of the students' life so high as this and if it be allowed to die out of India where shall the world look to restore it. In Brahmacharya is the secret of all strength, all greatness."

—Sister Nivedita : *Civic and National Ideals*, p. 60.

২ আচার্য পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যাসন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্।

—তৈত্তিরীয় ১।৩।৩

৩ তপশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ।

—তৈত্তিরীয় ১।৯

সমগ্রভাবে দানের কথাই বিধাতা মানুষকে বলেছিলেন—"ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আথেত্যোমিতি হোবা চ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।" এই দান করার শিক্ষাকে সমগ্র জীবন দিয়ে প্রতিফলন ক'রে স্বামীজি তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে শিক্ষাকর্মে পরিণত করেছিলেন।

বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার আহ্বানও তাঁকে গৌরবের শৃঙ্খলে বন্দী করতে পারেনি। চিরকালের সব দেশের শিক্ষার্থী সমাজের শিক্ষক হবার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন ক'রে অনাগত কালের শিক্ষক রচনার পথ কেটে দিয়ে গেছেন।

তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় এই নতুন শিক্ষার মাহাত্ম্যকে প্রতিফলিত করতে না পারলে পৃথিবীর কয়েক শত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার উপর আর একটি সংযোজন ঘটাবেন মাত্র—"বিবেকানন্দ" বলতে যে বিমূর্ত বিশ্ববিদ্যালয় মানবমনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে পারবে না এই চিন্তা বার বার এসে আমাদের মনকে আন্দোলিত করছে।

॥ স্বামীজির শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষত্ব ॥

শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। মানবমন চিন্তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধির স্বাদ যখন থেকে পেতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই রীতি খুঁজে, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ আশ্রয় ক'রে সে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। এই ব্যাকুলতা যেখানে ঊর্ধ্বগতি পেয়েছে সেখানে মানুষ সেরা ফসল ফলিয়েছে—যেখানে স্বার্থবুদ্ধি—নিম্নগতি প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই অত্যাচার প্রবল হয়েছে—শিক্ষা সম্মোহন, অভিচার হয়ে ভীতির আর বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করেছে। তাই মানব-ইতিহাসের পাতায় তুকতাক

শিক্ষার শিক্ষাতত্ত্বও আছে—অধ্যাত্মমুক্তি শিক্ষার মহান্ তত্ত্বও আছে আর এক সীমান্তে।

মানবজীবনের যত দিক্ আছে—প্রান্ত প্রত্যন্ত আছে, সব কিছুর পরিবর্তনসাপেক্ষতাও আছে। শিক্ষাতত্ত্ব এই পরিবর্তনের তত্ত্ব।

অংশ বা প্রকরণভেদে মানুষের শরীর একটি দিক্, তার মন, আচরণ, জীবিকা, পারিবারিক জীবন, সংস্কৃতি, নৃত্য, গীত, বহু দিক্ আছে। এক একটি দিক্ আশ্রয় ক'রে, মানুষের শক্তির এক এক রূপান্তরকে কাম্য বলে গণনা ক'রে শিক্ষার প্রচেষ্টা চলে আসছে। স্পার্টাবাসীরা চেয়েছেন দৈহিক গড়নের ও প্রতিরোধ বৃদ্ধির শিক্ষা—আজও সমুদ্রসন্ধানী, মরু অভিযাত্রী, হিমাদ্রী শিখরযাত্রী মানুষদের দৈহিক গড়নের ও প্রতিরোধ বৃদ্ধির শিক্ষা প্রচলিত রয়ে গেছে।

শিক্ষাতত্ত্ব এই বিরাট ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা করার অধিকারী।

শুধু মাত্র তা নয়, দেশ ভেদে, কাল ভেদে, সভ্যতা ভেদে প্রত্যেকটি অংশ বিচিত্ররূপে পরিবর্তিত হতে পারে। দেহ-সৌষ্ঠব অনুশীলন স্পার্টায় যা ছিল, গ্রীসের অন্যত্র তা ছিল না। প্লেটো বলতেন আর্থেনীয় গ্রীকরা যা কিছু বিদেশীদের কাছ থেকে নেয় তাকে সুন্দরতর ক'রে নেয়।[১] এ কারণে প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে নিজ বিশেষত্বর মূল ভিত্তির যথাযথ নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবেতর জীবগোষ্ঠীর জীবন থেকে শিক্ষাতত্ত্ব-বিদ্‌রা জানতে পেরেছেন যে ক্রমবিকাশের পথে তারাই এগোতে পারে যারা এই বিশেষত্বর শক্তি রক্ষা করতে পারে। নীড় বাঁধার বিশেষত্ব পাখীকে জুগিয়েছে জীবন-যুদ্ধে টিঁকে থাকার শক্তি—পরিবার বাঁধার বিশেষত্ব স্তন্যপায়ী জীবদের রক্ষা করেছে। সুতরাং সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করার বিশেষত্ব খুঁজে বার করা

১ "Whatever Greeks receive from the foreigners, they in the end make more beautiful."

এবং খণ্ড খণ্ড মানবতার জীবন পূরণ ও বিকাশের আরও বিশেষ বিশেষত্ব রক্ষা করা মানব চিন্তায় অগ্রাধিকার পেয়েছে।

এর বিপুল জটিল তাৎপর্য বোঝার দায়িত্বও শিক্ষাতত্ত্বের।

শিক্ষাতত্ত্বের এ অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করেই মানব-সমাজ প্রথমে ধর্ম তারপর যুদ্ধ তারপর বাণিজ্য-ব্যবসা এবং সর্বশেষে শিল্প ও শ্রমজ কর্মচক্রের প্রবর্তন অনুবর্তনের সময়ে শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার সংগঠন, উপকরণ স্থির করার জন্য বিশেষ চিন্তা করেছে। বিশেষভাবে একাজ করার জন্য "শিক্ষক" বলে চিহ্নিতও করেছে বিশেষ গুণ ও প্রবণতা-সম্পন্নদের।

এই ভাবে এসেছে ব্রাহ্মণ অধ্যাত্ম শিক্ষার অধিকার নিয়ে। তারপর এসেছে ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য। এখন শূদ্র। অদ্ভুত এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে :

> একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
> দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

প্রাধান্য হারাচ্ছে কিন্তু লোপ পাচ্ছে না, রূপ হারাচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না কোন বিশেষত্ব।

এ জটিলতার রহস্য বুঝে মানবতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখাও শিক্ষাতত্ত্বের কাজ।

সুতরাং শিক্ষাতত্ত্ব ভারসাম্য না হারিয়ে আপন কেন্দ্রীয় সত্য-বোধে প্রতিষ্ঠিত হলে সেইটি হবে মানবতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার নিশ্চিত উপায়। কিন্তু তা বুঝি সহজে হবার নয়।

তাই যখন ব্রাহ্মণ্য স্বভাব মানবতাকে শাসন করতে চায় শান্তি প্রেম করুণার ভাব এসে জগৎকে স্নিগ্ধ করে তখন সেই ব্রাহ্মণের—সক্রেটিশ, যীশু, গান্ধী রূপটির মৃত্যু ঘটে ক্ষাত্রধর্মী

মানুষের হাতে; কিংবা হয়তো ব্রাহ্মণ নিজেই তপস্যাচ্যুত হয়ে নিজের অপমৃত্যু ঘটান। বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যজ্ঞভোগী হয়ে পড়েন, যীশুভক্ত ব্রাহ্মণ কনফেসন-এর জন্য কাঞ্চন কামনা করেন—চার্চ থেকে বের করে দেন সরল মানুষদের, কোরানভক্ত মুতাজিলাবাদীদের মান্যতা দিতে পারেন না। আবার বিপরীত চক্রগতিও সৃষ্ট হয়—নূতন তপস্যা নিয়ে জন্মান প্লেটো, টমাস একুইনাস, বুদ্ধ। এমন কি জন্ম নেন অশোক, হর্ষবর্ধন।

এ রহস্য ভেদ করা কঠিন। সাধারণ গুণাধিকারীর পক্ষে এ রহস্যভেদ বোধ হয় প্রয়োজনও নয়।

ভারতবর্ষের শিক্ষাচিন্তা একে আশ্রয় ক'রে আবর্তিত হয়েছে। কারুকে বলেছে উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো, মধ্যমকে বলেছে ধ্যান কর, অধমকে বলেছে স্তুতি পূজার কথা, অধমের অধমকে বলেছে—বহিঃপূজাই করলে চলবে।

আবার কারুকে জ্ঞান আশ্রয় করতে বলেছেন—অন্যকে ভক্তি-পথ ধরে চলতে বলেছেন। কারুকে বলেছেন কর্মচক্রে—কারুকে যোগসাধনে চলার কথা বলেছেন।

সর্বসাধারণের কাছে এই বিশ্ব-রহস্যর চাবিকাঠি তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। জীবন কি তা বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, ক্রম-বিকাশের পথে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে স্বরূপের প্রকাশই জীবন। আর এই স্বরূপ অনুযায়ী সংস্কারসমূহ অর্জন করাই শিক্ষা। অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ তাহলেই ঘটবে।

এই তত্ত্বকে ইতিহাসের আলোয় আরও উজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর আগের রামমোহনও ছিলেন ভারত-পথিক —কিন্তু তিনি বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ণের যাত্রায় ভারতবর্ষকে আপন বিশেষত্ব সংকুচিত ক'রে শিল্পময় বিশ্বের যাত্রাপথের উপযুক্ত সঙ্গী করার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। বৈশ্য-আশ্রিত তীক্ষ্ণধী এই

ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত মাহাত্মাকে যথাযথভাবে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন কি না তা সমাজ-তত্ত্বের গবেষণার সামগ্রী হয়ে আছে—শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে তিনি ভারতপ্রাণকে আপন প্রাণ-ধর্মের শক্তিসান্নিধ্যহারা করেছিলেন। স্বামীজির পরের ভারত-পথিক মহাত্মা গান্ধীও ভারতবর্ষের বিকাশকে শিল্পায়ণের পট-ভূমিকায় বিচার ক'রে ভারতবর্ষকে স্বধর্মচ্যুত করেছেন। এই মহাত্মা বৈশ্য নৈতিকতায় শিল্পের বিরোধ এড়াবার পথে ভারত-বর্ষকে নিতে চেয়েছেন—বৃহৎ শিল্পের আকর্ষণ সে নৈতিকতার মাহাত্ম্য ধুলায় লুটিয়ে সেই ধুলায় মহাত্মার পূতঃ রক্তধারা সিঞ্চন করেছে মাত্র।

ঈশ্বরবিশ্বাসে দৃঢ়, অধ্যাত্ম শক্তিতে অবিচলিত আস্থাশীল স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাতত্ত্ব সম্পূর্ণতঃ মহাত্মা রামমোহন এবং মাহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাতত্ত্ব থেকে পৃথক্ কি না তার বিশ্লেষণ উচ্চতর তত্ত্বের প্রসঙ্গ। তবে মৌলিক পার্থক্যগুলি লক্ষ্যণীয়। The first modern man of India—রাজা রামমোহন রায়। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর আস্থা গভীর। তার ফলে তিনি ভারতে আধুনিক সভ্যতা কি হবে এই তত্ত্বে সমস্ত মনন ও প্রচেষ্টা দান করেছেন। এই আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিভূমি তাঁর মতে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রসমূহ। পক্ষান্তরে স্বামীজি আধুনিক বিশ্বসভ্যতায় ভারত কি করবে এই তত্ত্বে তাঁর সমগ্র সাধনা সমর্পণ করেছেন। আধুনিক বিশ্বসভ্যতার কোন নিজ বাসভূমি নেই। তাই তিনি সাম্যবাদের ভাবনা থেকে, অধ্যাত্ম ভাবনা থেকে, বিজ্ঞান ভাবনা থেকে অকুণ্ঠভাবে ভাব সংগ্রহ করেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে কোন বন্ধ্যা ভাবনা নেই—কোন পঙ্গু গোঁড়ামী নেই—আবার প্রত্যয়-হীন নির্ভরতাও নেই। গণতন্ত্রের রঙচঙে পোশাকটি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃজনীশক্তির ক্ষেত্র রচনা

করতে চেয়েছেন গ্রামে গ্রামে দরিদ্র সাধারণের চিত্তভূমিতে ; ছিঁড়ে ফেলেছেন ধনি-নির্ভরতার বারবনিতাসুলভ মনোভাবকে।

The father of the nation—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ছেলেদের চিনতে পারেননি। তাঁর হিন্দু ছেলেরা বিশ্বাস করে না ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম ; তাঁর মুসলমান ছেলেরা মানে না—সবকো সম্মতি দে ভগবান। তাঁর ধনী ছেলেরা বিশ্বাস করে না—ভবসমুদ্র সুখদ নাও একহি রামনাম। তাঁর বিত্তহীন ছেলেরা চরকা কাটে, গ্রামে গ্রামে ঘোরে, চোখের জলে গায়—নিরাধার কো আধার এক নিত্য রামনাম। তাঁর ব্রাহ্মণ ছেলে বিন্নার সঙ্গে তাঁর রাজা ছেলের মাঝে মাঝে দেখা হয়—কথাবার্তাও হয়, পুরানো দিনের স্মৃতির রোমন্থনও হয়—কিন্তু চাষা ছেলে, মজুর ছেলে, ভদ্রলোক ছেলেদের এক সঙ্গে রেখে পরিবারের শ্রী ছাঁদ ফেরানোর কথা বোধ হয় হয় না। হলেও বোধ হয় কোন দিন "ভাগের বাবা রাম"কে পাবেন না। পক্ষান্তরে স্বামীজি পিতা রামকৃষ্ণর উত্তরাধিকার বিলিয়ে দিয়েছেন সমগ্র ভারতকে—আর শিখিয়ে গেছেন কালে এ ধত্নঃরত্ন দিতে হবে সমগ্র পৃথিবীতে। যারা এসেছে –যারা আছে শুধু তাদের নয়—যারা আসেনি যারা আসবে অনাগত কালের সমগ্র মানবতাকে এই বোধের স্বর্ণসম্ভার দিতে হবে—তুমি অমৃতের পুত্র। তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। যে ভাবে যেখানে যে অবস্থায় আছ সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। যাত্রাপথে পিছিয়ে আছে যারা তাদের ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

স্বামীজির শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষত্ব বিচারের সূত্র এবারে বোধ হয় উপস্থাপন করার সময় এসেছে।

কে আসে? মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান? পৌত্তলিক? ব্রাত্য? মুসলমান তুমি দাও তোমার ইসলামিয় সংহতি। হিন্দু—

তোমার বেদান্ত তত্ত্ব। খৃষ্টান তুমি ধনৈশ্বর্যের সঙ্গে খৃষ্টকে জড়িয়ে আছ কেন—আরও খাঁটি খৃষ্টান হও।

পৌত্তলিক—তুমি যে স্তরে আছ সেই স্তরের কাজটি তুচ্ছ নয়। মাটিতে থেকে তুমি ঊর্ধ্বগতি লাভ কর।

চণ্ডাল, পারিয়া—তুমি বল তুমি শিব। ছিলম ভর দো!

তুমি প্রাচ্যবাসী!

"পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর। নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার কর।"[১]

নিজের কথা ভুলবে না।

"দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এইটি হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি।

"বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হালচাল বদলে দিচ্ছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না।"

তুমি কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ বই পড়?

"ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাহাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।"

তুমি রাজেন্দ্রলাল আচার্য!

—অনুবাদ কর জুলে ভার্ণের কিশোর গ্রন্থ!

তুমি নিবেদিতা!

লেখো *Cradle Tales of Hinduism.*

"ভারতের জন্য বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে।

১ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ

…তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা প্রয়োজন, তা নেই। তাকে জাগাও, তাকে জ্বালাও।"

তুমি প্রতীচ্যবাসিনী ভগিনী?

"চিকাগোয় পাওয়া যায় না এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে।

আমার এখন পকেটভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে—কখনও মনে করো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই। পৃথিবীতে একটি জিনিসই আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।

—তোমার স্নেহময় ভাই"[১]

কে শিল্পী?

"বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি ও ব্যষ্টিজীবনকে শিল্প-আশ্রয়ী হতে হবে। আর সেই দিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।"

"ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র।"

শিল্পের বাস্তবতাবোধ সম্পর্কে তাঁর মতামত শিল্প-শিক্ষার তথা শিক্ষায় শিল্পের স্থান সম্বন্ধে প্রশ্নকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। মতটি হল:

"একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যের প্রকাশ) করা চাই। নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো

১ স্বামীজির পত্র শ্রীইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে—১লা মে, ১৮৯৪

ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama লেখা, একই কথা।[১]

অন্যত্র স্বামীজির চিন্তা :

"ঠিক, ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে এশিয়াটিক। আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ।

"কি জানিস। সাহেবদের utility আমাদের art. ওদের সমস্ত দ্রব্যই utility, আমাদের সর্বত্র art. এখন চাই art এবং utilityর combination."

মুক্তমহেশ্বরের ছন্দে সমগ্র শিক্ষাঙ্গন কাঁপছে এমন বোধ জাগে স্বামীজির সর্বত্রসঞ্চারী পদক্ষেপে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব এসে শিক্ষাচিন্তাকে অধিকার করেছে—তার ফলে পঠন, শ্রবণ থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাস্থ্য—আবেগজীবন, বয়ঃসন্ধি এসবের খুঁটিনাটি এসে শিক্ষাতত্ত্বকে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শিক্ষাতত্ত্ব—শিক্ষাচিন্তা মনোস্তত্ত্বর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখছে। আপত্তি জানাচ্ছে আবার নূতন বোঝাপড়া করছে।

স্বামীজি 'রাজযোগে' বলেছেন :

"শরীরের তিনটি ভাগ—বক্ষ, মস্তক ও গ্রীবাকে সর্বদা ঠিক ঋজুভাবে রেখে বসবে। নির্দিষ্ট মাপে নিঃশ্বাস নিয়ে তা নির্দিষ্ট মাপে

১ স্বামীজির বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৪

২ জাপানী শিল্প-প্রসঙ্গ ; উৎস : [১৪৬]

ত্যাগ কর। দেখবে এতে শরীরের অসামঞ্জস্য দূর হবে। মুখের জড়তা যাবে, মনের অপ্রফুল্লতা কাটবে। গলার কর্কশতা ঘুচে যাবে।[১]

পাশ্চাত্ত্য শারীর-বিজ্ঞান আজ এর গুরুত্ব বিচার করতে পেরেছে —শিক্ষাতত্ত্বে এর সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে—জীবনে নেমে আসেনি।[২]

পঠন-সম্বন্ধে স্বামীজির আলোচনা বিচার করা যাক। তিনি মনের সমুদয় শক্তির সাহায্যে অনুভব ও জ্ঞানলাভের তত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বভাবতঃই "পঠন"ও তাঁর সামনে সেই শক্তির একটি উদাহরণ ঃ

"বালক যখন পড়ে সে এক একটি অক্ষর তুইবার তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটি উচ্চারণ করে, এ সময়ে তাহার দৃষ্টি এক একটি অক্ষরের উপরে থাকে। কিন্তু যখন আরও বেশী শিক্ষা করে. তখন আর অক্ষরের উপর নজর না পড়িয়া এক একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না করিয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি হয় ; যখন আরও অগ্রসর হয় তখন একেবারে এক একটি sentence (বাক্য)এর উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি করে ; এই উপলব্ধি আরও বাড়াইয়া দিলে একটি পৃষ্ঠার উপলব্ধি হয়। কেবল মনঃসংযম—সাধনা।"

থোরো এই মনঃসংযমকে বলেছেন—আমাদের উচ্চতর বৃত্তির নিদ্রালু তন্দ্রমগ্ন বিলাস নয়, আমাদের শ্রেষ্ঠ জাগরণময় অস্তিত্ব।[৩] থোরো প্রাচ্য-প্রভাবিত। পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য চেতনার কাছেও

১ সন্ন্যাসীনী বৃন্দা, 'বিবেকযোগ' পৃঃ ১১৫

২ "It is of interest to everyone that better mental work is done when the body is sitting upright to a table because in the upright position the big blood-vessels of the trunk can convey blood about the body and to the brain more freely".

—M.B. Davies : "*Hygiene and Health Education for Training Colleges*", 1959.

৩ 'not that lulls us a luxury and suffers the nobler faculties to sleep the while, but what we have to stand on tip-toe to read and devote our most alert and weakful hours to.' —H. David Thorean : "*Walden*".

গভীরতর ভাবতরঙ্গজাত উপলব্ধির কথা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।[১] মনঃসংযম ও পাঠগতির জন্য পাশ্চাত্ত্যদেশে পঠন-সংশোধন ও পঠন-সহায়ক কর্মসূচীর ব্যাপক প্রচলন সুরু হয়ে গেছে। সত্তর বৎসর আগে স্বামীজির "পঠন পদ্ধতির" বক্তব্য যে ভাবে দ্রুত-পঠন ও পঠন-উপলব্ধির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিচার করেছিল তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক পঠন-নির্দেশনা, পঠন-সহায়তা[২] কর্মসূচীর কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে। আমেরিকায় একদিন আধ ঘণ্টায় বৃহৎ আকারের গ্রন্থ পাঠ ক'রে এবং তার মূল প্রসঙ্গগুলির পুনরালোচনা ক'রে[৩] স্বামীজি পাশ্চাত্ত্য মনকে বিস্মিত করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিজ্ঞানে সে বিস্ময়কর প্রশ্নের উত্তর ধীরে ধীরে মিলছে।

চিন্তার পদ্ধতি এবং তার জটিলতার একটি কথা 'রাজযোগে' স্বামীজি লিখেছিলেন। বস্তুতঃ চিন্তা করা এবং জানা ও হয়ে ওঠা নিয়ে গ্রীক মনীষা একটি ধারণার মুখোমুখী হবার চেষ্টাও করেছিল।[৪]

স্বামীজির এ প্রসঙ্গে কথাটি 'জ্ঞানযোগে' অন্যভাবে আছে:

যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে তাহারই কতকগুলি আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি বলে।

স্বামী শুদ্ধানন্দ দীর্ঘদিন ধরিয়া স্বামীজির উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্রাদি স্পষ্ট শুনতে পেতেন।[৫] মদীয় গুরুদেব-উচ্চারিত

১ ...'her eye, her ear, were tuning forks, burning glasses which caught the minutest refraction or echo of a thought or feeling... She heard a deeper vibration, a kind of composite echo...of all that the writer said, and did not say". —Stephen Jennaut '*Willa cather on writing*'.

২ Reading guidance : remedial reading and reading improvement. 345 Hudson Street, New York 14. N. Y.

৩ অশোক সেন, সোনার বাংলা "আরও বেশী পড়ুন"

৪ Knowledge is virtue.

৫ "স্বামীজী সন্নিধানে", উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬০

"সারদে শিবে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রক্ষ মাম্" স্তোত্রটি বর্তমান লেখক বহু দূরে থেকেও শুনতে পান। আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাগুলি অলৌকিক মনে হতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কানাডায় স্নায়ুতাত্ত্বিক গবেষণাগারে বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্রোডের সাহায্যে মস্তিকের কোন কোন অংশে আঘাত দিয়ে একজনকে তার বাল্যকালের শোনা বহু গান পুনরায় শোনানো সম্ভবপর হয়েছে; আর একজনকে তার ভুলে যাওয়া কাহিনী শোনানো গেছে।[১]

স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার বহু অমূল্য সূত্র নিয়ে কার্যকরী গবেষণা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাঁর চিন্তার সূত্রগুলি জানানো গেলে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের তথা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত বিচারের বিবেকগত ভিত্তি ও লক্ষ্যের বৃহত্তর অনুপ্রেরণা পেতে পারেন এবং শিক্ষাবিজ্ঞানকে জড় থেকে চেতনের পর্যায়ে উন্নীত করার কল্যাণকর ভূমিকায় দায়িত্বশীল অংশ নিতে পারেন, এমন আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

জড় জগতের উপর অধিকার অর্জনের পথে বিজ্ঞান এগিয়েছে—চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির পথে এগিয়েছে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—এ দুই যুক্ত হলেই মানুষ দেবত্বে পৌঁছবে—এ শিক্ষার কথা তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল বাণী এই।[২] কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই, জাড্য নেই—আছে অসীম প্রত্যয় শিক্ষার বিপুল সম্ভাবনায়,

১ Report on Neurological Laboratory, Montreal, of Researches by Dr. Wilder Penfield—"one brain area...contains the full record of an individual's stream of consciousness—that the person has even been aware of...most of it promptly lost to voluntary recall. Stimulated at a point in this area with an electrode, one patient heard a forgotten song, another re-lived a forgotten experience of childhood."

Quoted in "*Two decades of Medical Progress Pt. I*" p. 30-31.

২ "My ideal can be put into a few words only—to preach unto mankind their divinities and how to manifest it in every moment of life."

নিশ্চিত সার্থকতায়—শুধু ব্রহ্মবোধ আর জগৎবুদ্ধি এক সূত্রে গাঁথা হোক।[১]

কি উপায়ে স্বামীজি পেয়েছিলেন এই জীবন্ত তত্ত্বের অধিকার—কোন্ প্রত্যয়ে তিনি জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার সকল মণিমঞ্জুষা তা জানতে গেলে তাঁর চিন্তার অনুসরণ করতে হবে। তাঁর চিন্তন প্রক্রিয়া, তাঁর চিন্তার প্রসঙ্গ, তাঁর চিন্তার লক্ষ্য কোনটিই কোন বাধ্যতামূলক নির্দেশ অনুসরণ ক'রে গড়ে ওঠেনি। তিনি প্লেটোর বার্তা[২] জানবার পূর্বেই স্থির করেছিলেন—গড়ুড়ের মত জিজ্ঞাসা তাঁর মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে—বিধিনিষেধের বন্ধনীতে একে একে তিনি আটকে দেবেন না। তাঁর মতে :

"সংবাদ-সংগ্রহ শিক্ষা নয়।

আমার মতে মনের একাগ্রতা সাধনই শিক্ষার সার কথা; তথ্য-সংগ্রহ নহে। যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়—আমি আগেই তথ্যসমূহ পাঠ করিব না। আমি তখন মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি করিয়া উক্ত নিখুঁত যন্ত্রসাহায্যে ইচ্ছামত তথ্যরাজি সংগ্রহ করিব।"

এক সূত্রে তিনি শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার লক্ষ্য তথা পদ্ধতিকে গেঁথে দিলেন।

প্রয়োগবাদীদের মতে সত্য তাই যা প্রয়োগ-সিদ্ধ। একারণে শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সংগ্রহে স্বাধীনতার শক্তিতে তাঁরা বিশ্বাসী। স্বভাবতঃই শিক্ষা সংগঠনে এ এক নূতন প্রয়াস—বিশেষতঃ পাঠ্য বিষয়ের বিন্যাসে এ প্রয়াস পুরাতন শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেছে,

১ "Put the chemicals together, the action will take care of itself."

২ "Bodily exercise, when compulsory, does no harm to the body; but knowledge which is acquired under compulsion attains no hold on the mind".
—Plato in "*Republic*"

একারণে এর নূতনত্ব আরও বেশী। কিন্তু ছাত্রদের মনের গড়ন এতে গঠনমূলক অভিব্যক্তি পায়—তাই প্রাচীনপন্থীদের এ নিয়ে উদ্বেগের সীমা নেই।[১] স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়োগবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র পদ্ধতিতে নয়, একমাত্র উপাদান সংগ্রহেও নয়—চিন্তার লক্ষ্যেও বিস্তৃত করেছেন। চিন্তারাজ্যের এক ব্যাপক মানচিত্রের কল্পনা তাঁর শিক্ষাচিন্তার গভীরতাকে সমগ্র বিশ্বরহস্যের মর্মভেদের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেছে।[২] স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার বিশেষত্ব এ ভাবেই সকল শিক্ষাচিন্তা থেকে তাঁকে পৃথক্ করেছে।

১ "apparently disconnected projects comes as a shock to those who have grown up with logically rigorous, the value of the enthusiasm engendered by well-chosen project must not be overlooked."

—C. R. Mann : "*Carnegie Foundation for advancement of Education*" p. 62

২ 'the entire scheme of cosmic purpose with some vision of eternal'

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দ, সেই Cyclonic Monk, হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন এবং সেই ধর্মের মূল বাণী পাশ্চাত্ত্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিনদেশে প্রচার করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব ভারতের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনে অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করেছিল। এই ধর্মবিপ্লবীর জীবনই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন। অথচ এই সন্ন্যাসী বিশুষ্ক জ্ঞানের সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন হৃদয়বান। এই সহৃদয় সন্ন্যাসী প্রকৃতি-সৌন্দর্যের প্রেমিক ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র ও ভাস্কর্যের। বর্তমান প্রবন্ধে স্বামীজির সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে এই কথা মনে রাখা দরকার, যদিও তিনি ভাষাসাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে, গভীর চিন্তার নিদর্শন রেখে গেছেন, কিন্তু সাহিত্য করার জন্য তিনি সাহিত্য করেননি। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে যেয়ে যেমন বিদ্যাসাগর সাহিত্যরচনা করেছিলেন, তেমনি নিজের মতামত প্রচারই ছিল স্বামীজির মুখ্য উদ্দেশ্য, সাহিত্যরচনা ছিল গৌণ। তথাপি তাঁর রচনাবলী সাহিত্যগুণে যে ভূষিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' নামক গদ্যগ্রন্থ, তাঁর পত্রাবলী ও তাঁর মুষ্টিমেয় কবিতার সাহিত্যিক মূল্যবিচার ক্রমে ক্রমে আমরা করবো। সেই আলোচনায় অবতীর্ণ হবার ভূমিকা-স্বরূপ আমরা এখানে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যানুরাগের ও সাহিত্যচিন্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করবো। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর সাহিত্য উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করবে।

সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ যে কত গভীর ছিল, এবং সাহিত্য অধ্যয়ন যে কত ব্যাপক ছিল, তার মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়েছেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায়। সেই সাহিত্যানুরাগের পরিচয় তাঁর ভাষাতেই দেওয়া যেতে পারে। "বি. এ. পরীক্ষার সময় তাঁহার পঠিত কোরিওলেনাম এবং মিল্টন, বাইরন, হ্যামিল্টন প্রভৃতির পুস্তকগুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজি কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন-আবৃত্তি-পদ্ধতি তাহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। সেক্স্‌পীয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন···। বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।···

"বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন।····বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, 'মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি জন্মেছিল।' দিনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি তামাসার কথা হলেই তিনি 'সধবার একাদশী'র কোন বোল্‌ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। 'নীলদর্পণ' হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।···· সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা 'সুদর্শন-সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত।····কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল।···ললিত-বিস্তরখানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল।"

সারদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে সারদানন্দের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ আছে। এই সাক্ষাৎকালে সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে। সকল প্রকার ভাব প্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা, এই প্রশ্নের আলোচনায় যুবক নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, "সু বা কু যে-কোন প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোনপ্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাদর্শের সাহিত্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপন-পক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন চসর হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের পুস্তক-সকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

একটি জীবনী থেকে জানতে পারি যে, "Poetry, because it is the language of ideals, made a stong appeal to Naren. Wordsworth was to him the fixed star of the poetic firmament." প্রকৃতপ্রস্তাবে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে সেতুবন্ধও রচনা করেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে একদিন অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি-সাহেব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের *Excursion* কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকৃতি-সৌন্দর্যধ্যানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধ্যানতন্ময়তা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এমন ধ্যানতন্ময়তার দৃষ্টান্ত মাত্র একজনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। ছাত্রদের হেস্টিসাহেব আরো বললেন যে, তারা নিজেরা যেয়েও দেখতে পারে সেই ব্যাপার। কৌতূহলী সত্যানুসন্ধানী নরেন্দ্রনাথ হেস্টিসাহেবের কথা শোনার পরই দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণকে দেখতে যান। সেই প্রথম যোগাযোগ।

স্বামীজির উপাস্য মৃত্যুরূপা কালীর আবির্ভাব তমসার মধ্য থেকে এবং ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার বিবেকানন্দের কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার অনেক প্রমাণ তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। তিনি একটি বক্তৃতায় কবিতার ভাষা সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনটি বিখ্যাত অন্ধকার-বর্ণনা পাশাপাশি উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, কবিগণ সাধারণত প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে অন্তরানুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। উদাহরণ তিনটি এই—

(১) বেদের 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে',

(২) কালিদাসের 'সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ',

(৩) মিল্টনের 'No light but rather darkness visible'.

কিন্তু কবিদের এই প্রথাকে বিবেকানন্দ সমর্থন করতে পারেন-নি। প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের এই ভাব প্রকাশকে স্বামীজি অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। তিনি চেয়েছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব নয়। কেননা কবিতা পরোক্ষতার ভিত্তিতেই শিল্প। প্রত্যক্ষ ভাষণে কবিতা ভাষণ-প্রধান, বক্তব্য-প্রধান হয়ে কবিত্ব হারায়। কবিতায় বস্তুজগতের সঙ্গে মনোজগতের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অন্তরজগতের প্রকাশ সম্ভব।

অনুপ্রাণিত ভাষণ বিবেকানন্দের মতে কবিতা। তাই তিনি বলেছেন—"উপনিষদের মত অপূর্ব কাব্য জগতে আর নেই। বেদের সংহিতাভাগেও লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় পাই। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদসংহিতার নারদীয়সূক্ত অংশটি আলোচনা কর। এখানেই প্রলয়ের গভীর অন্ধকার বর্ণনায় সেই শ্লোকটি আছে—'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'—ইত্যাদি। 'যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল'—এ অংশটি পড়লেই গাম্ভীর্যময় কবিত্বের অনুভূতি জাগে।" উপনিষদকে মহৎ কবিতা বলার

দুটি কারণ জ্ঞানযোগের এই অংশের মধ্যেই তিনি বিবৃত করেছেন। প্রথমত, 'কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়',—অর্থাৎ উপনিষদ্ কবিতা, কারণ উপনিষদের মধ্য দিয়ে অলৌকিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ স্বামীজির মতে, যে বাণী দিব্য সত্যকে প্রকাশ করে তাই কবিতা। উপনিষদের মন্ত্রগুলি কবিতা, তার দ্বিতীয় কারণ, "আমাদের চোখের সামনে ভূমার ভাব ও ছবি তুলে ধরাই উপনিষদসমূহের উদ্দেশ্য।" অর্থাৎ মহৎ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের বিমূর্ত ভাবরাশিকে মূর্ত প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে বলেই উপনিষদ কবিতা। অর্থাৎ মহৎ ভাব হলেই কবিতা হবে না, ভাষা উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে সেই মহৎ ভাবকে মূর্ত প্রত্যক্ষ-প্রতিমায় রূপান্তরিত করা দরকার। তাই তিনি বলেন—

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

এই অপূর্ব চরণ দুইটির হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনতে শুনতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে, এমন কি মনের জগৎ থেকে দূরে অতি-দূরে এমন এক জগতে উপনীত হই, যে জগৎ সব সময় আমাদের একান্ত কাছেই রয়েছে, অথচ যা কোন কালেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয়।"

আগে যে তিনটি অন্ধকার বর্ণনার তুলনা করেছেন সেই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন যে শুধু বৈদিক সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর অন্য সাহিত্যেও প্রকৃতি-বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্তরানুভূতিতে প্রকাশ করা হয়। "প্রায় সর্বত্রই দেখবে, তার বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবকে রূপ দানের চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমার বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্ত্য-কবির কাব্য আলোচনা করা যাক—তাঁদের কাব্যে মাঝে মাঝে মহান্ ভাবব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণন-

চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা।”

বিবেকানন্দের সাহিত্যানুরাগের এবং পাঠের ব্যাপকতার আরো কয়েকটি উদাহরণ দিই। ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, যে তিনজন তাঁর পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়া ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মস্যিয় জুল্‌বোওয়া। জুল্‌বোওয়া ছিলেন একজন লেখক। তাঁর রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, “ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলার প্রভৃতি জর্মান মহাকবিদের ভিতর যে ভারতের বেদান্ত-ভাব প্রবেশ করচে সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভালো কবি মাত্রেই দেখচি বেদান্তী ··।”

দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সতীর্থ বন্ধু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব স্মৃতিচিত্র রেখে গেছেন। এই স্মৃতিচিত্রটি ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এই স্মৃতিচিত্রে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্যপ্রিয়তার চমৎকার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। পরম সত্যের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের বিবেকানন্দকে শেলীর কবিতার দিকে আকৃষ্ট করেন। শেলীর *Hymn to Intellectual Beauty* কবিতার ব্যক্তি-নিরপেক্ষ প্রেম এবং মানবজাতি সম্বন্ধীয় মহতী দিব্যোপলব্ধি যতটা স্বামীজিকে প্রভাবিত করেছিল, ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, যুক্তি-কণ্টকিত দার্শনিক বিচার ততোটা করেনি। ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মেনে নিলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে শেলীর কবিতার অতীন্দ্রিয়লোকে প্রবেশের পর থেকে জগৎ তাঁর কাছে আর প্রেমহীন নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র থাকলো না—সমগ্র জগৎসংসার এক অধ্যাত্ম ঐক্যসূত্রে বিধৃত হলো।

চিঠিপত্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় বিবেকানন্দ আর এক ধরনের

সাহিত্যপাঠে অনুরাগী ছিলেন। সেই রচনাগুলি ধর্মগ্রন্থ। অবশ্য ধর্মপ্রচারক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবেন এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে এমন সব ধর্মগ্রন্থের কথা বলছি যেগুলি রচনাগুণে এবং সর্বজনীনতায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে এবং ফলে, যারা ধর্মবিষয়ে উদাসীন এমন সব সাহিত্য-প্রেমিক পাঠকদেরও প্রিয়তা অর্জন করেছে। জনৈক অনুরাগীকে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী টমাস আকেম্পিস্-লিখিত *Imitation of Christ* নামক পুস্তকখানি পাঠিয়ে তিনি মন্তব্য করছেন—"পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এপ্রকার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থটির সাহিত্যিকগুণ নয়, আধ্যাত্মিক গুণই স্বামীজিকে আকর্ষণ করেছিল বেশী। কিন্তু ধর্মগ্রন্থেও সত্যকার সাহিত্যিকগুণকে তিনি অভিনন্দিত করতে জানতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীম বা মহেন্দ্র গুপ্তকে ঐ পুস্তকের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তিনি যে পত্র লিখেছেন সেই পত্রটিই তার প্রমাণ। এর মধ্যে যে মন্তব্য আছে তাতে বোঝা যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন সেই জীবনীই সার্থক, জীবনচরিতকার যাকে নিজের কল্পনায় অনুরঞ্জিত করেননি। এই পত্রের পুনশ্চ অংশে শ্রীম-কে প্রশস্তি করে যে ছত্র কয়টি লিখেছেন তার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মেলে। "সক্রেটিসের কথোপকথনগুলিতে যেন প্লেটোর কথাই সর্বত্র চোখে পড়ে; আপনার এই পুস্তিকায় আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন। নাটকীয় অংশগুলি সত্যই অপূর্ব।"

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে স্বামীজির মতামতের একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ স্বামীজির শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-বিরচিত পূর্ব ও উত্তর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ে বিবেকানন্দের কথোপকথনের মতামতের মন্তব্যাদির পরিচয় পাই। যদিও পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত স্বামীজির

বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল তথাপি এই গ্রন্থের মন্তব্য ও মতামতগুলিকে স্বামীজির প্রামাণ্য বাণী বলে গ্রহণ করা চলে। শিষ্য প্লেটো যেমন গুরু সক্রেটিসের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করে গেছেন উত্তরকালের জন্য, যেমন একেরমান্ মহাকবি গেটের কথোপকথন, বসওয়েল জনসনের মন্তব্যাদি এবং শ্রীম রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথামৃত লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি স্বামীজির গৃহীভক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অসাধারণ পরিশ্রমে এই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' রচনা করেছেন। উপরোক্ত খ্যাতনামাদের তুলনায় শরচ্চন্দ্রের সাহিত্যিক ক্ষমতার যতই ন্যূনতা থাক, তাঁর গ্রন্থটির প্রামাণিকতা-মূল্য নিতান্ত কম নয়।

কোন্ ধরনের কাব্য বা সাহিত্য স্বামীজি পছন্দ করতেন না, তার পরিচয় 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে কিছুটা পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য থেকে 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে' প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করে তার মধ্যে অনুরাগ-ব্যাকুলতার যে পরাকাষ্ঠা তা তিনি দেখিয়েছেন। রাধার ব্যাকুলতায় আত্মদর্শনের আকুলতা আবিষ্কার সত্ত্বেও গীতগোবিন্দের কাব্যগত দুর্বলতা বিবেকানন্দের চোখ এড়ায়নি। তিনি বলেছেন "জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of wordsএর দিকে বেশী নজর রেখেছেন।" ভারতচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্য, কলাকুশলতা সত্ত্বেও, ভারতচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতাও স্পষ্ট। একদিনের বিবরণ থেকে জানতে পারি, "প্রথম হইতে স্বামীজি ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে

না পড়ে, তাই করা উচিত'।" অন্যত্র তিনি বলেছেন 'নভেল-নাটক মেয়েদের ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়'। অর্থাৎ তাঁর মতে যে সাহিত্য চরিত্রগঠনে সাহায্য করে না, যে সাহিত্য ক্লীবতাকে প্রশ্রয় দেয়, ভাষার অতি মাধুর্য যেখানে ভাবকে আচ্ছন্ন করে, যে সাহিত্য রুচিবিগর্হিত, যার মধ্যে বলিষ্ঠতা, ওজস্বিতা ও আদর্শবাদের অভাব, সে সাহিত্য স্বামীজির মতে, অন্য বৃহত্তর গুণের উপস্থিতি সত্ত্বেও, সর্বৈব নিন্দনীয়।

অপরপক্ষে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য বিবেকানন্দের প্রিয়, তা উপলব্ধি করি যখন স্বামি-শিষ্য-সংবাদে মধুসূদনের সাহিত্য বিশেষত মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে তাঁকে আলোচনা করতে দেখি। ভারত-চন্দ্রের কাব্যের নিন্দার পরই তুলে নিয়েছেন তিনি মেঘনাদবধকাব্য—বুঝিয়ে দিয়েছেন কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য প্রেয়। মাইকেল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ঐ একটা অদ্ভুত genius তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইয়োরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।" শিষ্য যখন এই মাইকেল-প্রশস্তি শুনে মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়," তখন বিবেকানন্দ তার উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করেছেন: "তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ—লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মতো না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগলো। এই মেঘনাদবধকাব্য—যা তোদের বাংলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা ছুঁচোবধকাব্য লেখা হল। তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধকাব্য এখনো হিমাচলের মতো অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব critic-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে। মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা

সাধারণে কি বুঝবে ?" ভাষার সঙ্গে ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিবেকানন্দ যে জানতেন তা এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। গীতগোবিন্দে ভাবের সঙ্গে ভাষা মেলেনি, তাই ভাষা সেখানে jingling of words হয়ে গেছে, কিন্তু মেঘনাদবধকাব্যের সমুন্নত বিষয়ের সঙ্গে তার ওজস্বিনী ভাষার সার্থক সমন্বয় হয়েছে, তাই সে ভাষাকে বিবেকানন্দ শব্দাড়ম্বর বলতে প্রস্তুত নন। দ্বিতীয়ত, তিনি জানতেন পূর্বের সার্থক কাব্যের ক্রমান্বয় পুনরাবৃত্তি করা উত্তরসূরীর কাজ নয়, তার কাজ সাহিত্যধারাকে নবীন রাখা। সেই নবীনত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে নূতন ছন্দ ও নূতন রীতির প্রবর্তন করতে হয়, যারা পুরানো ভাবে অভ্যস্ত হয়ে যান তাঁরা এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হন অভ্যাসের দোষে, কিন্তু দোষ চালিয়ে দেন নবাগত সাহিত্যিকের শিরে। এর থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে বিবেকানন্দের সাহিত্যদৃষ্টি অভ্যাসের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েনি, তিনি শক্তিশালী নবীনকে অভ্যর্থনা করতে জানতেন। তাহা তিনি শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নয়, গিরিশ ছন্দকেও বন্দনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই যে জি. সি. (অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র) কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise করছে—দোষ ধরছে। জি. সি. কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে ? পরে লোকে ঐ সব বই appreciate করবে।" গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধু ছিলেন, এক গুরুর পদতলে তাঁরা সতীর্থ ছিলেন। এই উক্তিতে কিছু বন্ধুপ্রীতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন ছন্দকে অভার্থনা করতে পারার মত সাহিত্যদৃষ্টিও কিছু কম ছিল না।

তাঁর মতে মেঘনাদবধের কোন্ অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট তা তিনি বলে গেছেন। "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প—প্রতিহিংসা

ও ক্রোধানলে স্ত্রী পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের কাব্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, বিবেকানন্দ মেঘনাদবধকাব্যের বীররসের সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মধুসূদন চিঠিতে বলেছিলেন, 'I won't trouble my readers with Vira Rasa' কিন্তু কাব্যের আরম্ভে বলেছেন, 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'। কাব্যটি পাঠ করলে বোঝা যায় এই আপাত-বিরোধী উক্তির মধ্যে সত্যকার কোন বিরোধ নেই। প্রাচীন অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধঘনঘটাপূর্ণ অস্ত্রঝনৎকারে মুখর কোন বীররসাত্মক মহাকাব্য লেখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, আধুনিক অর্থে বীররসাত্মক মহাকাব্য লেখা। আধুনিক অর্থে সেই বীর, যে নিয়তি বিপক্ষ জেনেও, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও নিজ কর্তব্য থেকে বিচলিত হয় না; অস্ত্রবিদ্যা দিয়ে এই বীরত্ব নির্ণিত হয় না, এই বীরত্ব নির্ণিত হয় 'যা হবার হোগগে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক আর যাক'—এই মনোভাব অনুযায়ী কর্ম করে যাবার ক্ষমতার দ্বারা। বিবেকানন্দ মেঘনাদবধকাব্যের বীররসের এই বিশিষ্টতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাঁর মতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মানবতাবাদী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। মধুসূদন ছাড়া আর একজন সমসাময়িক কবির তিনি অনুরাগী ছিলেন—তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই কবির কাব্যের মননধর্মিতা ও গম্ভীর ছন্দ যে তাঁর আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল একথা অনুজ মহেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। গিরিশচন্দ্রের রচনার তিনি যে অনুরাগী বন্ধু ও পাঠক ছিলেন একথা আগেই বলেছি।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদে ভাষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তার পরিচয়

পাওয়া যায়। ভাববার কথা গ্রন্থে সংগৃহীত বাঙ্গালা ভাষা নামক ক্ষুদ্রকায় ও মূল্যবান প্রবন্ধটি আসলে একটি পত্র। এই পত্রটি বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকা থেকে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে লেখেন। এই প্রবন্ধে চলিত ভাষার স্বপক্ষে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন তা যে কয়েক বৎসর যাবৎ চিন্তার ফসল তা স্বামি-শিষ্য-সংবাদ পাঠ করলে জানা যায়। এই গ্রন্থের নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের বিবরণ পাঠ করলে দেখা যাবে বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগুলি অন্তত দুই বৎসর যাবৎ চিন্তার ফল। প্রথম দিনের কথোপকথনকালে বিবেকানন্দ বলছেন, "এর পর বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাংলা ভাষাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করবো।" স্বামীজি যে চেষ্টার প্রতিশ্রুতি এখানে দিয়েছেন সে প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে গড়ার চেষ্টায় তিনি যে সত্যই বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে আমরা পরে বিচার-বিশ্লেষণ করবো। এই উক্তির পর তিনি বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর প্রিয়কবি মধুসূদনও একদিন বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে নামধাতুর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দও এই দুর্বলতা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন, চিন্তা করেছিলেন বাক্যমধ্যে ক্রিয়াপদের তাৎপর্য বিষয়ে। "এখনকার বাংলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs use করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়....ভাষার ভেতর verb-গুলি ব্যবহারের মানে কী জানিস? ঐরূপে ভাবের pause দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন

ভাষার দাম নেই। সেইজন্যই বাংলা ভাষায় ভাল lecture দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না।" আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখবো যে, এই বাগ্মীজনোচিত ভাষাই বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। ক্রিয়াপদের এই দুর্মর দুর্বলতা দূর করার জন্যও তাঁর গ্রন্থসমূহের গদ্যে তিনি নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরো একদিন তাঁকে এই বিষয়ে আলোচনা করতে দেখি—"অধিকন্তু বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।" এই সব থেকে বোঝা যায় শুধু সাহিত্যরসের তিনি আগ্রহী আস্বাদনকারী ছিলেন না, উপরন্তু সাহিত্যের বাহন যে ভাষা তার ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ও চিন্তিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রীতির আরো একটি পরিচয় পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে—তাঁর সঙ্গীতপ্রীতির সাহায্যে। তিনি নিজে সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসতেন এবং অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যে শ্রেণীর সঙ্গীতের তিনি প্রেমিক ছিলেন সেই শ্রেণীর সঙ্গীতকে বলা যায় কাব্যসঙ্গীত, অর্থাৎ যে শ্রেণীর সঙ্গীতে সুর এবং কথার সমতুল্য মর্যাদা। এই শ্রেণীর সঙ্গীত, যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত, সাধারণত তাঁদের কাছেই প্রিয় হয় বেশী, যাঁরা কাব্যরসপিপাসু। কাব্যসঙ্গীত তাঁদের কাব্যরস ও সঙ্গীতরস-পিপাসাকে যুগপৎ চরিতার্থ করে। স্বামী বিবেকানন্দ যে কাব্যসঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে তিনি যে কাব্যের ভক্ত ছিলেন, এই কথা পরিস্ফুট হয়।*

*বিবেকানন্দের কাব্যসঙ্গীতপ্রিয়তা বিষয়ে তথ্যগুলি শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে মোটের উপর সংকলিত।

তিনি যে কাব্যসঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি যে কাব্য-সঙ্গীতের একটি সংকলনও করেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে দিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম সঙ্গীতকল্পতরু—"শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।" শ্রীযুক্ত ঘোষ মনে করেন এই সংকলনের ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি নরেন্দ্রনাথেরই লিখিত। শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক বিশেষ কথায় জানিয়েছেন—"প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।" এই সংকলনে সংগৃহীত গানগুলি থেকে সংগ্রাহকের কাব্যরুচির চমৎকার পরিচয় মেলে। হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান', রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ', 'তুই হৃদয়ের নদী', 'কালী কালী বলো রে আজ' ইত্যাদি গান এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি রায় প্রভৃতির কাব্যসঙ্গীত এই 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে স্থান পেয়েছে। রামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথ প্রথম যে দুটি গান শুনিয়েছিলেন সেই 'যাবে কি হে দিন আমার' এবং 'মন চল নিজ নিকেতনে' গান দুটিও এখানে সংকলিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক-সম্পাদিত সঙ্গীতসংকলন বিশ্বসঙ্গীতের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। স্বামীজির অনুজদ্বয় মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য-অনুসারে, বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে হার্বার্ট স্পেনসার-লিখিত Education-গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বিবেকানন্দের সাহিত্যরস-পিপাসু মনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে

বোঝা যায় তাঁর সাহিত্য-প্রেম কত গভীর ছিল এবং তাঁর সাহিত্য-অধ্যয়ন কত ব্যাপক ছিল।

স্বামীজি বলতেন—"এখন বৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে।" বিবেকানন্দের সাহিত্য-চিন্তাও ছিল উদ্দেশ্য-মূলক, যে সাহিত্য মনুষ্যত্ব দান করে, চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, মানুষকে উদ্যমশীল ও অভয় করে, সেই সাহিত্য স্বামীজির মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, সাহিত্য করার জন্য বিবেকানন্দ সাহিত্য করেন নি, তিনি সাহিত্য করেছিলেন জাতীয় উদ্বোধনের প্রয়োজনে। বৃন্দাবনের বাঁশী বাজানো কৃষ্ণের পরিবর্তে তিনি গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে চেয়েছিলেন—সেই কারণে তিনি গীতগোবিন্দের শ্রুতিমধুর শব্দ-ঝংকার পছন্দ করেন নি, সেই কারণে তিনি ভারতচন্দ্রের অতিবিদগ্ধ নাগরিক রুচিহীনতাকে সহ্য করতে পারেন নি, পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছিলেন, মধুসূদনের রাবণের পরাজয়ের সম্মুখীন বীরত্ব কত মহনীয়।

তিনি অন্যত্র বলেছেন দুর্বলতা, ভীরুতাই সব চেয়ে বড় পাপ। তিনি বলেছেন—"বীর হ—সর্বদা বল অভীঃ অভীঃ! সকলকে শোনা মা ভৈঃ মা ভৈঃ—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার।" বিবেকানন্দ তাঁর সাহিত্যে ভীরুতার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন এবং মহা-অভয় এবং অভীকমন্ত্র প্রচার করেছেন। তাঁর রচনাবলী, মন্তব্যসমূহ, কথোপকথন থেকে তাঁর সাহিত্যাদর্শ স্পষ্ট হয়ে যায়। সাহিত্যে তিনি চেয়েছিলেন ভাবগত বলিষ্ঠতা ও ভাবগত ওজস্বিতা। সর্বপ্রকার কুরুচি তাঁর কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়েছিল। তাঁর নিজের রচনায় রসিকতার নামে কোথায়ও

রুচিহীনতার পরিচয় পাই না। সুরুচি তাঁর স্বভাবগত ছিল, সেই কারণে তাঁর হাস্যরস নির্মল, কুরুচি-পঙ্কিলতা-মুক্ত। যে সাহিত্য অধ্যাত্মবাদ এবং আদর্শবাদকে রূপায়িত করে সেই সাহিত্যই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা পাবার অধিকারী।

॥ দুই ॥

এই ভূমিকার পর স্বামী বিবেকানন্দ রচিত গ্রন্থাবলীর বিশেষ পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 'পরিব্রাজক' নামক গ্রন্থটির পূর্বনাম ছিল বিলাতযাত্রীর পত্র। এই পরিত্যক্ত পূর্বনাম থেকে তুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়—প্রথমত এই গ্রন্থের বিষয় পাশ্চাত্ত্যদেশে লেখকের ভ্রমণের বিবরণ; দ্বিতীয়ত পত্রাকারে লিখিত বলে এই গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিকতা ও প্রত্যক্ষতা আছে যা সচরাচর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় না। পত্র সাধারণত একজন মানুষের মুখ চেয়ে লেখা হয় বলে তার মধ্যে পত্রলেখকের ব্যক্তিত্বও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বহুমুখী প্রাণশক্তি এই পত্রাকারে রচিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে ভাবে আমরা কথা বলি চিঠিপত্রে সাধারণত সেই ভাব ও ভঙ্গিটিই লিখিতরূপ গ্রহণ করে। তাই পরিব্রাজকে স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকানন্দ কথ্যরীতি অবলম্বন করেছেন, বরং অবলম্বন করেছেন বললে ভুল বলা হয়, মনে হয় যেন ঐ রচনার informality যেন আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে নিজেই ঐ কথ্যরীতিকে নির্বাচন করেছে।

পরিব্রাজকের প্রায় মুখবন্ধেই বিবেকানন্দ বলেছেন—"আগেই বলে রেখেচি, আমার পক্ষে ও সব একরকম অসম্ভব।" সত্যসত্যই তিনি পরিব্রাজক গ্রন্থে কোন একরকম কথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেন নি, এক প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অনায়াসে চলে যান তিনি। প্রকৃতি-বর্ণনা থেকে ইতিহাস—রাজনীতি, কারিগরি কৌশলের বিবর্তন থেকে হাঙর ধরার বর্ণনা সমস্ত কিছু কোন

শৃঙ্খলার দায় না রেখে, পর্যায়ক্রমের চিন্তা না করে স্থান পেয়েছে। অথচ রচনা কোনক্রমেই বিশৃঙ্খল নয়। এই বৈচিত্র্য, এই বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্রসমাবেশ এ সব এক অদম্য প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ। সেই চরিত্রগুণ, সেই প্রাণশক্তি এই আপাত বিশৃঙ্খল গ্রন্থকে শৃঙ্খলা দান করেছে। তাছাড়া, তাঁর পক্ষে যে এক রকম অসম্ভব তার মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয় লেখকের সদাজাগ্রত কৌতূহল। তিনি সন্ন্যাসী একথাও মনে থাকে না, শুধু মনে হয় ক্ষুধার্ত একজোড়া চোখ নিয়ে একজন মানুষ—বিশ্বের পথে নতুন আবিষ্কারের তরণী ভাসিয়েছেন। যা কিছু মানবিক সেই সমস্ত কিছুর বিষয়েই তার অপ্রতিহত কৌতূহল অপরিতৃপ্ত কৌতূহল। পত্রাকারে লিখিত বলে এই বিভিন্ন বিষয় বর্ণনার আপাত বিশৃঙ্খলা আরো স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমন, পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা, এ যেমন প্রাণশক্তির, সদাজাগ্রত কৌতূহলের পরিচায়ক, তেমনি গ্রন্থের এই বিন্যাস রচনাটিকে আরো স্বাভাবিক, সেই কারণে আরো নিরলঙ্কার-ভাবে সত্য করে তুলেছে।

সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে গঙ্গার মহিমার কথা স্বামীজির মনে আসে। *একদিকে হৃষীকেশের গঙ্গা—"সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়"*, অন্যদিকে "আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গা"। হিন্দুর সঙ্গে এই পতিতপাবনী গঙ্গার চিরকালের সম্পর্ক, 'গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গা জলে মরে" যখন যেখানে যায়, "সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা"। গঙ্গাবক্ষ দিয়ে জাহাজ যখন সমুদ্রের দিকে চলেছে তখন শুধু গঙ্গার কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল মাতৃভুমি বাংলাদেশের কথা লেখকের স্মৃতিপথে জাগ্রত হয়েছে। এই বাংলাদেশের যে বর্ণনা বিবেকানন্দ দিয়েছেন সেই রকম বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বেশী আমরা পাই না। এই বর্ণনার মধ্যে বাংলা দেশের মাতৃমূর্তি আশ্চর্য কোমল, আশ্চর্য নম্রভাষায়

ফুটে উঠেছে; দেশপ্রেমের সঙ্গে এসে মিশেছে আসন্ন প্রবাসীর ঘরে-ফেরা মন। "এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জল জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারা-সম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নিচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশানো, ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম লীচু জাম কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে, দুলচে আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্থানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যত দূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেচে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু

থাকচে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করচে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট ; আর ঐ তাল তমাল আম লীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে দীর্ঘ দীর্ঘ রেখার কী সরলতা, বর্ণের কী অত্যাশ্চর্য উল্লাস। বাংলাদেশের এই মমতাময় বর্ণনাটি পড়তে গেলে অন্য এক কবির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সহজেই পাঠকের মনে পড়ে যায়—এই রচনা 'চিত্ররূপময়'। বিবেকানন্দের এ রচনাও বর্ণনা-বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র 'বর্ণবহুল'। কিন্তু কবির পক্ষে, যে কোন কবির পক্ষে এই তো স্বাভাবিক ; কিন্তু যিনি সন্ন্যাসী, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগসাধনা যাঁর ব্রত তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এই উল্লাস তো প্রত্যাশিত নয়। এই আপাত-বিরোধ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ স্বয়ং সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ফল কথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।" এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই মায়ার ছাল, তার মধ্যে ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করা সন্ন্যাসীদের ব্রত, অথচ বিবেকানন্দের এই বর্ণাঢ্য রচনা পাঠ করলে মনে হয় তিনিও সেই পতঙ্গ যে রঙের নেশায় আগুনে পুড়ে মরে। রঙের নেশা ছিল বলেই তিনি নভোলোক থেকে নিম্নলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—উপরে নীল আকাশ থেকে নীচে গঙ্গার জল, নীচে গঙ্গার জল থেকে উপরে নীল আকাশ কোথাও তাঁর সপ্রেম দৃষ্টি বাধা মানে না। এই আপাত-বিরোধে হয়তো শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী বিস্মিত হয়, প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীর চোখে কোথায় কোন বিরোধ নেই। ইন্দ্রিয়ময়তা, বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে আরো এক উপাদান যুক্ত

হয়ে এই বর্ণনাটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে। এই ঘাস, এই গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য থাকবে না, শিল্পবিস্তারের প্রেতচ্ছায়া তাকে গ্রাস করবে, এই অসংবরণীয় নিয়তিচিন্তা বাংলা দেশের বর্ণনাকে আরো বেশী মমতা-মধুর করে তুলেছে। আসন্ন-প্রবাসী বাংলা দেশ ছেড়ে চলেছে, বাংলাদেশের এই শোভা থাকবে না—তাই যেন বাংলাদেশ এই সন্ন্যাসীকবির চোখে আরো পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে।

শুধু প্রকৃতির দিকে বাংলার শ্যামশষ্প, গঙ্গার জল, আর সমুদ্রের "নীল নীল নীল জল" তারই দিকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকান নি। সর্ববিষয়ে তাঁর কৌতূহল, সর্ববিদ্যায় তাঁর আগ্রহ। এই কর্মযোগী জ্ঞানযোগীও বটেন। তাই ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাণিজ্য, রাজনীতি, কারিগরিবিদ্যা কোন কিছুই তাঁর আগ্রহের বহির্ভূত নয়। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত বিষয়ে যখন তিনি আলোচনা করেন তখন তার মধ্য দিয়ে শুধু যে তাঁর অধ্যয়নের পরিধি পরিস্ফুট হয় তাই নয়, তার মধ্য দিয়ে তাঁর সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনেরও পরিচয় পাই।

এই পরিব্রাজকের মনে সব চেয়ে আগ্রহ জাগায় ইতিহাস। মাদ্রাজে আসামাত্র তাই মনে পড়ে যায় শঙ্করাচার্য-রামানুজের কথা। "এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহু-বলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল—যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা—যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের এই জন্মভূমি।" সিংহল ভ্রমণকালে আমাদের ইতিহাস নেই বলে বঙ্কিমের যে আক্ষেপ সেই আক্ষেপের প্রতিধ্বনি শুনি স্বামীজির মুখে। তিনি মন্তব্য করেন, "সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেচে। আমাদের মত নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী-ভাষায়

এই দেশেই সুরক্ষিত আছে।” পরিব্রাজকের জাহাজ এবার ক্রমেই উত্তরে চলেছে। সুয়েজখাল পথে এলো মিসর সভ্যতার স্মৃতি। “এই রেড্‌সির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার মহাকেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরবের মরুভূমি, এ পারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্‌ট দেশ (সম্ভবত মালাবার) হতে, রেড্‌সি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্যবিস্তার করে উত্তরে পৌঁচেছিল। এদের আশ্চর্য শক্তিবিস্তার, রাজ্যবিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদশাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধিমন্দির, নারীসিংহী মূর্তি। এদের মৃতদেহগুলি পর্যন্ত আজো বিদ্যমান। বাবরিকাটা চুল, কাছাহীন ধপধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস করতো। এই—হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরাণী বাদশাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরব বীরদের রঙ্গভূমি—মিসর। সেই কতকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে তন্নতন্ন করে লিখে গেচে।”

শুধু ইতিহাস নয়, প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় সত্যাসত্য নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধেও ভ্রমণকালে তিনি চিন্তা করেছেন। কোন্ কষ্টিপাথরে প্রত্নতাত্ত্বিক-সত্য যাচাই হয়, কী ভাবে সমসাময়িক বিবরণ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়, মুদ্রার তাতে ভূমিকা কী, কোন্ বিবরণকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় বা যায় না; ভাষার বিবর্তনগত প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ, শিলালেখ পাঠ ও খননকার্যের দ্বারা লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার কিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক-সত্য নির্ণয়ে সাহায্য করে, তার উল্লেখ তিনি এই গ্রন্থে করেছেন। এতেই প্রমাণ হয় যে শুধু সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধেই তিনি কৌতূহলী ছিলেন না, ইতিহাসের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতি, ইতিহাস রচনার যে বিধিবিধান সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।

শুধু প্রাচীন ইতিহাস নয়, সমসাময়িক ইতিহাস, যার অপর নাম

রাজনীতি সে সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর তন্দ্রাহীন মননশক্তি, সূক্ষ্ম অনুকম্পন অনুভবে সক্ষম সিস্‌মোগ্রাফ্ যন্ত্রের মত স্পর্শকাতর ছিল। তাই ইউরোপীয় তুর্কীসাম্রাজ্যের পূর্ব ইতিহাস যেমন তিনি আলোচনা করেছেন, তেমনি আলোচনা করেছেন ইউরোপের সমসাময়িককালের রাজনৈতিক অবস্থাকে। "বর্তমান অস্ট্রিয় সম্রাটের মৃত্যুর পর, অবশ্যই জর্মানি অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের জর্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে—রুষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্তমান সম্রাট্ অতি বৃদ্ধ—সে দুর্যোগ আশুসম্ভাবী।"

সর্ববিদ্যায় উৎসুক এই মানুষটি শুধু ইতিহাস বা রাজনীতি নয়; নৃতত্ত্ব, বাণিজ্য, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অদম্য ঔৎসুক্য বোধ করেন। নৃতত্ত্ব বা জাতিবিদ্যা নামক জ্ঞানের সদ্যোজাত শাখাটিও যে বিবেকানন্দকে কৌতূহলী করেছিলো এতেই তাঁর সার্বভৌমিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের দেহবর্ণ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন বিবেচনা করে এই শাস্ত্র অনুযায়ী কী ভাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। বাণিজ্য সম্বন্ধে বলতে যেয়ে শুধু ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যসম্ভারের উল্লেখ করেন নি তিনি, কোন্ কোন্ পথে সেই বাণিজ্যধারা প্রবাহিত ছিল সে কথাও উল্লেখ করেছেন। জাহাজের বিবর্তনের মত কারিগরি বা প্রয়োগবিদ্যাও যে তাঁকে আগ্রহান্বিত করতো একথার প্রমাণ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেই আছে। শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা 'ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙ্গি', পান্‌সি নৌকা, গাধাবোট ইত্যাদির পরে এলো পালের জাহাজ—এই "পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে"। "বাষ্পবল এ সমস্তই বদলে ফেলেচে।" এলো বাষ্পীয় পোত, এলো যুদ্ধজাহাজ যেন 'ভাসন্ত লোহার কেল্লা'। যুদ্ধজাহাজের ক্রমোন্নতির বিবরণও তিনি দিয়েছেন—কী ভাবে একদিকে লোহার বর্মে যুদ্ধজাহাজ সজ্জিত হলো এবং কী ভাবে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বজ্রভেদী তোপেরও

উন্নতি হতে থাকলো। যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে বাণিজ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজের পার্থক্যেরও তিনি আলোচনা করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত পারদর্শী সন্ন্যাসী ভ্রমণকালে দেশবিদেশের সঙ্গীতকলারও রসগ্রহণ করেছেন। শুধু সঙ্গীত কেন, অভিনয়, চিত্রশিল্প—সমস্ত শিল্পকর্মই তিনি সমান আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেছেন ও সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বার্ন্হার্ড ও দৈবী কণ্ঠ-সম্পন্না অসামান্যা গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। উভয়ের সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবরণী তিনি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে রেখে গিয়েছিলেন। সেই বিবরণ থেকে সারা বার্ন্-হার্ডের ভারতপ্রেমের পরিচয় পাই। ভিয়েনায় তিনি চিত্রশালা পরিদর্শন করেন এবং সেই পরিদর্শন সম্বন্ধে যে মন্তব্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে, রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য।"

মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন, মানবসভ্যতা-বৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ শিল্পসঙ্গীত নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে-যুগে রাজমালাই ছিল ইতিহাস সে-যুগে তিনি ভুলে যান নি যে, নামগোত্রহীন নিরুপাধি সাধারণ মানুষই সভ্যতার স্রষ্টা, সভ্যতার পালক, সভ্যতার ধারক ও বাহক। এই দৃষ্টিই বিবেকানন্দকে দান করেছে সুমহৎ স্বাতন্ত্র্য। যে যুগের ইতিহাস-রচনায় দীনদরিদ্র সম্পদহীন মানুষের অবদান স্বীকৃতি পায় নি, সেই যুগের পরিমণ্ডলে মানুষ হয়ে তিনি যে সেই অবদানকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে পেরেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের একটিমাত্র বাক্য উদ্ধার করলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ পরিচয় আমরা পাবো। গাড়ির চাকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"এ চাকা প্রথম কে করলে? কেউ করেনি; অর্থাৎ সকলে মিলে করেচে।" অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ যত বড়ই হোন্ না কেন, সভ্যতার অগ্রগতি হয় সমষ্টির সামূহিক প্রচেষ্টায়। একজন হয়তো নেতৃত্ব দান করে, ভাসমান বরফখণ্ডের দৃষ্ট-অংশটুকুর মত তার অবদানটিই দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু তার পিছনে লুক্কায়িত ভাবে অসংখ্য অজ্ঞাত-কুলশীল মানুষের অবদান থাকে। জাহাজের শ্বেতাঙ্গ যাত্রী, বাঙালী ছাত্র বা কাপ্তেন তাঁর চোখে যত না পড়ে, তার চেয়ে বেশী পড়ে 'চাকর-বাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা'। "চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ববঙ্গের; রাঁধুনিরাও পূর্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। আর আছে চারজন মেথর।" তাদের কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া, মেসব্যবস্থা সমস্ত খুঁটিনাটি তাঁর চোখে পড়ে।

চোখে পড়ে, কারণ তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন যে এদেরই উপর ভর দিয়ে সমস্ত সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। সেই কারণে নবীন ভারতবর্ষ সৃষ্টির কাজে সভ্যতার জনক সাধারণ মানুষ, নিম্ন বর্ণের মানুষের উপরই তিনি সর্বাধিক আস্থা স্থাপন করেছিলেন। "...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" অন্যত্র ভারতের শ্রমজীবীদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, "হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিলন, ইরাণ, আলক-সন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধি-পত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে একথা।....যাদের রুধির-স্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?" বিবেকানন্দের প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দ নিজেই দিয়েছেন। তাদের কথা তিনিই ভেবেছেন, আগ্নেয় ভাষায় তাদের গুণগান করেছেন।

॥ তিন ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজদের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতবাসীর গভীর পরিচয় হওয়ার পর প্রাচ্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। যাঁরা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী তাঁরা নির্বিচারে যা কিছু প্রথাগত ও প্রাচীন-তাকেই আঁকড়িয়ে ধরে ছিলেন, অপরপক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যপন্থিগণ সম্পূর্ণভাবে নূতন স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিলেন। এর ফলে দেখা দিয়েছিল দেশব্যাপী এক ভাব-আন্দোলন। এর ফল ভাল হোক কি মন্দ হোক, এর ফলে জড়ত্ব-প্রাপ্ত ভারতবর্ষের জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই সময় যে সংকট, যে দ্বিধা, যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল তার প্রতিচ্ছবি আমরা সমকালীন মনীষীবৃন্দের রচনায় লক্ষ্য করি—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের রচনায়। এই মনীষীবৃন্দ সকলেই অনুভব করেছিলেন যে দুই সভ্যতার সংঘর্ষে নয়, তাদের সমন্বয়েই নব ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেই কারণে তৎকালীন চিন্তানায়কদের রচনায় আমরা লক্ষ্য করি, তাঁরা দুই সভ্যতার কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কতটুকু বর্জনীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং জাতীয় দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে পথনির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' নামক গ্রন্থটি সেই পথনির্দেশ-প্রয়াসের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু শুধু তৎকালীন চিন্তার দলিল হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবেও গ্রন্থটির মূল্য অসাধারণ। এই রচনায় আমরা শুধু যে দুই সভ্যতার পার্থক্যের পরিচয় পাই, দুই সভ্যতার সদ্‌গুণাবলী বা বর্জনীয় অংশের উল্লেখ পাই, তা নয়, জীবন্ত সচল কথ্যরীতিতে রচিত ইডিয়ম-খচিত ভাষায় দুই সমাজের উজ্জ্বল রেখাচিত্র পাই।

বিবেকানন্দের মধ্যে যে আধুনিক দৃষ্টি ছিল সেই দৃষ্টির জ্যোতিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষে এখন জাতিভেদ বর্ণাশ্রমগত নয়, ভারতবর্ষের সত্যকার জাতিভেদ অর্থনৈতিক বৈষম্যে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থের প্রথমেই তিনি সেই অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত যে নির্মম ভেদ, যে নিষ্ঠুর বৈপরীত্য তা একটি মাত্র বাক্যে পরিস্ফুট করেছেন—"অট্টালিকা-বক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়-ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃত্তের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।" ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা কী দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখে তা তিনি একটি সমাসবহুল অনুচ্ছেদে ফুটিয়ে তুলেছেন। "ত্রিংশ-কোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যদ্-বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য-বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধ-পূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরেজ রাজপুরুষদের চক্ষে আমাদের ছবি।" পর্যটক ভারতবর্ষকে দেখে কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান। অপরপক্ষে, "নববলমধুপানমত্ত হিতাহিত বোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্ম-বাদী, দেহপোষনৈকজীবন—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্ত্য অসুর।"

স্বামীজি বলেছেন দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। সত্যদর্শী অপক্ষপাতদৃষ্টি সন্ন্যাসী বলেছেন যে দুই

দলই ভিতরের আসল জিনিস দেখে নি। সত্য বা ভালো যে দুই সমাজেই আছে, বর্জনযোগ্য উপাদানের অভাব যে কোন সমাজেই নেই একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার কারণ তাঁর মন আশ্চর্যরকম সংস্কারমুক্ত ছিল। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দুই সভ্যতার প্রাচীন ও সমসাময়িক ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে ছিল একটি বিরল সামগ্রিক দৃষ্টি, যার ফলে চোখের-দেখা এবং অধ্যয়ন একত্রিত করে সামান্য কয়েকটি পংক্তির মধ্যে জাতীয় জীবনের কোন বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে তিনি পরিস্ফুট করে তুলতে পারতেন। এই সমগ্রদৃষ্টি, যা অল্প পরিধির মধ্যে বহুকে বিম্বিত করতে পারে, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে রূপায়িত করতে পারে, তার বহু উদাহরণ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম আপাতদৃষ্টিতে মৃতকল্প মনে হলেও তার মধ্যে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, ভারতবর্ষের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক যে অচ্ছেদ্য, অপরিবর্তনীয় সে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলেবিস, মায় অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনো চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপান পর্যন্ত পূজো খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে ক্রিশ্চানরা পূজো করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়ি হাত রাবণ নাড়াতে পারেন নি, ও কি এমন পাদ্রী-ফাদ্রীদের কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—

এ দেশে চিরকাল।" কিন্তু তাই বলে আমাদের কোন শিক্ষার দরকার নেই, এমন কোন আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টি নেই। দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে মোক্ষধর্ম অনুশীলনের কোন প্রয়োজন নেই, ভোগ না করলে ত্যাগ করা যায় না; মোক্ষ নয়, স্বধর্মপালনই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। "এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!!" সুতরাং শিক্ষা নেবার অনেক আছে।

বিবেকানন্দের সামগ্রিক দৃষ্টির, বহুধাবিচিত্রকে ঐক্যদান-ক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাই যখন তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে দুই দেশের ধর্মোপদেশের সঙ্গে দুই দেশের জীবন-প্রণালীর পার্থক্য দেখিয়েছেন। রচনাংশটি উদ্ধার করলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে—"প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর। পোঁটালা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাকো, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলেছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কাজ কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝলি রাম' হল; ওরা—ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহা কার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরে ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগত জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্' গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগে পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করেছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!!"

শুধু ভাষার সৌকর্যে রচনা সাহিত্য হয় না; প্রকৃত সাহিত্য হতে গেলে তার মধ্যে প্রয়োজন এই সামগ্রিক দৃষ্টি। এই ঈগলচক্ষু, যা বিশৃঙ্খল বিশ্বকে ঊর্ধ্ব থেকে ঐক্যময় দেখে, বিশ্বের বিক্ষিপ্ত পত্র-রাজিকে একটি গ্রন্থভুক্ত করে, একক অগ্নিশিখায় সমস্তকে উদ্ভাসিত করে, যে ঘটনাসমূহের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, রচয়িতার মধ্যে তারই উপস্থিতি রচনাকে সাহিত্য-গুণান্বিত করে তোলে। বিবেকানন্দের রচনায় এই গুণ বহুল পরিমাণে বর্তমান ছিল।

এই সামগ্রিক দৃষ্টির জোরে তিনটি মাত্র অনুচ্ছেদে ফরাসী, ইংরেজ ও হিন্দুর তুলনা করে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কেউ কারু উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারবে না, এইটিই ফরাসীচরিত্রের মূলমন্ত্র। এই সামাজিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে কী অগ্নিকাণ্ড হয় ফরাসী বিপ্লব তার প্রমাণ। ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, গাঁট থেকে পয়সা বার করতে হলে তার হিসাব চাইবে। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব বাধালেন, রাজার মুণ্ডচ্ছেদ হলো। তাঁর মতে, হিন্দুর আসল জিনিস পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'! এতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলেই আরঙ্গজেবের আমলে মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

কোন সাহিত্য-প্রেমিক যখন বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করেন তখন তাকে তত্ত্বগত আলোচনা, ইতিহাস বা জাতিতত্ত্বের আলোচনা যত না আকর্ষণ করে তার চাইতে অনেক বেশী করে, সমস্ত দেশের জীবনযাত্রার নামহীন খ্যাতিহীন প্রবাহ সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। ঔপন্যাসিক যেমন সমাজজীবনের ছবিকে, সমাজ-জীবনের বিচিত্র বহুমুখিতাকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি বিবেকানন্দ যখন যে দেশে গিয়েছেন সেই দেশের সমাজজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি তন্নতন্ন করে লক্ষ্য করেছেন এবং পরিস্ফুট করেছেন। এর প্রধান কারণ বিবেকানন্দের প্রগাঢ় মানবতাবোধ।

সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মায়াময় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি যেমন, তেমনি নিরাসক্ত নির্বিকার হয়ে মানুষকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেন নি। বিবেকানন্দের মানবতাবাদ কোন নিরাকার বিমূর্ত তত্ত্ব বা ভাববস্তু নয়। বিবেকানন্দের এই মানবতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "বিবেকানন্দের মানব-প্রেমও দেশ ও জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটা নির্বিশেষ মহামানবের ধ্যানে চরিতার্থ হইতে পারে নাই ; স্পর্শ করিবার, স্পন্দন অনুভব করিবার মত একটা দেহ তাহার চাই ;....যে মানুষকে ভালোবাসে, সে স্বজনকে ভালোবাসে নাই—যে বিশ্বকে সত্যই আত্মীয় জ্ঞান করে, সে আপন সমাজকে, আপন দেশকে মায়ের মত, প্রণয়ীর মত ভালোবাসে নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না।" বিবেকানন্দ 'মানুষ' বলতে মানবাত্মার বহু-বিচিত্র বিশেষ রূপকেও মেনে নিয়েছেন। বিবেকানন্দের মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি যখন যে দেশে গেছেন তখনই সে দেশের মানুষকে দেখেছেন, রক্তমাংসের মানুষকে, সামাজিক মানুষকে, তার পোশাক-পরিচ্ছদ রীতি-নীতি সমস্ত কিছুকে। দেখেছেন এবং পরমোৎসাহে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় তাঁর যে উল্লাস তার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নন, তিনি সন্ন্যাসী হয়েও জীবনবাদী ; জীবনবিমুখতা তার জন্য নয়।

এই সব মন্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ দিই। পাশ্চাত্ত্যের পোশাক ও ফ্যাশন সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে মন্তব্য করছেন— "এদের পোশাক কাজকর্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী ; ধনীলোকদের স্ত্রীদের সামাজিক পোশাক ছাড়া মেয়েদের পোশাকও হতচ্ছাড়া— আমাদের মেয়েদের শাড়ি আর পুরুষদের চোগা-চাপকান পাগড়ির সৌন্দর্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোশাকে যত রূপ, তত আঁটাসাটায় হয় না। আমাদের পোশাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পোশাক নেই ; কাজ করতে

গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাশন কাপড়ে, আমাদের ফ্যাশন গয়নায় ; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।

ফ্যাশনটা কি, না ঢঙ ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ—প্যারিস শহর থেকে বেরোয় ; পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে প্যারিসের নর্তকীরা এই ঢঙ ফেরাতো। একজন বিখ্যাত নটী যে পোশাক পরলো সকলে অমনি দৌড়ুল তাই করতে। এখন দোকানীরা ঢঙ [সৃষ্টি] করে। কত ক্রোর টাকা যে এই পোশাক করতে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোশাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোশাক তৈরী হয়। তারপর দু-চার জন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়, না পরলে জাত যায় !! এর নাম ফ্যাশন ! আবার এই ফ্যাশন ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই তো, তাছাড়া অন্য সময়েও আছে।···ইংরেজ মেয়েদের আর জার্মান মেয়েদের পোশাক বড় খারাপ ; ওরা বড় প্যারিস ঢঙে পোশাক পরে না—দু-দশজন বড় মানুষ ছাড়া ; এইজন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে।···· ঠিক ঢঙের পোশাক না হলে জেণ্টলম্যান বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুশকিল।”

মানুষকে কেমন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারলে তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচার-ব্যবহারও চোখ এড়ায় না, তা বিবেকানন্দের এই জাতীয় রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়। বিদেশে গেলে সাজ-পোশাকের দিকে নজর পড়ে, কিন্তু যেখানে সাধারণের নজর এড়িয়ে যায়, সেখানেও বিবেকানন্দের চোখ পড়ে। যা-কিছু মানবিক, ক্ষুদ্র তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর সেই সব কিছুর প্রতি আসক্তি সাহিত্যিকের পেশার প্রথম সর্ত, সেই সর্ত বিবেকানন্দ পূর্ণমাত্রায় পালন করে-

ছিলেন। একটি উদাহরণ দিই: "'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর-সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা! খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেননা কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো—এটা অত্যাচার। ও-সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আহার ও পানীয়ের দীর্ঘ আলোচনা তিনি করেছেন। দুই সভ্যতার আধ্যাত্মিক বা তত্ত্বগত পার্থক্যের দিকেই শুধু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। আত্মিক জীবনের শতদল যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি সাধারণ জীবনের মূলও তাঁর দ্বারা অবজ্ঞাত হয়নি। তাই আমিষ ও নিরামিষ আহারের পক্ষে বিপক্ষে সমস্ত তর্ক তিনি অপক্ষপাতভাবে উপস্থিত করেন। হজমের গোলযোগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ঘিয়েভাজা তেলেভাজার কুপ্রভাব প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেন তার চমৎকারিত্ব এবং সাহিত্যিক গুণ স্বতঃপ্রকাশ—"তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেওয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ট্যাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!! নিজেরা তো উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশসুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড

সভ্য, শহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর-মর হবে, তবু বলবে না যে, এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে!! কোন রকম করে শহুরে হবে!!

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে দেখেছিলাম তিনি সমসাময়িক ফরাসীদেশ ও জর্মানির মধ্যে প্রতিতুলনা করেছিলেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে দুই দেশের চমৎকার ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থেও দেখি ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ পারি নগরীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। এই বিশ্ব-পরিব্রাজক সন্ন্যাসী যখন ভোগবিলাসের নগরী পারির সপ্রশংস বর্ণনা করেন তখন আরো বোঝা যায় এই সন্ন্যাসী মূলত মানবতাবাদী! "এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী।" 'সদানন্দ-নগরী'. সত্যই পারি শহরের এর চেয়ে ভালো নাম কী হতে পারে? "অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতে মোড়া।" কোন্ আশ্চর্য অপক্ষপাত থাকলে এমন দৃষ্টি অর্জন করা যায় ভেবে বিস্মিত হতে হয়। এই পক্ষপাতহীনতার উৎস তাঁর নিম্নের উক্তি থেকেই আবিষ্কার করা যায়, "প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।" অন্যের জীবনকে অন্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখার এই ক্ষমতা স্বামীজির ছিল। আমরা জানি দৃষ্টির সততা সাহিত্যিকের প্রধান গুণ—এই গুণের অভাবে ভাষার কাজ দেখানো সম্ভব কিন্তু সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের মধ্যে মহৎ সাহিত্যিক-সুলভ এই দৃষ্টির সততা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল।

গ্রন্থশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পার্থক্য বিষয়ে দুটি যে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ বিবেকানন্দ রচনা করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। প্রথমত ইউরোপীয় সভ্যতার কথা—"ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হল উপকরণ। এঁর তাঁত হচ্ছে—এক নাতি-শীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তূলো হচ্চে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি-জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়, যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।" অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতার কথা—"অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতলক্ষেত্র—আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানা প্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তূলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ-নিবারণ।"

॥ চার ॥

স্বামীজির 'ভাববার কথা' নামক গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি। পরে যখন বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় অবতীর্ণ হবো তখন এই প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে তাঁর নিজের রচনারীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য উপস্থিত করার আগে শুধু এই কয়েকটি মন্তব্য আপাতত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উদার নীতির কথা বলেছিলেন, বিবেকানন্দের এই প্রবন্ধটি সেই উদারনীতির উত্তরাধিকার। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, মনোভাব প্রকাশের জন্য যেমন শব্দ-নির্বাচন ভাষা-ব্যবহার প্রয়োজন তাই তিনি করবেন এবং প্রয়োজনবশে 'শবপোড়া মড়াদাহের' গুরুচণ্ডালি দোষ করতেও দ্বিধা করবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত এই পথই বিবেকানন্দ শিরোধার্য করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কথ্যরীতি ও চলিত ভাষার স্বপক্ষে পরবর্তীকালেও, অর্থাৎ সবুজপত্রের যুদ্ধধ্বজা তুলে ধরার কালেও, এমন যুক্তিপূর্ণ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। চলিতক্রিয়া ও সাধুক্রিয়ার দ্বিধা যে-যুগে প্রায় কেউ, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, কাটিয়ে উঠতে পারেননি, সেই যুগে তিনি চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন এবং চলিত ভাষার সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছেন। সর্বোপরি, এই ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে ভাষার চরিত্র সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

এই সন্ন্যাসীর আশ্চর্য গণতান্ত্রিক মনের পরিচয় পাই প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিতেই—"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।" বাক্যটির 'প্রাচীন' শব্দটির স্থানে যদি 'আধুনিক' ও 'সংস্কৃতে'র স্থানে যদি 'ইংরেজি' বসাই, তাহলে স্বামীজির আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপে রূপান্তরিত হবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় জাতিভেদ, শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে ভেদ। প্রবন্ধটির পরের বাক্য থেকে বুঝতে পারি, চলিত ভাষার জীবনশক্তি বেশী বলেই তিনি শুধু চলিত ভাষার পক্ষপাতী নয়, চলিত ভাষার প্রতি তাঁর সমর্থন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মতো তাঁরও আবির্ভাব লোকহিতায়। তাঁর জীবনের লোকহিত নামক লক্ষ্য অর্জন করতে যেয়ে তিনি বুঝেছিলেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে সেতুবন্ধ-রচনা করতে পারে এমন ভাষায়, জন-সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লোকশিক্ষা বিতরণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকে পালি ভাষার জন্ম, একই প্রেরণায় ধর্মবেত্তাগণ সর্বজনের বোধ্য গল্প-উপকথার আকারে ধর্মোপদেশ দিয়ে গেছেন এবং এরই প্রেরণায় বিবেকানন্দ চলিত ভাষার সমর্থক।

কিন্তু শুধু এই ব্যবহারিক কারণে নয়, নিতান্ত শিল্পগত সাহিত্যিক

কারণেও বিবেকানন্দ চলিত ভাষার সমর্থক। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?" এই প্রশ্নের কী উত্তর যে তিনি প্রত্যাশা করেন তা বলাই বাহুল্য। যে ভাষায় আমরা ঘরে কথা বলি তাতেই মনে মনে পাণ্ডিত্য-গবেষণা করি, সুতরাং লেখার বেলায় কিম্ভূতকিমাকার সাধুভাষা ব্যবহারের কী প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা, "স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে-ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।" অর্থাৎ শুধু লোকশিক্ষার তাগিদে নয়, আত্মপ্রকাশের তাগিদেই চলিত ভাষা ব্যবহার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। আর ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের ভাবনা, এ তো প্রধানত সাহিত্যিকের ভাবনা। কোন্ ভাষা ভাব-প্রকাশে সব চেয়ে সমর্থ তা নির্ণয় করার জন্য তৎসম শব্দের আড়ম্বর বা অলঙ্কার-বাহুল্য বিচার করার দরকার হয় না, শুধু বিচার করে দেখা দরকার সেই ভাষা নমনীয়, সর্বত্রগামী ও সর্বথা ব্যবহারযোগ্য কি না। "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত; মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

চলিত ভাষা বটে, কিন্তু কোন্ চলিত ভাষা, বাংলা দেশের কোন্ অঞ্চলের চলিত ভাষা? তার উত্তর, কলকাতার ভাষা; এখানে শ্রেয়তার কোন প্রশ্ন নেই, কে জয়ী হচ্ছে তার প্রশ্ন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—জোর করে, বাইরে থেকে সাহায্য দিয়ে, কোন ভাষাকে প্রধান করে তোলা যায় না। ভাষার একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে, তার বিবর্তনের নিজস্ব গতিবেগ আছে; প্রাকৃতিক প্রবর্তনায় একটি ভাষা অন্যান্যগুলিকে ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে ওঠে। কলকাতার ভাষা প্রধান হয়ে উঠেছে কারণ কলকাতা রাজধানী, রাজধানীতে সব অঞ্চলের লোক আসে এবং সেখান থেকে আবার নানা জেলায়

ছড়িয়ে যায়। এমনি করে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষাই সারা বাংলা দেশের কথ্য ভাষার আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। "প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকাতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ।" আজ আমাদের দেশে ভাষা নিয়ে যখন এত বিরোধ, এত দ্বন্দ্ব তখন বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, "এথায় (অর্থাৎ ভাষাপ্রাধান্যের ব্যাপারে) গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে।"

এই আলোচনার পর তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন, সত্যকার সাহিত্যিক ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনায়। তিনি বলেছেন চিন্তা যেখানে সজীব নয়, বক্তব্য যেখানে সপ্রাণ নয়, সেখানে সেই শূন্য-গর্ভতা ভাষার আড়ম্বরে, শ্রুতিসুখকর ধ্বনি ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার বাহুল্যে ঢাকা দেওয়া যায় না। বরং বলা যায়, আন্তরিক শূন্যতার বাহ্যিক লক্ষণই এই অলঙ্কারের চাকচিক্য। মহাভারতের ভাষা নিরলঙ্কার, সরল, বাহুল্যবর্জিত, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত সাহিত্য যত বেশী শূন্যগর্ভ তত বেশী অলঙ্কৃত। "যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে,—'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! ও সব মড়ার লক্ষণ।" কাদম্বরীচিত্র প্রবন্ধে বাণভট্টের ভাষাচিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা ও বর্ণবিন্যাস ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সমাসের গুরুত্বে সে ভাষায় ভাব অদৃশ্য হয়েছিল, দীর্ঘহ্রস্ব ধ্বনিবিন্যাসের মোহে অর্থ অবলুপ্ত হয়েছিল। সে ভাষা আর আত্মপ্রকাশের ভাষা ছিল না, হয়েছিল

বিলম্বিত দীর্ঘায়িত সৌজন্যের কৃত্রিম ভাষা। অতি-বৈদগ্ধ অবক্ষয়ের লক্ষণ।

বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টির আরো প্রমাণ পাই যখন দেখি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় জীবনে যখন অবক্ষয় আসে, সভ্যতা যখন প্রাণশক্তি হারায় তখন ভাষাই যে কৃত্রিম ও অতি-অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে তাই নয়, সেই অবক্ষয়ের জীবাণু তখন অন্য শিল্পের প্রাণ-শক্তিকেও আক্রমণ করে। "যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল।" যে প্রয়োজনে বাড়ি গড়া সেই প্রয়োজনের দিকে নজর না দিয়ে বাস্তুশিল্পী অলঙ্করণেই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। সঙ্গীতে প্রাণের চেয়ে, তানের মহিমা বেড়ে গেল—শিল্পের জায়গায় শিল্প-কৌশল বড় হয়ে উঠলো। এবং "যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়।" বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন সর্বদেশে সর্বকালে অবক্ষয়ের যুগ কলাকৈবল্যের যুগ। চলিত ভাষাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন তার আর একটি কারণ চলিত ভাষাই জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রবাহের জীবনীশক্তির সত্যকার বাহন। জাতীয় প্রাণশক্তির বাহন যে চলিত ভাষা তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হলে সাহিত্যও সজীব ও চলিষ্ণু হয়ে উঠবে। আবার সজীব সাহিত্য জাতীয় জীবনকেও প্রাণরস সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে একই সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন উপকৃত হবে।

সাহিত্যের উপাদান ভাষা, শুধু বিষয়বস্তু নয়। সাধারণ পাঠক সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিকেই সব চেয়ে বেশী নজর দেয়। কিন্তু সাহিত্য-নির্মাণকর্মের সঙ্গে যাঁর সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন প্রকৃত সাহিত্যিককে ভাষাগত ভাবনা কী পরিমাণে ভাবায়। ভাষা সম্বন্ধে কোন সময়ে চিন্তিত হননি এমন সাহিত্যিক বিরল। বিবেকানন্দ যে ভাষার বৈশিষ্ট্য চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন

ছিলেন, কোন্ ভাষা প্রকৃত সাহিত্যের ভাষা হতে পারে, এই সব বিষয়ে তিনি যে চিন্তা করেছেন, তাতে বোঝা যায় সাহিত্যিকের বিবেকও তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। ছিল বলেই, জীবন্ত ভাষার প্রকৃতি তিনি অনুসন্ধান করেছেন, জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন এবং চলিত ভাষার স্বপক্ষে তাঁর সুচিন্তিত রায় দান করেছেন।

সাহিত্যিক দিক দিয়ে ভাববার কথা গ্রন্থটির আর উল্লেখযোগ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীমূলক রচনা। ধর্মোপদেষ্টাগণ, যীশু থেকে রামকৃষ্ণ, যেমন ধরনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকতেন, বিবেকানন্দ-রচিত এই ক্ষুদ্রকায় কাহিনী-গুলিও সেই প্রকৃতির। এই কাহিনীগুলির ভাষাসারল্যে রামকৃষ্ণের প্রভাব থাকতে পারে কিন্তু মনে হয় তার চেয়ে, ক্রিয়াপদ বাদ দিলে, বঙ্কিমের মুচিরাম গুড়ের চরিতকথার ভঙ্গির অনেক বেশী মিল আছে। একটি অংশ উদ্ধার করলেই এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। "গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার ; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে ! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়-কুড়ি ছেলে হলে ঐ রকম চোহারাই হয়ে থাকে।"

বিবেকানন্দের রচনাবলীর অন্যতম প্রধান লক্ষণ তাঁর অদম্য রসবোধ—যে রসবোধ যে-কোন আলোচনায় সুযোগ মাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায়। জীবন-সম্বন্ধে যে সস্নেহ সপ্রেম দৃষ্টির অধিকারী হলে অনাবিল মুক্ত ত্র্যম্বকস্য অট্টহাসের শুভ্রতার অধিকারী হওয়া যায়, জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সেই সস্নেহ সপ্রেম দৃষ্টি ছিল। এই দৃষ্টির উৎস পূর্ব-কথিত সেই মানবতাবাদ, যা বিমূর্ত নয়, রক্ত-মাংসের মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে যার অস্তিত্ব। মানবতাবাদী ছিলেন বলেই তাঁর রসিকতা বিদ্বেষহীন, কণ্টকহীন। যখন কোন অন্যায় বা অনাচারকে হাস্যরসের তরলে তিনি ধরাশায়ী করতে

চেয়েছেন তখনও তার মধ্যে বিদ্বেষের তিক্ততা বা আক্রমণের ধার প্রকাশ পায়নি। অন্যান্য অসঙ্গতির সঙ্গে, সেই অন্যায় বা অনাচারের অসঙ্গতির দিক হাস্যরসের জ্যোতি বিকীর্ণ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর হাস্যরস তাঁর অপরিমিত প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ। যে প্রাণ-চাঞ্চল্য তিনি ধারণ করতে পারেন না তাই যেন পাত্র-ছাপিয়ে-পড়া পানীয়ের মত রসিকতার শত ধারায় উচ্ছলিত হয়। প্রাণের আনন্দ তাঁর সরস বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে মুহুর্মুহু ফুলঝুরি হয়ে ঝরে।

আবার আমরা কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের ইতিকথায় ফিরে আসি। যখন পড়ি, "কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং চৌম্বকশক্তির গতাগতির বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ।" তখন স্বভাবতই সমসাময়িক কালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতিলক্ষণ' নামক ব্যঙ্গ কবিতাটির কথা স্মরণপথে আসে—

টিকিটি যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্-শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

তখন সন্দেহ না করে উপায় থাকে না যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানে দুর্দান্ত বিদ্যাভূষণ আর বিবেকানন্দের সর্বজ্ঞ গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য একই স্কুলের ভিত্তিতে কল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে হিন্দু-ধর্মের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মোহিত হয়েছিলেন সেখানে আধুনিক কালে হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ধূম্রজালে তাঁর স্বচ্ছ মনকে বিসর্জন দেননি।

গ্রাম্য অন্ধতা এবং কুলকৌলীন্য নিয়ে যখন তিনি বিদ্রূপ করেন, তখন সেই বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের চেয়ে সরল বাচনভঙ্গি সাহিত্য-রসিককে মুগ্ধ করে বেশী। একই রচনা থেকে উদাহরণ দিই। "বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না। ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ

ছাড়া ধর্ম বুঝাবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!" ভণ্ড ধর্মোপদেষ্টাদেরও তিনি ঠাট্টা করেছেন, দেখিয়েছেন জীবনের সব কর্মে যে অকর্মা প্রমাণিত হয় সে-ই হঠাৎ গুরু হয়ে বসে। সেই ছোট রসকাহিনীটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি।

" 'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টমিগুলাও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ—'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'

রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?"

আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আলোকময় যে অসংখ্য সরস বাক্যাংশ-পুঞ্জ তার রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তার সম্পূর্ণ তালিকা রচনা কঠিন। সামান্য কিছুর উদাহরণ দিলেই সেই সদানন্দময় রসিক-মনের আমরা অনেকটা আভাস পাবো। যখন পড়ি, "এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে," তখন 'কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বর' এই উপমা রসিকের মর্মভেদ না করে পারে না। আর সাহিত্যে উপমা-ব্যবহারের সার্থকতার প্রধান কষ্টিপাথর যদি হয় চিত্র এবং ধ্বনির প্রত্যক্ষতা, তবে এই উপমা যে-চিত্র ও ধ্বনিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে এ কথা কে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ সাহিত্যে উপমা-ব্যবহার যে গুণে সার্থক হয়, বিবেকানন্দের উপমাগুলির মধ্যে সেই সাহিত্যগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আরো লক্ষ্য করার কথা যে তাঁর উপমা কখনো পুঁথিগত বা কবিপ্রসিদ্ধিগত নয়, সব সময় প্রবহমান পরিচিত জীবন থেকে সংগ্রহ করা। চোখ খোলা না রাখলে এই সব উপমা ব্যবহার করা যায় না, জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ

কাজকর্মের মধ্যে সরস অসঙ্গতি রসিকমন দিয়ে আবিষ্কার করতে না পারলে, এই সব উপমা সংগ্রহ করা যায় না। উল্লিখিত উপমার সঙ্গে পরবর্তী উপমাটি—'ইয়েজ্বিদ মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদগদস্বরে স্তুতি'—লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বিবেকানন্দের উপমাগুলি কী যথার্থ, কী অনিবার্য।

দেবমণ্ডলীর নাম করতে যেয়ে যখন তিনি 'ইঁদুর-চড়া গণেশ আর কুচো দেবতা ষষ্ঠীর' উল্লেখ করেন তখন হাস্য-তরঙ্গ রোধ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। সরস বাক্যাংশসমূহের এই স্বতঃস্ফূর্ত অজস্র ব্যবহার শুধু ভাববার কথা গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়, স্বামীজির অন্যান্য রচনারও বৈশিষ্ট্য। পূর্বালোচিত 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে আর একবার দৃষ্টিপাত করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'পরিব্রাজকে'র প্রথমেই তিনি মন্তব্য করেন, "বলি হ্যাঁগো, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস্ হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ?" এই উক্তির মধ্যে মেয়েলি বাচনভঙ্গিটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য হনুমানের সি-সিক্‌নেসের কল্পিত হাস্যকর দৃশ্যটি। বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তরে সি-সিক্‌নেসে পীড়িত ভ্রমণসঙ্গীর দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহযোগে করুণ উক্তিটি যেমন মর্মান্তিক, তেমনি হাস্যকর—"বড়ই বেজায়—গুলিয়ে যাচ্চে!"

জাতিতে-জাতিতে আর্যত্ব দাবী নিয়ে যে কোলাহল সে সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"এখন সকল জাতির মুখে শুনচি, তারা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা!" পরিব্রাজকে হাঙর ধরার একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। সমস্ত যাত্রী হাঙরকে দেখার জন্য কেমন উদগ্রীব হয়েছিল তার সরস বর্ণনা সেখানে তিনি দিয়েছেন। "আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্

করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'।" একই প্রসঙ্গে বাঘা হাঙরের সঙ্গে থ্যাবড়া হাঙরের কল্পিত কথোকথনের বর্ণনাটি যেমন সরস তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। "(বাঘা) নিশ্চিত বলতো, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদু সুগন্ধ মাংস তার, কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙর-গিরি করচি, কত রকম জানোয়ার—জেন্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেচি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না আমার—দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে' বলে, একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাতো। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ্গ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন-না-কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতোই দিতো।" জাহাজে উঠানোর পর হাঙরকে যখন মাথায় মারা হচ্ছে সেই দৃশ্যের বর্ণনাকালে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—"আর মেয়েরা—আহা কি নিষ্ঠুর, মের না ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়বে না।" পরিব্রাজকে দক্ষিণদেশবাসীর বর্ণনা দিয়েছেন 'নস্যদরবিগলিত নাসা,' আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে তমোগুণসম্পন্নের বর্ণনা দিয়েছেন—'ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না।' দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে আমিষ-নিরামিষের তর্ক প্রসঙ্গে এই রসিকতাটি কী চমৎকার—"আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন।" বিবেকানন্দের সরস মন ও সকৌতুক দৃষ্টির আরো কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনাটি সমাপ্ত

করি। "মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচত!! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত—উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।" "এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, কেমন?" সে বেয়াদবির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমরা ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশীই হয় না, কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?"

॥ পাঁচ ॥

অতঃপর স্বামীজি রচিত 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক্। 'বর্তমান ভারতে'র ভাষাগত প্রথম বৈশিষ্ট্য, এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন; দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এই গ্রন্থের তৎসম শব্দ ও সমাসের বাহুল্য; তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, স্বামীজির রচনার স্বাভাবিক সরসতা এখানে অনুপস্থিত। তিনটি বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করলেও এগুলি আসলে পরস্পরের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত। রচনাশৈলীর বিচারে বলা যায় তৎসম শব্দ-বাহুল্যের জন্যই সাধু ক্রিয়া পদের আবির্ভাব: ঘুরিয়ে বলা যায়, সাধুক্রিয়া-পদের জন্যই তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। সরস মন্তব্য, রসিকতা, যা স্বামীজির গুরুগম্ভীর রচনাকেও কৌতুকে উদ্ভাবিত করে দেয়, এই গ্রন্থে তার অভাবের একটি কারণ সাধুক্রিয়া-পদ এবং তৎসম শব্দের উপস্থিতি; কারণ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বিবেকানন্দের, রসিকতা-পূর্ণ মন্তব্য বাক্যাংশের সঙ্গে দেশজ শব্দ, গ্রাম্য ইডিয়মের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। কথ্যরীতি ও দেশজ শব্দের অভাবের জন্যই এই গ্রন্থে স্বামীজির স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তাও অনুপস্থিত। রচনাভঙ্গির দিক থেকে শুধু নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও পূর্বালোচিত গ্রন্থ তিনটিতে যে একটি হালকা চাল ছিল

এখানে তা অনুপস্থিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও, বর্তমান ভারতে স্বামীজি অত্যন্ত বেশী গম্ভীর। এখানে বিবেকানন্দ-চরিতের একটি পরিচয় পাই, পরিচয় পাই উদাত্ত-কণ্ঠ সন্ন্যাসীর, যিনি সমগ্র ভারত-বর্ষের আত্মিক নেতৃত্বদানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সহাস্য সদানন্দময় বিবেকানন্দের পরিচয় এখানে নেই। সে অভাব সত্ত্বেও এই রচনাটির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ রচনাটি না থাকলে বিবেকানন্দের যে উদাত্ত কণ্ঠ চিকাগো বক্তৃতা দিয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতো না। তাঁর জীবনী থেকে অভাবনীয় চারিত্র্য-শক্তি, পৌরুষ, বীরত্বের বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু 'বর্তমান ভারতে'র ছত্রে ছত্রে যেন সেই চারিত্র্যশক্তি, সেই পৌরুষ ও সেই বীরত্বের ওজস্বিনী কণ্ঠস্বর শোনা যায়—যে কণ্ঠস্বর জীবনচরিত শোনাতে পারে না।

ইতিপূর্বে বিবেকানন্দের সামগ্রিক দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বর্তমান ভারতে সেই সামগ্রিক দৃষ্টির পূর্ণতম প্রকাশ। এই প্রবন্ধকে বলা যেতে পারে অতীত ও বর্তমান ভারত। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতেতিহাস সম্বদ্ধভাবে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজশাহী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সম্বন্ধে, সেই ইতিহাসের বিবর্তনের প্রেরণা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী সেই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক নন, ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্ন-সমূহের সমাধান তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য, সেই ইতিহাসের সামগ্রিক রূপটিকে আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কৃত সামগ্রিক রূপ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামে যে বিখ্যাত নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তারো উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসধারার মধ্যে একটি নক্‌শা, একটি ঐক্যময় রূপ আবিষ্কারের প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতদর্শনে দেখিয়েছেন যে "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয়

সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।" বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টেনে এনেছেন এবং সেই বিচিত্র জাতির মধ্যে কী ভাবে সমন্বয় গড়ে উঠেছে তা দেখানোই রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-পরিক্রমার উদ্দেশ্য। অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের বিরোধের দিন থেকে এই ইতিহাসের বিবর্তনরেখাকে তিনি অনুসরণ করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয় সমাজ। আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ-বিস্তার উপলক্ষ্যে ঐক্যবিধানের দায়িত্ব তাদেরই উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি আরো দেখিয়েছেন, মহাভারত ও রামায়ণের মূল বিষয় ছিল সমাজ-বিপ্লব। একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত থেকে অরণ্যবাধা অপসারিত করে পশুসম্পদের স্থানে কৃষিসম্পদকে প্রবল করে তুললেন। কিন্তু আর্য-অনার্যের বিরোধ সে তো যুদ্ধের দ্বারা, নিধনের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না, তাই ধর্মের মাধ্যমে মিলনের চেষ্টা আরম্ভ হলো। তারপর তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখিয়েছেন; দেখিয়েছেন, বৌদ্ধধর্মের কাটাখাল দিয়ে নানা বিদেশী জাতি সমাজের কর্মস্থলে প্রবেশ করলো। বৌদ্ধপ্রভাবের পর ব্রাহ্মণের কাজ হলো, পূর্বধারাকে রক্ষা করা এবং নূতনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। বৌদ্ধ-প্রলয় অবসানে ব্রাহ্মণ চাইলেন সমাজকে কঠিনভাবে বাঁধতে। এতদিন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই শক্তির মধ্যে সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকতো। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বলহীনতায় পরে একচ্ছত্র ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপত্তির ফলে সমাজের ওজন ঠিক থাকলো না। তখনই অবক্ষয়ের পথে আরম্ভ হলো বৈদেশিক আক্রমণ। মুসলমান-পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর্য-অনার্যের বিরোধ ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শক্তিদ্বয়ের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সূত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দ বৈদিক যুগ থেকে ইংরেজ-আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূত্র আবিষ্কারে ব্যাপৃত। তাঁর দৃষ্টি একদিকে ব্যাপকতর,

আর একদিকে মাটির কাছাকাছি। বৈদিক যুগে কেন পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। পুরোহিতগণ ছিলেন রহস্যময় দৈববলের প্রতিভূ, রাজগণও তাই ছিলেন পুরোহিতের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাছাড়া কবিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ—সেই ব্রাহ্মণ-কবির সহায়তা না পেলে অমরত্ব অসম্ভব। "মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য চিরদিন অস্তমিত; কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিত-প্রমাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী-ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র-শেষ; পরীক্ষিৎ জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরপরিচিত।"

মার্কসীয় দর্শনানুসারে সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তন হয় সামাজিক শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্বের ফলে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদিও কোন উল্লেখ নেই, তবুও সামাজিক বিবর্তনে শ্রেণীসমূহের যে সর্বাধিক অবদান আছে, এ কথা এই অপেশাদার ঐতিহাসিকের চোখে যখন পড়েছিল তখন আমাদের দেশের পেশাদার ঐতিহাসিকের চোখেও বিশেষ পড়েনি। ভারত-বর্ষের ইতিহাসের ব্যাপক ধারাবাহিকতা আলোচনাকালে তাঁর গণতান্ত্রিক জনসাধারণ মানুষের কথা ভুলে যায়নি। সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শাসিত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যে প্রজাসাধারণের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, সে কথা তিনি বলেছেন। "কর-গ্রহণে রাজ্যরক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই—হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ।" ঋষির আদেশ, দৈবশক্তির নামে তখন রাজকার্য পরিচালিত হত। হয়তো অনেক কল্যাণকামী রাজা ছিলেন কিন্তু প্রজারক্ষক রাজার চেয়ে প্রজাভক্ষক রাজার সংখ্যা যে অধিক ছিল তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, সুশাসনের চেয়েও স্বায়ত্তশাসন শ্রেয়তর। কারণ কল্যাণকর অভিভাবকত্বও প্রজার স্বাবলম্বন-ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। "দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না ; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়।" শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি' পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক সমাজসমূহের যা ভিত্তিস্বরূপ, তার সামান্য আভাস ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ; এ কথা বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে আর্যসভ্যতার মধ্যে ঐক্য সাধনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়শ্রেণী এবং বৌদ্ধযুগ-অবসানে ব্রাহ্মণগণ প্রধান হয়ে সমাজকে কঠোর অনুশাসনে বেঁধেছিলেন। বিবেকানন্দের মত বিপরীত। তাঁর মতে বৈদিক যুগে ছিল ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, আর বৌদ্ধযুগে হলো রাজশক্তির প্রাধান্য এবং বৌদ্ধযুগের অবসানে 'ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারীভাবে উদ্যুক্ত' হয়েছিল। "এখন এই দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্যও নাই, ব্রহ্মবীর্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষত্রিয়বীর্য এ নূতন শক্তি-সঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল ; শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাতমাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি —চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগজাল-জড়িত হইয়া পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পতনের পথে মুসলমান শক্তির আবির্ভাব হলো। ইসলামধর্মগুরু মহম্মদ পুরোহিতশক্তির বিপক্ষে ছিলেন এবং তিনি ঐ শক্তির বিনাশের জন্য নিয়মকানুন রচনা করে গেছেন। মুসলমান রাজ্যে রাজা তাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি ধর্মগুরু। বিবেকানন্দের

মতে, "বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্যস্থাপন—এই দুইকালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল তাহারো কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা।" "এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদিপরিচালিত, রাজপুত্রাদি বাহু, জৈনবৌদ্ধ-রুধিরাক্ত-কলেবর, পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকার-যুগে চিরদিনের মতো প্রসুপ্ত রহিল।"

অতঃপর ভারতের ভাগ্যাকাশে একটি অভিনবশক্তির আবির্ভাব হলো—ইংরাজশাসনের। এই শক্তি অভিনব, কারণ এই শক্তি বৈশ্যশক্তি। শাস্ত্রবলে বলীয়ান ব্রাহ্মণের শাপের ভয়ে, সৈন্যসহায় রাজশক্তির ভয়ে ভারতবর্ষ ত্রস্ত হয়েছে, কিন্তু বৈশ্যবণিকের এই অমিত শক্তির অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন। কিন্তু বৈশ্যশক্তির এই আবির্ভাব শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নয়, সভ্যতার ইতিহাসেই প্রথম। বৈশ্যশক্তির এই জাগরণের পিছনে উৎপাদনব্যবস্থার যে পরিবর্তন সে সম্বন্ধে স্বামীজী কোন মন্তব্য করেননি বটে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেণীসমূহের উত্থান-পতনের ক্রমপর্যায়ের সূত্রটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তার নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি এই ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।" বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে যে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান এবং বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে যে বণিক্ ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তারের সম্পর্ক আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তার প্রমাণ উদ্ধৃত বাক্যটি—"যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত

হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাট্‌কুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।" এর থেকেই ইতিহাস সম্বন্ধে বিবেকানন্দের আধুনিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে।

সভ্যতার ইতিহাসে পুরোহিত-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চিন্তানায়কের অবদান সম্বন্ধে যে পংক্তিগুলি তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে সত্য সংহতরূপে প্রকাশিত, সেই পংক্তিগুলির রচনাসৌন্দর্য অনস্বীকার্য। "পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত: এজন্যই সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।"

ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির ও দর্শনের পার্থক্য বিবেকানন্দ একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বর্তমান এই অনুচ্ছেদে পাই—"ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাইত, আমিই শ্রেষ্ঠ।' কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে

পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"

এই পর্যন্ত ইতিহাস। তারপর তিনি জ্ঞাত ইতিহাসের ভিত্তিতে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ-গর্ভে অনুমান করেছেন শূদ্রশক্তির জাগরণ। ভবিষ্যতে শূদ্রশক্তির জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী যে মর্মে মর্মে সত্য হয়েছে এ কথা আমরা জানি—বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসই তার প্রমাণ। কবির অপর নাম ক্রান্তদর্শী, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ভবিষ্যতের গ্রন্থি-মোচন করতে পারেন। তা যদি হয় তবে ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে তাঁর দিব্যদৃষ্টির জন্যই তাঁকে কবি-আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রকর্মধর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া আকুল। সোশ্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"

অতীতের পর্যালোচনা, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার পর তিনি ফিরে এসেছেন বর্তমানে। ইংরেজশাসনের গুণগুলি তাঁর চোখ এড়িয়ে

যায়নি। রেলের জাল সমগ্র ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ করেছে। পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করছে। নূতন সভ্যতার আঘাতে আমাদের জাতীয় জীবনের জড়ত্ব মোচন হতে চলেছে। নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে ইংরেজেরা নেটিভ বলে ঘৃণা করায়, ভারতের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়েছে। কিন্তু অপর দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে ভারতবাসী হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, হয় অন্ধের মত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে অবজ্ঞা করছে, অথবা অন্ধের মত অনুকরণ করছে। "একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণবাহন, শতসূর্য-জ্যোতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপর দিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপর দিকে এই মহা-কোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।" এই অবস্থায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যে দ্বিধাগ্রস্ত হতবুদ্ধি হয়েছিল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

স্বামীজি একথা মনে করেন না যে পাশ্চাত্ত্য থেকে আমাদের নেবার কিছু নেই। দুই সভ্যতারই পরস্পরের কাছে শিক্ষণীয় অনেক আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কতটুকু আমাদের গ্রহণযোগ্য আর কতটুকু বর্জনযোগ্য তা স্থির করতে হবে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা। বিবেকানন্দ সুতীব্র ভাষায় অন্ধ পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ-মোহকে নিন্দা করেছেন। "পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা

নিষ্পন্ন হয় না।” কিন্তু বলবানের অনুকরণে দুর্বল বলবান হয় না। অনুকরণ-মোহাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন— “মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?”

গ্রন্থশেষে আগ্নেয় আবেগের চাপে সিংহগর্জনে স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন এই বীর সন্ন্যাসী। সমালোচক এই অনুচ্ছেদের আলোচনা করতে যেয়ে কখনো অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জের বিস্ফোরণের কথা বলেছেন, কখনো ঋক্‌মন্ত্রের কথা বলেছেন। এই বিখ্যাত অনুচ্ছেদের মধ্যে একই সঙ্গে স্বদেশপ্রেম, পৌরুষ, গর্বগৌরববোধ, ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মিশ্রণ হয়েছে, তার সঙ্গে ধ্বনিগাম্ভীর্য মিলিত হয়ে অনুচ্ছেদটি অনন্যসাধারণ মহিমা লাভ করেছে। সমগ্র অনুচ্ছেদটিই উদ্ধৃতির যোগ্য।

“হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী-শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই ‘মায়ের’ জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের

কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

॥ ছয় ॥

স্বামীজির বাংলা গ্রন্থ চারিটির আলোচনার পর বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর পত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। পত্র-সাহিত্যকে সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। অবশ্য যে কোন চিঠিই পত্র-সাহিত্য নয়। পত্রের আকারে প্রবন্ধ, বা নিতান্ত কেজো কথা চিঠি হয়ে ওঠে না। যে চিঠি এক-জনকে উপলক্ষ করে সর্বজনের জন্য রচিত হয়, একদিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে জেনে রচিত হয়, তা বাণী হতে পারে, চিঠি সচরাচর হয় না। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের পত্রাবলীতে তাঁর মতামত পাই বটে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ পাই সেই প্রথম দিকের চিঠিগুলিতে যখন খ্যাতির বিড়ম্বনা তাঁকে বিব্রত করেনি। পত্রাবলী তখনই সাহিত্য হয়ে ওঠে যখন তা রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশক হয়। আসল চিঠিতে সাহিত্যরস সৃষ্টি হয় প্রধানত পত্রপ্রেরকের ব্যক্তিত্ব ও অপ্রধানত পত্রপ্রাপকের ব্যক্তিত্বের রসায়নের ফলে। চিঠিতে লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কারণ একজনকে মাত্র লক্ষ্য করে লেখক সেখানে অসংকোচে আত্মোন্মোচন করতে পারেন—বহু জনের কৌতূহলী চক্ষু লেখকের ব্যক্তিত্বকে সেখানে বিব্রত করে না। অবশ্য যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, তাই একই জনের নানা জনের উদ্দেশে লেখা চিঠির স্বাদ পৃথক্ হয়। যদিও আধুনিক সমালোচক বলেন সাহিত্যের কাজ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, ব্যক্তিত্বের বিনাশ কিন্তু এক বিশেষ অর্থে সাহিত্য রচয়িতার আত্মার মুকুর। চিঠি সেই ব্যক্তিত্বের মুকুর বলেই পত্রাবলী সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হয়।

বিবেকানন্দের অনেক পত্র-সাহিত্য এই গুণে গুণী। জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী তত নয়, কর্মযোগী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই পত্রগুচ্ছে আমরা যত পাই। কিন্তু এই পত্রাবলীর মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তি-পুরুষের সন্ধান এবং পত্রাবলীর সাহিত্যিক গুণ বিচারের পূর্বে এই পত্রাবলী সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি তথ্য পরিবেষণ করা প্রয়োজন।

উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত স্বামীজির বাণী ও রচনার নূতন সংস্করণে আমরা মোট ৫৫২টি পত্র পাই এবং এগুলির রচনাকাল ১২ই আগস্ট ১৮৮৮ থেকে ১৪ই জুন ১৯০২, প্রায় তের বৎসরব্যাপী। এই পত্রাবলীর মধ্যে যেগুলি ১৮৯৩ সালের পূর্বে রচিত সেগুলিতে প্রায় সর্বত্র সাধু ক্রিয়া-পদের ব্যবহার, পরবর্তী পত্রাবলীতে স্বামীজি সাধারণ চলিত ক্রিয়া-পদই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পরবর্তী-কালেও ব্যতিক্রমস্বরূপ পুরাপুরি সাধু ভাষায় লিখিত চিঠি পাওয়া যায়। আবার এমন বহু চিঠি দ্বিতীয় অংশে আছে, যেখানে একই চিঠির মধ্যে, কখনো কখনো একই বাক্যমধ্যে তিনি সাধু ও চলিত ক্রিয়া-পদ একত্র ব্যবহার করেছেন। বহু সংখ্যক চিঠির মধ্যে এমন ক্রিয়াপদ-বিভ্রাট ঘটায় সহজেই অনুমান করা যায় এই পত্রগুলি সামান্য অবসরে অত্যন্ত দ্রুতবেগে লিখতে হয়েছে এবং দ্রুততা ও ব্যস্ততা-জনিত অনবধানতায় এই ক্রিয়া-সংকরত্ব সম্ভবপর হয়েছে। অর্থাৎ পত্রের ভাষাকে, বাক্যবিন্যাসকে মার্জিত করার কোন অবকাশ তিনি পাননি, গলিত লোহাকে চিন্তা ও অবসরের শীতলতা দিয়ে সাহিত্যিক আকার দেবার সুযোগ পাননি। সুতরাং এই পত্রাবলীর মধ্যে যদি কোন সাহিত্যিক গুণ থেকে থাকে, তবে তা আছে পত্র-রচয়িতার চৌম্বক-ব্যক্তিত্বের বলে, একটি অনন্য-সাধারণ জীবনের স্বরচিত দলিল হিসাবে, এবং পত্রাবলীকে সাহিত্য করার সমস্ত রকম চেষ্টার অভাব সত্ত্বেও। পত্রাবলীকে তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাহন রূপেই নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও যে অনেক

চিঠি সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তার জন্য তাঁর দিক থেকে কোন সচেতন প্রয়াস ছিল না। যে হেতু তিনি রসিক ছিলেন, শিল্প-প্রেমিক ছিলেন, সন্ন্যাসী হয়েও সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন, যে হেতু তাঁর পত্র-প্রাপকদের তিনি ভালোবাসতেন, সেইজন্য তাঁর দিক থেকে প্রয়াস ব্যতিরেকেই এই পত্রাবলীর অনেকগুলি সাহিত্য-পদবাচ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে যখন তিনি বিদেশে খ্যাতনামা হয়েছিলেন, দেশে শ্রুতকীর্তি হয়েছিলেন, তখন অবাঙালী ও অভারতীয় বহু শিষ্য, বহু অনুরাগী তিনি পেয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রাবলী সবই ইংরেজিতে। স্বামীজির ভাষার অনুকরণে সেই ইংরেজি পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ যদিও সংগৃহীত হয়েছে, তথাপি এই আলোচনা স্বভাবতই তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত পত্রাবলীর। স্বামীজির বাংলা পত্রাবলী সম্বন্ধে আরো একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। শেষ দিককার বাংলা চিঠিতে তিনি প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, এমন সব শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ খুব দুর্লভ নয়। 'Pointed এবং thrashing', chimney etc., social, expensive, damned malarious, strike, phase—এই রকম অজস্র শব্দ পাই। কখনো কখনো সম্পূর্ণ একটি বাক্য ইংরেজিতে লেখা, বিরল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ইংরেজিতে লেখা। কিন্তু প্রথম দিককার লেখায় ইংরেজী শব্দের এমন প্রাচুর্য দেখা যায় না। এর কারণ কি? শিক্ষিত বাঙালী বহু সময় ইংরেজি-বাংলায় মেশানো যে খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করে, সেই বিচিত্র ভাষার প্রতি অনুরাগ নিশ্চয়ই এই ব্যাপারের কারণ নয়। বিবেকানন্দের চরিত্রের পক্ষে সেই খিচুড়িয়ানায় সায় দেওয়া অসম্ভব ছিল। মনে হয় ইউরোপ-আমেরিকা ও বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জনের ফলে তিনি যে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে বাধ্য হতেন, অবাঙালী শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে (এবং উদ্বোধন কার্যালয় সংস্করণের সংগ্রহের

হিসাবে ইংরেজি চিঠির সংখ্যা শেষদিকে বাংলা চিঠির অনেক গুণ বেশী), সেই কারণে বাঙালী পত্র-প্রাপকদের কাছে চিঠি লিখতে গেলেও ব্যস্ততায়, আবেগের চাপে ইংরেজি শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য কলমে চলে আসত এবং দ্রুত প্রয়োজন যেহেতু দ্বিতীয় চিন্তার বা সংশোধনের সুযোগ দিত না, সেই কারণে চিঠিগুলিকে কণ্টকিত ও তাদের সাহিত্য-গুণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ঐ ইংরেজি শব্দগুলির সঙ্গিন উঁচিয়ে আছে। এই অনুমান আরো সত্য মনে হয় যখন দেখি প্রথম দিকে যখন তিনি বেশী ইংরেজি চিঠি লিখতেন তখনকার বাংলা চিঠিগুলির মধ্যে ইংরেজি শব্দের আবির্ভাব কম লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে শুধু ইংরেজিতে যে চিঠি তিনি লিখছিলেন প্রচুর পরিমাণে তাই নয়, বাংলা দেশের বাইরে, স্বদেশে ও বিদেশে ক্রমাগত ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেই ঘটনার প্রভাবও নিশ্চয় পড়েছে। কোন কোন বিরলক্ষেত্রে হয়তো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে বা রস-সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে—যেমন বলরাম বাবুকে লেখা একটি পত্রে—"আপনি খালি টাকা বাঁচাইতে যদি চান, lord কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ু পরিবর্তন) করাইবেন ? যদি এতই lord-এর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না।"—কিন্তু এমন ক্ষেত্রের সংখ্যা কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার পত্রাবলীর সাহিত্যশ্রী বর্ধিত না করে, বরং তার হানি ঘটিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি এই পত্রাবলীর অধিকাংশই এক কর্মীর চিঠি। বিবেকানন্দের কর্মী-ব্যক্তিত্ব এই পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সংগঠন ব্যাপারে দেশে থাকতে বা বিদেশে বাসকালে তাঁকে চিন্তিত দেখি। অর্থ সংগ্রহ তিনি করেছেন এই উদ্দেশ্যেই দেশে-বিদেশে বক্তৃতার মাধ্যমে। স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি কেনার ব্যাপারে তাঁকে নির্দেশ দিতে দেখি ; সেই জমি কেমন

হবে, বাড়ি কেমন উঠবে এই সমস্ত ব্যাপারে শিষ্যবর্গের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখি। অর্থসংগ্রহের জন্য নানা জনের কাছে যে আবেদন পত্র পাঠানো হবে তার খসড়া পর্যন্ত তাঁকে তৈরী করতে দেখি। শিষ্যবর্গের মধ্যে বারংবার তিনি কর্মবিভাগ করে দিয়েছেন—কেউ নেবে অর্থ-ভাণ্ডারী কাজ, কেউ নেবে চিঠিপত্র লেখার কাজ, কেউ নেবে আভ্যন্তরীণ সংগঠনের কাজ। তিনি পত্রাবলীর মাধ্যমে শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন শিক্ষা-বিস্তারের কাজে। গরীব ছাত্রেরা যদি বিদ্যালয়ে না আসে তবে বিদ্যাকেই নিয়ে যেতে হবে তাদের বস্তিতে, তাদের ঘরে। মঠের গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী পর্যন্ত তিনি রচনা করেছেন। কোন রকমে যাতে সংগঠনে কলুষ প্রবেশ না করে এই ছিল তাঁর সব সময়ের চিন্তা। একদিকে "উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, Onward," বলে যেমন তিনি সন্ন্যাসী-শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, তেমনি মঠের রান্নার ব্যবস্থা, শিষ্যদের স্বাস্থ্য এই সমস্ত বিষয়ে পর্যন্ত তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু তিনি শুধু কর্মী নন, তিনি জ্ঞান-সাধকও। তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং সম-মনা ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি শাস্ত্র-আলোচনা করবেন, আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহের চর্চা করবেন এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু সীমাবদ্ধ অর্থে, যাকে শাস্ত্রালোচনা বলে তার পরিমাণ পত্রাবলীর মধ্যে খুব বেশী নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আধ্যাত্মিক প্রশ্নে তিনি বিশ্বাস অপেক্ষা জ্ঞানের মনীষার উপর নির্ভর করতেন বেশী। শাস্ত্রে যা আছে তাকে তিনি বিনা প্রশ্নে শিরোধার্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যুক্তির কষ্টিপাথরে শাস্ত্রীয় বক্তব্যকে যাচাই করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনি জনৈক পত্র-প্রাপককে এই প্রশ্নগুলি করেন, "বেদান্ত সূত্রে বেদের কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই কেন? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ-প্রামাণ্য 'পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্' বলিয়া; ইহা কি পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ে যাহাকে argument in a circle বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে?....বেদান্ত বলিলেন, বিশ্বাস

করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্কজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মত স্থাপনেই পাগল;...যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না, আগের বিধি প্রবল?" এই সমস্ত প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মনীষার পরিচয় পাই। তিনি আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে প্রবেশকালেও বুদ্ধির আলোক পরিত্যাগে রাজি হননি। আর ধর্ম বলতে এই কর্মযোগী কর্মকেই বুঝেছিলেন। "আমি একমাত্র কর্ম বুঝি—পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।....অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্মে ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তদবলম্বনে কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ কর্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব।"

ধর্মের বাহ্য আড়ম্বরে বা অনুষ্ঠানে জড়িত না করে মানব-সাধারণকে করুণা ও মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজির যে সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ অন্যত্রও পাই। যদিও তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে সব সময় সুখকর হয়নি, তথাপি বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অব্যাহত ছিল। ধর্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ধর্মের সারাংশ যে অনেক মূল্যবান এ কথা বিবেকানন্দ কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন—এই কারণেই বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিব্বতের তন্ত্রাচার, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ দশা তিনি একটি চিঠিতে আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী পতনের বর্ণনা দেবার পর তিনি এই চিঠিতে বুদ্ধদেবের মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। "যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ

হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy. তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।···উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart অণুমাত্র পান নাই; কেবল dry intellect—তন্ত্রের ভয়ে, mob-এর ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাতসুদ্ধ কেটে ফেললেন,····বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি।" আধ্যাত্মিক সমুন্নতিলাভের প্রধান উপায় যে হৃদয়ের পথ, বিবেকানন্দের মতে, তা উপরের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। পরোপকার কর্ম, জ্ঞানমনীষা সেই পথে আমাদের অগ্রসর করে, কিন্তু যে হৃদয়বান নয় তার পক্ষে ধার্মিক হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধদেব-চরিত্রে যা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, জনসাধারণের বোধ্য চলিত ভাষায় ধর্মের মূলশিক্ষা প্রচার, অপার সহানুভূতি এবং আশ্চর্য হৃদয় যেগুলি তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই তিনি একটি চিঠিতে ঘোষণা করেছেন—"আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।" এই গ্রাম্য সরল ব্রাহ্মণের সাদাসিধা উক্তির মধ্যে তিনি ধর্মের সার-কথা শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁর ভালোবাসার ব্যাপকতা তাঁকে স্তম্ভিত করেছিল। তাই যে কারণে তিনি শ্রীবুদ্ধের পদানত ঠিক সেই একই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম। তাই তিনি বলেন, "তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক লইতে রাজি আছি।····আমি

রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি।" "রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy জগতে আর নাই।"

ধার্মিকের মধ্যে dry intellect নয়, হৃদয়ের অনুসন্ধানী ছিলেন তিনি। কারণ, তিনি যেমন কর্মী ছিলেন, জ্ঞানসাধক ছিলেন, তেমনি ছিলেন হৃদয়বান। বৈদান্তিকের মত শুষ্ক বুদ্ধির সাধনায় নিযুক্ত হয়ে পৃথিবীর মানুষের রোগ শোক দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নির্লিপ্ত হয়ে যেতে পারেননি। তিনি সংসারত্যাগী কিন্তু মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের দুর্দশায় তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। "ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর। কখন কখন কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া; তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এ দেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।" শুধু পূর্বাশ্রমের আত্মীয়বর্গের জন্য যে তাঁর মমত্ব বা সহানুভূতি ছিল তা নয়, পরবর্তীকালে বারংবার তাঁর অপরিসীম হৃদয়বত্তার পরিচয় পাই। যখনই কোন গুরুভ্রাতা বা শিষ্য অসুস্থ তখনই তিনি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। তাই তিনি মঠবাসীর খাওয়াদাওয়ার, তাদের স্বাস্থ্যের

তন্নতন্ন খবর নেন। এই স্নেহমমত্ব, একে তিনি কখনো কখনো হৃদয়-দৌর্বল্য আখ্যা দিয়ে নিজেকে তিনি তিরস্কার করছেন ; কিন্তু এই হৃদয়ই তাঁকে কর্মীসন্ন্যাসী করেছে, সুতরাং তিনি যতই আত্মসমালোচনা করুন না কেন, এই স্নেহমমত্ব তিনি বিসর্জন দিতে পারেননি।

রামকৃষ্ণের মত তাঁর মধ্যেও অপূর্ব অহেতুকী দয়া ও intense sympathy ছিল বলেই নারীজাতির সমাজমর্যাদাদানে তিনি সমুৎসুক ছিলেন, জাতিভেদ প্রথাকে তিনি নিন্দা করেছেন এবং অনেক সনাতন-প্রথা-বিরুদ্ধ কথা তিনি বলেছেন। নারীজাতির অবস্থা আলোচনা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন। ইউরোপ, বিশেষ করে আমেরিকার নারীসমাজের স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা যখন তিনি দেখেছেন এবং তার সঙ্গে যখন আমাদের দেশের নারীসমাজের মর্মান্তিক দুরবস্থার তিনি তুলনা করেছেন তখন তাঁর মন বেদনায় পরিপ্লুত হয়ে গেছে। আমরা মহাপাপী ; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে আমাদের অধোগতি হয়েছে। সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, আমরা শুধু ঘৃণা করে এসেছি, ওরে চণ্ডাল দূরে সরে যা, কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করেছে, ইত্যাদি। নিতান্ত বালিকাকে যে সমাজ 'দশ বৎসরের বেটা-বিউনিতে' পরিণত করেছে সেই সমাজের প্রতি তাঁর অগ্নিগর্ভ ঘৃণা। "আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী ?" প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীসমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে তিনি বলেছেন—"যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।" আমেরিকার নারীসমাজ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—"এদেশের মেয়ের মত মেয়ে

জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, দয়াবতী—মেয়েরাই এ দেশের সব।” তারা সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র এবং “আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন”।

এই মমত্ববোধ, এই হৃদয়বত্তা তাঁর মধ্যে ছিল বলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার সামান্যতম নিদর্শনও সহ্য করতে পারেননি। আচার্য শঙ্কর, শূদ্রের বেদ পাঠে অধিকার নেই বলে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশের পিছনে বৈদিক কোন সমর্থন আছে কি না, এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন এবং সেই নির্দেশকে খণ্ডন করার জন্য তিনি প্রয়াস করেন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, “স্পার্টানরা যে প্রকার হেলট্ অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই।” শুধু সামাজিক জাতিভেদ নয়, অর্থ নৈতিক জাতিভেদও তাঁর চোখ এড়ায়নি। “যদি কারুর আমাদের্ দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নেই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশে (অর্থাৎ আমেরিকায়) সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities আছে! আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে···গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা।····হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছো, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছো, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, ‘দূর দূর’ কর। আমরা কি মানুষ?····আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।”

দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক পতিতা রমণী আসে বলে অনেক ভদ্রলোকের সেখানে যাবার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে, এই মর্মে

চিঠি পেয়ে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর উদার মন, হৃদয়বত্তা এবং মানুষে-মানুষে সর্বপ্রকার ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণার সম্যক্ পরিচয় পাই। "বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানদের জন্য তত নহে। মেয়ে-পুরুষে ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐ রূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?....যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটোলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতোই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।" জাতিভেদ-মূলক তুচ্ছতম প্রথাও তাঁর দ্বারা নিন্দিত হত। তাঁর জনৈক অব্রাহ্মণ মহিলা অনুরাগী পত্রশেষে 'দাসী' স্বাক্ষর করায় তিনি সেই স্নেহাস্পদাকে নিম্নোক্তরূপ উপদেশ দিয়েছেন—"তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ-মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষ ভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা—ইন্দুমতী মিত্র ইত্যাদি।"

তাঁর মধ্যে এই উদারতা ছিল বলেই তাঁর মধ্যে কখন কখন এমন আধুনিক দৃষ্টির পরিচয় পাই যে বিস্মিত হতে হয়। এরই ফলে তাঁর মন ছিল গোঁড়ামি-মুক্ত; প্রথাবিরুদ্ধ, সনাতনধারা-বিরুদ্ধ

মতামত এই কারণেই তিনি প্রকাশ করতে পারতেন। এই হৃদয়-বান মানুষটি মনুষ্যত্বের নির্যাস যাচাই করে মানুষকে বিচার করতেন, মানুষের মূল্যায়ন করতেন, কোন হৃদয়হীন প্রথা বা নিয়মের বিচারে নয়। একটি পত্রে একজন ভক্ত মহিলার কথা আমরা জানতে পাই। এই মহিলা স্ত্রীর মতই একজনের সঙ্গে থাকতেন, এমন কি সেই ভদ্রলোকের মন্ত্রগুরুও জানতেন মহিলাটি তাঁর স্ত্রী। পরে সেই লোকটি "কোথা হইতে একটা 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বামনী আনিয়া ঘরে ঢোকায়, সেই সকল কারণে তিনি তাহাকে ফেলিয়া পলান।··পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্মচারীরাও ইহাকে শয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, 'তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে'।" যে সম্পর্ককে সমাজে বিবাহ বলে না সেই সম্পর্কও যে পবিত্র হতে পারে এই কথা বিবেকানন্দ এই দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করেছেন। পূর্বে যে তিনি উক্ত মহিলার চরিত্রে সন্দিহান হয়েছিলেন তার জন্য তিনি তাঁকে অসংখ্য প্রণাম জানাচ্ছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সমাজবিগর্হিত সম্পর্কের মধ্যে এমন পবিত্রতার অস্তিত্বের বিশ্বাস সেদিনের পক্ষে সুদুর্লভ ব্যাপার ছিল। "তিনি মিথ্যাবাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম। এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যাভিচারিণীতে সম্ভবে না।"

যে ভালোবাসা তাঁর ব্যক্তি-মানুষের প্রতি ছিল সেই ভালোবাসা তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই মহাপুরুষের বজ্রগর্ভ দেশপ্রেম ব্যাখ্যা বা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দেশপ্রেমের একটি বৈশিষ্ট্য এই পত্রাবলীতে লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের

মুদ্রার বিপরীত পিঠ ঘৃণা। দেশের অন্যায় অনাচার মেরুদণ্ডহীনতা, ছুতমার্গ, সর্বপ্রকার কলুষকে তিনি ঘৃণার আগুনে তৃণসম দগ্ধ করেছেন। এই ঘৃণার আগুন যত তীব্র হয়েছে তাঁর দেশপ্রেমও তত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কি অনলস্রাবী সেই ঘৃণা! দেশকে ভালোবাসি বলে, অন্ধের মত দেশের সব কিছুকেই সমর্থন করে যেতে হবে এই অন্ধ দেশপ্রেম বিবেকানন্দের ছিল না। ভারতবর্ষের একটি শাশ্বত আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে ছিল, তাঁর মনের মধ্যে ছিল নবীন ভারতবর্ষের এক কল্পনা, সেই আদর্শ-কল্পনা থেকে যখনই তিনি বিচ্যুতি দেখতেন তখনই তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণার খড়্গ ঝলসিত হয়ে উঠতো। "আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility বলে ...।" অন্যত্র বলেছেন, "বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়!....রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাঁকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস্, ভগবানের মুখ দেখ।"

পত্রাবলীর মধ্যে এই সমস্ত দিক আছে। এক একটি চিঠি বিবেকানন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের এক একটি দিককে আলোকিত করে তোলে। সর্বোপরি আছে এই কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগী মানুষের অন্তরের গভীর রসবোধ, যা সেই দিব্য মুখশ্রীকে সর্বদাই কৌতুকে ও স্মিতহাস্যে মধুর করে দেয়। পত্রাবলী থেকে সেই কৌতুকপ্রিয় সরস-মনের কয়েকটি উদাহরণ দিই। গভীর কথার মধ্যে পর্যন্ত অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সরস মন্তব্য করে বসেন—"যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর।" আমেরিকায় শৈত্যের বর্ণনা করতে যেয়ে বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন—"বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ দাগে থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান।" একই চিঠিতে এই বিষয়ে অন্যত্র মন্তব্য করেছেন—"বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু অধিক কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরমকাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্ছেন।" রসসৃষ্টির কাজে সম্মানসূচক ক্রিয়া-পদকে তিনি বহুলক্ষেত্রে বড় চমৎকারভাবে ব্যবহার করেন। এই রসিক মানুষ শুধু যে পরিবেশের অসঙ্গতি নিয়ে বা অন্য মানুষকে নিয়ে কৌতুক করেছেন তা নয়, নিজেকে নিয়েও তিনি কৌতুক করেছেন। নিজেকে নিয়েও যে তাঁর কৌতুক করতে বাধত না, এতেই তাঁর উচ্চশ্রেণীর রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিই। তখন মার্কিনদেশের শহরে শহরে তিনি ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন—"একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো,

তোর পেটে এতও ছিল' !! এরা সব বলে, পুঁথি লেখো ; একটা এইবার লিখতে-ফিকতে হবে দেখছি। ঐ তো মুশকিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হাঙ্গাম করে বাবা!' মার্কিনদেশে যে হেল-দম্পতির অতিথি ছিলেন তাঁদের বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে বিবরণটিও খুব সরস—"চারজনেই যুবতী—বে থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয়ত পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী জোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ্' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানুষের ঝি, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল'—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধ হয় বে থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।" সমস্ত অনুচ্ছেদটিই সরস, সাহিত্যগুণান্বিত ; তার মধ্যে আবার নিজেকে জড়িত করে যে শেষ দুটি বাক্য লিখেছেন তার সরসতা ও কৌতুক অসাধারণ।

॥ সাত ॥

বিবেকানন্দের সমগ্র বাংলা রচনাবলীর এই বিস্তারিত পরিচয়-দানের পর আমরা স্বামীজির রচনারীতি, তাঁর গদ্যশৈলী সম্বন্ধে আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারি। পূর্বেই বলেছি স্বামীজির রচনা-বলীর মধ্যে তিনি গ্রন্থ, 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' চলিত ভাষায় লেখা এবং 'বর্তমান ভারত' সাধু ভাষায় লেখা এবং চিঠি-পত্রের মধ্যে কিছু চলিত, কিছু সাধু ভাষায় লেখা। যদিও স্বামীজি সাধু ভাষাও ব্যবহার করেছেন এবং সেই সাধু ভাষায় যদিও বিশিষ্টতা আছে, তথাপি চলিত ভাষায় গদ্যরচনায় তাঁর একটি

উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা প্রথমে তাঁর চলিত ভাষায় রচিত গদ্যের আলোচনা করব। কিন্তু চলিত ভাষা ব্যবহারে বিবেকানন্দের কৃতিত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে চলিত ভাষা ব্যবহারের যে ধারা তার আলোচনা করা দরকার এবং সেই পরিপ্রেক্ষিত সামনে থাকলে এই ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অবদান উপলব্ধি করা সহজ হবে।

১৮৫৪ সালে রাধানাথ সিকদার ও প্যারিচাঁদ মিত্রের যুগ্মপ্রচেষ্টায় 'মাসিক পত্র' নামে পত্রিকা প্রচারিত হল চলিত ভাষা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। চলিত ভাষা প্রচারের ব্যাপারে এই বান্ধব-যুগলের উৎসাহ সম্বন্ধে খুব চমৎকার কাহিনী আছে—অকৃতদার রাধানাথ পত্রিকা প্রকাশের পর দিন ভোরে উঠে জানতে যেতেন প্যারীচাঁদের স্ত্রী পত্রিকা পাঠ করে কী বলেছেন। অন্তঃপুরের মহিলাদের বোধগম্য ভাষাকেই এই পত্রিকা সাহিত্যের ভাষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে আলালের ঘরের দুলাল নামে একটি নক্‌শা প্রথম প্রকাশ করলেন। বলা যায়, মোটের উপর, এই গ্রন্থেই প্রথম চলিত ভাষার আবির্ভাব। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—"আরে বামুন! তুই যদি হ, য, ব, র, ল শিখাইতে আমার নিকট আসবি, ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল-কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে, ছাদের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়িব যে, তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।" এই একই বইয়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে তারতম্য দেখা যায়। একদিকে—"রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড় ঢিলে দেন, হচ্ছে হবে, খাচ্ছি খাব, বলিয়া অনেক বেলায় আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মালাভ ভাল

বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বা বহি পড়েন।" অন্যদিকে পাই —"মুইতো এ সাদি করতে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটী না আনলে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিলিবে....।" প্রথমত লক্ষণীয় ক্রিয়া-পদের বিভ্রাট, দ্বিতীয়ত লক্ষণীয় শব্দচয়ন ও ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। চলিত ভাষার ব্যবহার তখন পরীক্ষামূলক ছিল বলে এই সমস্ত অপরাধ সহজেই ক্ষমা করা চলে। প্যারীচাঁদ যে পরীক্ষামূলকভাবে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তিনি পরবর্তী রচনায় সাধুভাষা ব্যবহার আরম্ভ করলেন।

এর পরে এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। যিনি সংস্কৃতবহুল ভাষায় মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করলেন, তিনিই বিস্ময়কর ভাবে হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রকাশ করলেন ১৮৬২ সালে। বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষার ইতিহাসে এই গ্রন্থটি একটি সন্দেহাতীত উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কলকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থের গদ্যে প্যারীচাঁদের দুর্বলতা নেই—ক্রিয়াপদের বিভ্রাট নেই, শব্দচয়নে কোন স্তরচ্যুতি নেই। দুই একটি উদাহরণ দিলে এই ভাষার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। "পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারোমাস এখানেই কাটান। দুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা--দেখলেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্তিমান মা!" একটি রেল স্টেশনের বর্ণনা—"বাবাজীরা যে সকল এস্টেশন পার হতে লাগলেন, সেই সকলেরই এস্টেশন মাস্টার, সিগনেলার, বুকিংক্লার্ক

ও অ্যাপ্রিনটিসদের এক প্রকার চরিত্র, এক প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে 'পুলিসম্যান পুলিসম্যান' করে চিৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্ছেন।....কোথাও বাঙালগোছের যাত্রী ও কোমরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর টিকিট নিজে নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্য পেড়াপিড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন এস্টেশনের এস্টেশন মাস্টার কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে চীনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—অ্যাপ্রিনটিস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে, হঠাৎ হুজুরের কমাণ্ডিং আস্‌পেক্‌ট দেখে একদিন 'ইনি কে হে?' বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইসপর কত্তে পারে। বলতে কি, হুজুর তো কম লোক নন—দি এস্টেশন মাস্টার।"

এর পর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি দুটি স্বতন্ত্র ভাষা পদ্ধতির অস্তিত্ব—"একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম কথ্যভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।"—স্বীকার করার পর প্যারীচাঁদের পরীক্ষাকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন—"টেকচাঁদ ঠাকুর ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।" তিনি আরো বললেন, "যে ভাষা অধিকাংশ পাঠকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। ....ইংরেজি, ফার্সি, আর্রবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" এই মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। ভাষা সম্বন্ধে এখানে যে মত বঙ্কিম ঘোষণা করেছেন তাতে দেখা যায় বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে

তাঁর মতের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কথ্যরীতিকে ব্যবহার করার জন্য প্যারীচাঁদকে অভিনন্দিত করে কেন তিনি হুতোমি ভাষাকে নিন্দা করেছেন তা বোঝা কঠিন—বিশেষত যখন ক্রিয়াবিভ্রাট এবং ভাষায় আদর্শবিপর্যয়ের যে দুর্বলতা যা আলালে দেখা যায় সেই সব দুর্বলতা থেকে হুতোম প্যাঁচার নক্সা মুক্ত। উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটির মধ্যে বোধ হয় সেই কারণ নিহিত—এই কারণ শিল্পগত নয়, রুচিগত। বঙ্কিমের রুচিশীল মন হুতোম প্যাঁচার তথাকথিত অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দিতে পারে নি।

কিন্তু বাংলা ভাষায় কথ্যরীতির যে ঐতিহ্য তার পথপ্রদর্শক প্যারীচাঁদ এবং কালীপ্রসন্ন হলেও তাদের ব্যবহৃত ভাষা চলিত ভাষার আদর্শস্বরূপ গৃহীত হলো না। কথ্যভাষায় লিখিতে গেলে যে পরিশ্রম চর্চা ও ভাষাদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা প্রয়োজন এই লেখকদ্বয়ের মধ্যে তা বর্ত্তমান ছিল না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ইতর জনের মুখের ভাষায় গদ্যভাষা গঠন করা অনুচিত; কথ্য-ভাষার গদ্য হবে সাধুজনের মুখের ভাষায় গঠিত। প্যারীচাঁদ বুঝতে পারেন নি যে, কৃষ্ণমোহনের নির্দেশ অনুসারে কলকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষার ভিত্তিতে গদ্য রচনা করা দরকার। দেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি কথ্যভাষার আদর্শ তখন দাঁড়িয়ে যায় নি, তাই কখন চব্বিশ-পরগণার ইতর মানুষের মুখের ভাষা, কখনও কলকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের, কখনও নব্য ইংরেজি শিক্ষিতদের মুখের ভাষা তাঁরা অনুসরণ করেছেন। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন—এই দুইজনের ব্যবহৃত গদ্যরীতির প্রধান দুর্বলতা এই গদ্যরীতির আঞ্চলিকতা। দুইজনেই অপভাষা বা Slang অত্যন্ত বেশী ব্যবহার করেছেন—যা আধুনিক রুচিকে পীড়া দেয়। রুচির এই অভাবের ফলে তাঁদের গদ্যে সেই নৈতিক মেরুদণ্ড নেই যা গদ্যকে পেশল করে। এই নৈতিক মেরুদণ্ডের অভাবে তাঁদের গদ্য ভঙ্গুর, পল্‌কা—রম্যরচনা বা নক্‌শায় ব্যবহৃত

হতে পারে কিন্তু গুরুতর আলোচনায় ব্যবহৃত হতে পারে না। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে একজন সমালোচক বলেছেন, "আদর্শ কথ্যভাষায় গদ্য গঠন করলে তবেই সেই গদ্য সমস্ত লোকের কাছে সমাদৃত হতে পারে। আর, আদর্শ কথ্যভাষা হচ্ছে শিক্ষিত জনের শিষ্ট সমাজে বলা মুখেরই ভাষা; কারণ এই শিষ্ট মুখের ভাষা নেহাত খেলোও নয়, আবার বেশী জটিলও নয়। এতে সূক্ষ্ম ও উচ্চভাব সহজেই রূপায়িত করা যায়, অথচ দুর্বোধ্যতার সৃষ্টিও হয় না। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন হয়ত বুঝতে পারেন নি যে, আদর্শ কথ্যভাষার আশ্রয় কোথায়।" বোঝা কঠিন ছিল, কারণ মনে রাখা দরকার তখনও দেশের আদর্শ কথ্য-ভাষা দাঁড়িয়ে যায় নি।

এই দুর্বলতা উপলব্ধি করে বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ও বিদ্যাসাগরী ভাসার সমন্বয় ঘটিয়ে এমন এক লেখ্যভাষার সৃষ্টি করলেন, যার দূরত্ব কথ্যভাষা থেকে বেশী নয়। বিদ্যাসাগরী রীতি বা সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা গদ্যরীতি দুর্বোধ্যতা-পীড়িত ছিল, মানুষের কথোপকথনের ভাষা থেকে সেই ভাষা যথাসম্ভব দূরে ছিল। আর আলাল-হুতোমী ভাষা সহজবোধ্য হলেও আঞ্চলিক, কথ্যরীতির নিকটবর্তী হলেও গভীর ভাব-প্রকাশের অনুপযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাই মধ্যপন্থা নির্বাচন করলেন। তাঁর ভাষার সাধুক্রিয়াপদ বজায় থাকল বটে, কিন্তু শব্দনির্বাচনে তিনি স্বাধীনতার পরিচয় দিলেন—বিষয়ানুসারে তাঁর ভাষা তৎসম শব্দ-প্রধান, বা দেশী শব্দ-প্রধান। যদিও তিনি কথ্যরীতিকে সমর্থন করেছেন কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কথ্যভাষার প্রবল সমর্থক হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি সাধুভাষাতেই তাঁর রচনাবলী লিখেছিলেন।

সত্যকার সাহিত্যিক কথ্যরীতি প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই দুরূহ সাম্রাজ্য তিনি জয় করলেন মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ১২৮৬—৮৭ বঙ্গাব্দে ভারতীতে প্রকাশিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে।

পত্রাকারে রচিত বলে এ'গুলির মধ্যে যে informality আছে তার ফলেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চলিত ভাষায় এমন চমৎকার গদ্য লেখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যে দ্বিধার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চলিত ভাষার সমর্থক হয়েও চলিত ভাষায় লেখেন নি নিজে, সেই দ্বিধার দুষ্প্রভাব রবীন্দ্রনাথও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই পত্রাবলী বাদ দিয়ে তাঁর প্রধান গদ্যসাহিত্য সাধুক্রিয়ায় লেখা। যতদিন না প্রমথ চৌধুরীর উত্তেজনা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, ততদিন তিনি চলিত ভাষায় আর গদ্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। বিবেকানন্দের রচনাবলীর চলিত ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের গদ্যের কথা স্মরণে রাখা দরকার। সেই কারণে এই গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে। এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে চলছে তো চলছেই—সে কেমন একটা ভিজে-ভিজে ভাব। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানালার উপর টিপ্ টিপ্ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে, কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার করে এসেছে। ···সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের যে কী-একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুনতে গেলে বোধহয় microphone ব্যবহার করতে হয়। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।"

একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় সাহিত্যরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের

ভাষাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করার যোগ্য মনে করেছিলেন। হুতোমের ভাষা নয়, আলালের ভাষা নয়। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ভারতীতে ১২৮৬—৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের চলিত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ১৩০৫—১৩০৮ বঙ্গাব্দ। 'পরিব্রাজক' নামক রচনাটির পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রথমদিকে নাম ছিল বিলাত-যাত্রীর পত্র। এই পূর্বনামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্ত গ্রন্থটির নামের সাদৃশ্য স্বতঃপ্রকাশ। দুইটি গ্রন্থেরই বিষয়গত ঐক্য বর্তমান—প্রথমবার বিলাতযাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যদেশে যাত্রাকালে পত্রাকারে বিবেকানন্দের গ্রন্থ রচিত। দুইটি ভ্রমণকাহিনী—রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের মূল কথা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের আচারব্যবহার ইত্যাদির স্বাতন্ত্র্য, বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়ও তাই। দুজনের রচনাভঙ্গির মধ্যেও নিকট সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ দিই। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' থেকে—"সকাল-বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর। সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক নেই। আমার মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্য এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক!" 'পরিব্রাজক' থেকে—"জর্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্চেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জর্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী-ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে!" দুজনেরই রসবোধ তীব্র ছিল, সেইকারণে জীবনের যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা কৌতুকময় রসসামগ্রী খুঁজে পেতেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনার

মত এত সৌন্দর্য, এত লালিত্য বিবেকানন্দের রচনায় নেই, বিবেকানন্দের রচনা তুলনায় অনেক পরুষ। দুজনের কৌতূহলের বিষয়েও পার্থক্য আছে—একজন দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি জানায় উৎসাহী, অন্যজনের উৎসাহ সমাজজীবনে, নরনারীর সম্পর্কে। কিন্তু বিবেকানন্দ যে চলিত ভাষার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের ঐ কিশোর রচনাটি থেকে পেয়েছিলেন একথা বোধহয় নিশ্চিন্তে বলা চলে।

বিবেকানন্দ যে আলালী-হুতোমী ভাষা গ্রহণ করেন নি, তার অনেক কারণ আছে। বিবেকানন্দের সময়ে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের শিষ্টজনের ভাষা বাংলা চলিত ভাষারূপে অনেক পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। ফলে যে অসুবিধার সম্মুখীন প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন হয়েছিলেন, সে অসুবিধায় বিবেকানন্দকে পড়তে হয় নি। সেই কারণে তাঁকে ঐ দুইজন পথিকৃতের মত আঞ্চলিক ভাষা বা অপভাষার আশ্রয় নিতে হয়নি। একে বঙ্কিমের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে কুরুচির প্রভাব কমে আসছিল, তারপর বিবেকানন্দের ব্যক্তিজীবন ও চরিত্র সর্বপ্রকার কুরুচির বিরুদ্ধে। সুতরাং তাঁর পক্ষে আলালী-হুতোমী কুরুচিপূর্ণ গদ্যভাষার প্রভাব স্বীকার করা রুচিগত কারণেই সম্ভব ছিল না। রুচির দৃঢ় মেরুদণ্ডের অভাবে আলালী-হুতোমী ভাষা ভঙ্গুর, খেলো; সেই মেরুদণ্ডহীনতা বিবেকানন্দের গদ্যে নেই। কিন্তু ঐ দুই পূর্বসূরীর রচনার সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনার কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। তাঁদের মত বিবেকানন্দও ইংরেজি বা অন্য বিদেশী শব্দ ব্যবহারে অকুণ্ঠ ছিলেন—ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি অকাতরে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের মত তিনি বড় চমৎকার ভাবে মেয়েলি ইডিয়ম ব্যবহার করতে পারতেন। "পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্চে গা?" এই রকম বাক্য সহজেই আলাল বা হুতোমকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বাঙ্গালা ভাষা' নামক বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রবন্ধ দুটির মূল বক্তব্য এক। কিন্তু বঙ্কিম যেখানে নিজের মতকে সমর্থন করে চলিত ভাষায় সাহিত্য লেখেন নি, সেখানে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন। দুজনেরই গদ্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল—বোধ্যতার দ্বারা গদ্যের সার্থকতা নির্ণয় করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যে পথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ অগ্রসর হয়ে গদ্য রচনা করেছেন, সেই পথেই বাংলা গদ্যের সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব, প্রমথ চৌধুরী-নির্দেশিত কৃত্রিম চতুর গদ্যের পথে নয়।

॥ আট ॥

বাংলা ভাষার চলিত গদ্যের ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থান কোথায় একথা নির্দেশ করার পব বিবেকানন্দের গদ্যের বৈশিষ্ট্য আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। লেখকের রচনাশৈলী যদি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশক হয়, তবে বিবেকানন্দের রচনাশৈলী অবশ্যই বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। আলোচনা-প্রধান বলে তাঁর গদ্য নিরলঙ্কার, পৌরুষপূর্ণ, পেশল। বিষয়াতিরিক্ত কোন সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে তিনি মনোনিবেশ করেন নি। একটি ইংরেজি কথা ব্যবহার করে তাঁর গদ্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—তাঁর গদ্য functional. চিঠিপত্রের আকারে লিখিত গদ্য সরস, মধুর এবং informal, আবার কখনো কখনো তাঁর গদ্য বাগ্মীতার সাহিত্য রূপায়ণ। কখনো তার রচনাভঙ্গি বাগ্মীর, কখনো বা পত্রলেখকের। এবং পরিবর্তন হয় বিষয়ানুসারে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে, "ইহার বাঙ্গালা লেখায় একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে তাহাতে লেখকের দৃপ্ত তেজ ও অদম্য কর্মক্ষমতার পরিচয় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।"

তিনি যে চলিত ভাষায় গদ্য রচনা করেছিলেন তার পিছনে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমত, রামকৃষ্ণ যে কথ্য-

ভাষায় উচ্চ আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন তাতেই স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে সর্বভাব চলিত ভাষায় প্রকাশ করা যায়। রামকৃষ্ণের এই পরোক্ষপ্রভাব সম্ভবত বিবেকানন্দের উপর ছিল। দ্বিতীয়ত মনে রাখা দরকার স্বামীজি সর্বপ্রকার জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। সাধুভাষা সাহিত্যের জন্য আর চলিতভাষা দৈনন্দিন কথাবার্তার জন্য—এ ব্যাপার তিনি স্বীকার করতে পারেন নি, কারণ তাঁর কাছে এই রকম বিভেদের অর্থ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদকে স্বীকৃতি দেওয়া। তৃতীয়ত, তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য মনে করতেন সর্বজনবোধ্যতা। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষার দুর্গম দুর্গ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে জনসাধারণের বোধ্য ভাষার প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দও ছিলেন লোকশিক্ষক, লোকশিক্ষা দেবার প্রয়োজনেই জনসাধারণের মুখের ভাষাকে তিনি সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গদ্যে অনেক সময় দুর্বলতা দেখা যাবে, সৌন্দর্যের অভাব দেখা যাবে। কিন্তু সে সব সময় আমরা যেন মনে রাখি, সাহিত্য করার জন্য তিনি সাহিত্য করেন নি। কর্মজীবন ছিল তাঁর কাছে মুখ্য, সাহিত্যসাধনা ছিল গৌণ। সেই অর্থে তাঁর রচনা এমেটরের রচনা। কিন্তু সাহিত্য করার জন্য সাহিত্যে অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা অসাধারণ।

বাংলা-সাহিত্যে কথ্যরীতির পূর্বাপর ঐতিহ্যের মধ্যে স্বামীজির দান ও বৈশিষ্ট্য কী, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "স্বামীজির বাংলা স্টাইল শুধু অপূর্ব নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি বাহন। বাংলা কথ্য স্টাইলের ইহাই যথার্থ আদর্শ। তাঁহার স্টাইলের তুলনায় হুতোম ও আলাল vulgar, আর পরবর্তীদের কথ্য স্টাইল সাধুভাষার মতোই, সাধুভাষার চেয়েও অনেক বেশী কৃত্রিম।" বিবেকানন্দের গদ্যে এই অকৃত্রিমতা, এই স্বাভাবিকতা ছিল, তার কারণ চলিত ভাষা

ব্যবহার কালে তিনি কথোপকথনের রীতি, সংলাপের ধরন, এমন কি কথ্যভাষার মুদ্রাদোষগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। রুচির কারণে এবং খেলো আঞ্চলিক ভাষা বলে হুতোমী অপভাষা শুধু তিনি বর্জন করেছিলেন। তাঁর ভাষাভঙ্গিমা সাবলীল, গতিশীল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন, অনাবশ্যক তৎসম শব্দের ভারে তাঁর ভাষা ভারাক্রান্ত নয়। আবার প্রয়োজনমত তৎসম শব্দ ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন—"এবার খালি নীলাভ, সামনে পেছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাসি, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে।" তিনি চলিত ভাষার সাধারণ বাক্রীতির মধ্যে একই সঙ্গে তৎসমের সমুদ্রশঙ্খ এবং তৎভব দেশী-বিদেশী শব্দের নিজস্ব ধ্বনি মিলিয়ে এক ঐকতান সৃষ্টিতে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে আরবি ফার্সি কোনও শব্দকে বাদ দেবেন না, একথা বঙ্কিম ঘোষণা করেছিলেন; বিবেকানন্দ প্রয়োজন হলে কোনও শব্দই বাদ দেন নি। একটি উদাহরণ—"লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারি ধুম। বড় মসজেদ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশ্নির বাহার দেখে কে! বেসুমার লোকের সমাগম। ....সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফগাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লক্ষ্বরি জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবাকাবাচোস্ত পায়জামা, তাজমোড়াসার রঙ্গবেরঙ্গ শহরপসন্দ্ ঢঙ্ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুরসাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি।" যেমন অসংকোচে তিনি আরবি ফার্সি শব্দ তাঁর গদ্যে স্থান দিয়েছেন, তেমনি দ্বিধাহীনচিত্তে ইংরেজি শব্দকে স্থান দিয়েছেন। সময়ে সময়ে সেই ইংরেজি শব্দব্যবহার কী চমৎকারিত্বই না দিয়েছে তাঁর

রচনাকে—"বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছো ?" এই বাক্যে ইংরেজি শব্দব্যবহার যেমন চমৎকার, ঠিক তেমনি চমৎকার বাক্যারম্ভের মেয়েলি ভঙ্গীটি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অন্তঃপুরের মেয়েলি ইডিয়ম বাংলা গদ্যসাহিত্যে ব্যবহারের ব্যাপারে বিবেকানন্দ এক অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই রকম ইডিয়মের কয়েকটি উদাহরণ—খ্যাঁদা-বোঁচা ভাইবোন; লাথিঝাঁটা; যাত্রীরা ন্যাকার করে অস্থির; হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে; এঁড়েলাগা ছেলে। একদিকে যেমন এই সব আটপৌরে বাক্য বা বাক্যাংশ তিনি ব্যবহার করেছেন, ভাষাকে একটি সর্বত্রগামী স্বাভাবিকত্ব দান করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সংক্ষিপ্তির অনুরোধে সনপিনদ্ধ সমাজবদ্ধ শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন—"কর্দমাবিলা হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা সহস্রপোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গা।"

বিবেকানন্দ চলিত ভাষার সত্যকার নিজস্ব প্রকৃতিটি ধরতে পেরেছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরীদের অনেক আগে তিনি বাংলা চলিত ভাষার আদর্শ রেখে যেতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শুধু সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের লঘুত্ব সম্পাদন করলেই চলিত ভাষা হয় না—তাতে কিছুটা গতি আসে বটে, কিন্তু লঘু ক্রিয়াপদের পক্ষে তৎসম শব্দের বোঝা বহন সম্ভব হয় না। তাই সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘুত্বের সঙ্গে প্রয়োজন চলিত ভাষার প্রচলিত বাক্‌রীতি, বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ, এমন কি অন্তঃপুরের ইডিয়ম পর্যন্তের ব্যবহার। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ছুতমার্গের বিরোধী ছিলেন, তাই তিনি বুঝেছিলেন ভাষার ক্ষেত্রে ছুতমার্গের পরিচয় দিয়ে সত্যকার অকৃত্রিম বলশালী সর্বত্রগামী চলিত ভাষা রচনা করা যায় না। তাঁর এই ভাষা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —"স্বামীজির ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলায় ইতর ভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান।"

কিন্তু এ পর্যন্ত স্বামীজির চলিত ভাষার গদ্যের আলোচনা করলাম। তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ সাধুভাষায় লিখিত, এবং সেই গ্রন্থের গদ্যেরও আলোচনা প্রয়োজন। 'বর্তমান ভারতে'র গদ্যের আলোচনায় এসে লক্ষ্য করি বিবেকানন্দও দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে চলিত ভাষার সমর্থন করলেও, নিজে কোনদিন চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও, ছিন্নপত্রাবলীতে তাঁর গদ্য তুঙ্গশিখর স্পর্শ করিলেও, 'ঘরে বাইরে' রচনার পূর্বে উপন্যাস-প্রবন্ধাদি কখনো চলিত ভাষায় লেখেন নি—এবং 'ঘরে বাইরে' থেকে তিনি যে চলিত ভাষাকেই তাঁর রচনাবলীর বাহন করলেন তার জন্যেও প্রয়োজন হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণা, 'সবুজ পত্রে'র উত্তেজনা। অনেক ঔপন্যাসিক আবার সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের বোঝাপড়া করেছিলেন—তাঁদের উপন্যাসে বর্ণনা অংশ সাধুভাষায় লিখিত এবং সংলাপ অংশ চলিত ভাষায় লিখিত। দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছিল এই দ্বিধাগ্রস্ততা কাটিয়ে উঠতে। এবং মধ্যবর্তীকালে দুই অসমান পায়ে চলার ফলে বাংলা গদ্যের অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছিল। এমন কি যে বিবেকানন্দ বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধে স্বচ্ছ যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে প্রমাণ করলেন চলিত ভাষাই বাংলা সাহিত্যের বাহন হওয়া উচিত এবং যিনি 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'ভাববার কথা' রচনা করে সেই চলিত ভাষার আদর্শ নির্দেশ করলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যিনি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে চলিত ভাষায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি রচনা করতে পেরেছিলেন—"সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুব যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর, জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুব বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ

করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে!”—তিনি যে চলিত ভাষায় ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন না, একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু ‘বর্তমান ভারত’ সাধুভাষায় লেখা। যদি বিবেকানন্দের চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিকে বলি চিঠির ভাষা, তাহলে ‘বর্তমান ভারতে’র ভাষাকে বলতে হয় বাগ্মীর ভাষা। চিকাগোর ধর্মমহামণ্ডলে বা অন্যান্য বহু সভায় বিবেকানন্দ যে ওজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎসঞ্চার করেছিলেন সেই উদাত্ত দৃপ্ত কণ্ঠস্বর যেন ‘বর্তমান ভারতে’র ছত্রে ছত্রে শুনতে পাই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ‘বর্তমান ভারত’ও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের একদিকের পরিচয় বহন করছে। বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক সাধনার আধুনিক প্রতিনিধি, তাঁর রচিত ‘বর্তমান ভারতে’র ভাষাও বিশুদ্ধ ক্রুপদী রীতির। তার মধ্যে যেন সুপ্রাচীন সভ্যতার উপলব্ধিসমূহের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই গ্রন্থের শুদ্ধ সাধুরীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। একটি—তৎসম শব্দবহুল, সমাসসন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাদের বাক্য-পরম্পরা; আর একটি—খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্যরীতি।” প্রথম পদ্ধতির দৃষ্টান্ত—“যে পুরোহিত-শক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্র-প্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল, অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্বপ্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্মা বর্বরবাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতিনীতি স্বদেশে

স্থাপন করিয়া, বিদ্যাহীন বর্বর ভুলাইবার সোজাপথ মন্ত্রতন্ত্র মাত্র আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া আর্যাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল।" বহু উপবাক্যের সমাবেশে এই দীর্ঘমন্থর বাক্যটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সমাজবিবর্তনকে ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির উদাহরণ—"পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্ত্য পুরুষ আমাদের বেশ-ভূষা অশন-বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্ত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে; মূর্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?" কোন কোন সময় তাঁর আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাবগত মহিমা ফুটে ফুটে ওঠে: "কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।" বিবেকানন্দের ভাষা পাঠকের চিন্তা ও হৃদয়কে উন্নত করে, ওজস্বিতা, বীর্য এবং বল দান করে।

॥ নয় ॥

স্বামীজির গদ্য-রচনাবলীর পরিচয়দানের পর তাঁর রচিত কবিতা-গুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই আলোচনা থেকে তাঁর রচিত সংস্কৃত স্তোত্রসমূহ ও ইংরেজি ভাষায় রচিত কবিতাগুলি বাদ দিচ্ছি।

বিবেকানন্দ-রচিত এই কবিতাগুলির সাহিত্য-মূল্য বিচারে আমাদের দুই প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একটি অসুবিধা

বিষয়গত। এই কবিতাগুলির সাধারণ বিষয়বস্তু, কিংবা বলা যায় একমাত্র বিষয়বস্তু ধর্মীয়। ধর্মীয় অনুভূতি, দিব্যোপলব্ধি, ধর্মবিশ্বাসের সংকট, সংকট থেকে উদ্ধার—ধর্মীয় এই সব নানা স্তর অবলম্বন করে এই কবিতাগুলি রচিত। আধুনিক কাল ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন। সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে আধুনিক পাঠকদের পক্ষে ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা সহানুভূতির সঙ্গে পাঠ করা কঠিন হয়ে গেছে। পাঠকের মনে বাধার প্রাচীর এমন সুদৃঢ় যে সেই প্রাচীর ভেদ করে এই জাতীয় কবিতার পক্ষে সঙ্গত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। অথচ এমন চিরকাল ছিল না। ক্রিশ্চানধর্মের মূলসত্য নিয়ে St. John of the Cross-এর ক্রিশ্চান-মরমী কবিতা রচিত হয়েছে, রোম্যান ক্যাথলিক-ধর্ম অনুপ্রাণিত করেছে মহাকবি দান্তেকে, ক্রিশ্চানধর্মের নানা দিক অবলম্বন করে সেদিনো হপ্‌কিনস্‌ কবিতা রচনা করেছেন—ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে কবিতা রচনা করেছেন মরমী সুফীগণ, বৈষ্ণবপদাবলীর ও শাক্তপদাবলীর কবিগণ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর উপনিষদের ধর্মের প্রভাব কম নয়, যদিও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বন্ধন থেকে সেই কবিতা মুক্ত। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত কবিতাবলী তো সে বন্ধন থেকেও মুক্ত নয়। সুতরাং স্বামীজির কবিতা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত শুধু এই কারণে তাদের সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা সাহিত্যবোধহীনতার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় অসুবিধা, রূপগত। ধর্মগত বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও শ্রেষ্ঠ কবিতা হতে পারে, একটি সর্ত পালন করতে সমর্থ হলে। সেই সর্তটি হচ্ছে, ধর্মের বিমূর্ত ভাবরাজি ও সত্যকে মূর্ত করে তুলতে পারার, অবয়বত্ব দানের ক্ষমতা। কারণ কবিতার, যে কোন শিল্পের, প্রধান কাজ, বিমূর্তকে মূর্ত করা, ভাবকে প্রত্যক্ষ-প্রতিমা দান করতে পারা। ধর্মীয় কবিতা যদি এই সর্ত পালন করতে পারে

তবে তা নিশ্চয়ই কবিতা হয়ে উঠবে। স্বামীজির কবিতা সব সময়ে এই সর্ত যে পালন করতে পেরেছে একথা বলা যায় না। তার কারণ এই কবিতাগুলো যত না রূপকল্প-সমৃদ্ধ, যত না কাব্যসঙ্গীত-সমৃদ্ধ, তার চেয়ে বেশী ভাষণপ্রধান। তাঁর কবিতা মেটাফিজিক্যাল নয়, সেগুলি প্রধানত ধর্মীয় বক্তব্যপূর্ণ বা নীতিমূলক। এই কারণে এই কবিতাগুলিতে কাব্যকারুর অভাব আছে। কিন্তু আবেগের চাপে, উপলব্ধির সততায়, ধর্মকল্পনার দিব্যতায় এই ভাষণপ্রধান রচনাবলী অনেকাংশে কাব্যকারুবর্জিত হয়েও, অনেক ক্ষেত্রে কবিতা হয়ে উঠেছে। মহাপুরুষের বাণী, ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য যেমন উপলব্ধির গভীরতার জোরে অনুপ্রাণিত বাণী হিসাবে কবিতার মহিমা পায়, এই কবিতাগুলিও তাই।

কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের মত শিবকল্পনা বিবেকানন্দকেও যে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ যেমন তাঁর গদ্যে আছে, তেমনি তাঁর বীরবাণীতে আছে। অবশ্য তাঁর মহাদেব-বর্ণনা অনেকাংশে ঐতিহ্য অনুযায়ী, তাঁর মহাদেব-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের মত নবীনত্ব নেই। উদ্ধৃতি দিলে এই মন্তব্যগুলির যাথার্থ্য বোঝা যাবে—

> ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপালমাল।
> গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
> ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।

কৃষ্ণ বা মহাদেব-বন্দনা ব্যতীত তিনি রামকৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। যে-রামকৃষ্ণের intense sympathy তাঁকে অভিভূত করেছিল, যাঁর পায়ে তিল তুলসী দিয়া নিজেকে তিনি সমর্পণ করেছিলেন, তাঁর বন্দনা যেমন তিনি সংস্কৃত স্তোত্রে, তেমনি বাংলা কবিতায় করেছেন।

> নির্ভয়, গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
> নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান॥
> সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।
> প্রেমার্পণ, মমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়।

বিবেকানন্দ-জীবনীর সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয় আছে তিনিই জানেন রামকৃষ্ণ-প্রভাবের পূর্বে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল। এই ব্রাহ্মধর্ম উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রাহ্মধর্মের উপাসনায় ব্যবহৃত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি উপনিষদের ভাব-ভিত্তির উপর রচিত। সেই ব্রাহ্ম-প্রভাবের প্রমাণ পাই স্বামীজি-রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে। এই সঙ্গীতের আরম্ভে উপনিষদের একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই গানটি প্রলয় বা গভীর সমাধি নামে বীরবাণীতে সংগৃহীত হয়েছে। এই সঙ্গীতটির আরম্ভ—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

এই পদটি "ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং" ইত্যাদি উপনিষদের প্রখ্যাত শ্লোকটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি রূপকাত্মক। এই কবিতায় প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি ও বিশ্বোপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক মরমী উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন, এই কবিতাতেও তাই। এই কবিতার প্রকৃতি-বর্ণনা অংশের সঙ্গেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার সাদৃশ্য বর্তমান—

মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ !
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্র কিরণ,

কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।

যিনি 'শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর', 'স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে', প্রভৃতি পংক্তি রচনা করতে পারতেন, তাঁর মধ্যে কবিত্ব ছিল না এ কথা বলা যায় না। সব কিছু লয় পায়, চরাচরে শুধু ঈশ্বরই চির-বর্তমান—এই সত্য প্রকাশ এই কবিতার উদ্দেশ্য। এই কবিতার দ্বিতীয় বর্ণিতব্য বিষয়, সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ—ঈশ্বর কবির মত জড়জীব সমস্ত কিছু রচনা করেছেন সৃষ্টির আনন্দে—'একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।' উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব-ধর্মের লীলা এই উক্তির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। এই তত্ত্বকথা কবিতাটির শেষ কথা নয়। এখানে প্রকাশ পেয়েছে বিবেকানন্দের cosmic imagination বা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কল্পনা—

আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্যপথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ-ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু······
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলরূপে,
ধায় গ্রহ-তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য-আবাস।

বিবেকানন্দের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দুইটি কবিতা—'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। জগতের দুঃখশোক, ধর্মপথের বিবিধ বাধার চমৎকার বর্ণনা 'সখার প্রতি' কবিতাটিতে পাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধ

চলে অনিবার ; সর্বত্র স্বার্থ ; যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন সবই বিড়ম্বনা—

হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।

সর্বত্র ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করলেন—

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম, প্রেম'—এইমাত্র ধন।

যে রামকৃষ্ণের intense sympathy ছিল, তাঁর মানসপুত্র বিবেকানন্দ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের শেষে সেই প্রেমধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এই প্রেমধর্মে দীক্ষিত মানুষের উপাস্য দেবী হলেন তিনি, যাঁর মধ্যে বিশ্বদ্বন্দ্বের মহাসমন্বয়—

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরই আগমন।

যিনি প্রলয়ঙ্করী অথচ বিশ্বমাতা, একদিকে তাঁর সাধনা, অন্যদিকে জীবে দয়া। জীবে দয়ার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর-প্রাপ্তি, উপাস্য ঈশ্বর-লাভের একমাত্র সোপান প্রেমের পথ—শাস্ত্র নয়, মন্ত্র নয়।

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বৈদান্তিক শঙ্করের শুষ্ক মেধার সঙ্গে যুক্ত হলো বুদ্ধের হৃদয়, বুদ্ধের করুণা—তাই প্রেম হলো ঈশ্বর লাভের একমাত্র পাথেয়।

বিবেকানন্দের জীবনদর্শন 'সখার প্রতি' কবিতার মধ্য দিয়ে সোচ্চারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে বলে অনেক সমালোচকের মতে এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু যদি জীবনদর্শন, কল্পনা, বর্ণনা-

শক্তি ইত্যাদি সব দিক থেকে বিবেচনা করি তাহলে মনে হয়, 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। কবিতাটির প্রথমেই তিনি বিশ্বজগতের দুটি রূপের—মধুর ও নিষ্ঠুর—চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন ; প্রত্যক্ষ ভাষণের মধ্য দিয়ে এই পরিচয় দেননি, দিয়েছেন পরোক্ষ প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্য দিয়ে। একদিকে,

স্বরময় পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী ॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণতুলিকর, ছোঁয়া মাত্র ধরাপটে।
বর্ণ খেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয় ভাবরাশি জেগে ওঠে ॥

অন্যদিকে—

ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥

প্রকৃতির এই মধুর রূপের প্রতিবিম্ব পড়েছে নারীর মোহিনী মায়ায়—

বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর—নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর—বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী ॥

এই বন্ধন থেকে ধার্মিককে মুক্ত হতে হবে। বিশ্বের মোহিনী মায়া থেকে মুক্তি পেতে হলে ক্রমান্বয় যুদ্ধ করতে হবে। রণক্ষেত্রে যুদ্ধের রূপক-বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই ধর্মযুদ্ধের অপূর্ব বর্ণনা বিবেকানন্দ দিয়েছেন। এই ক্রমান্বয় ধর্ম-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই মৃত্যুরূপা কালীকে পাওয়া যায়, তিনি মর্মচ্ছেদ করেন, মায়া ভেদ করেন। সেই যুদ্ধে অধিকাংশের পতন, মাত্র মুষ্টিমেয়ের জয় হয়—

পৃথ্বীতল কাঁপে থরথর, লক্ষ অশ্ববরপৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলাবরিষণ গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে ॥
আগে যায় বীর্য-পরিচয় পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা ॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥

যখন বিবেকানন্দের এই কবিতায় মুণ্ডমালা-পরিহিতা, অট্ট-হাসিনী, নগ্ন দিক্‌বাসা দানবজয়ী দয়াময়ী মায়ের বর্ণনা পড়ি তখন স্বভাবতই রামপ্রসাদের বিখ্যাত পদগুলির মাতৃবন্দনার কথা মনে পড়ে যায়। ধর্মযুদ্ধে জয়ী ধর্মবীরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয়-শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

হৃদয়-শ্মশানে শ্যামাকে নাচাতে গেলে তাঁকে পূজা দিতে হবে, সেই পূজা অপার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের বর্ণনা রূপকচ্ছলে এই কবিতায় করা হয়েছে। বিবেকানন্দের ইংরাজিতে রচিত *Kali the Mother* কবিতা, যার বঙ্গানুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন মৃত্যুরূপা কালী নামে, সেই কবিতার ভাবকল্পনা অবলম্বনে এই 'তাহাতে নাচুক শ্যামা' কবিতাটি রচিত।

আর একটি কবিতার উল্লেখ করে স্বামীজির সাহিত্য-কৃতির পরিচয় সমাপ্ত করবো। 'সাগর-বক্ষে' নামক কবিতাটি বিশুদ্ধ প্রকৃতি বর্ণনা। এর মধ্যে ধর্মগত কোন প্রশ্ন নেই—শুধু সামান্য স্বদেশ-প্রেমের ইঙ্গিত আছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্তের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, বিরলরেখায় পরিস্ফুট কিন্তু সুন্দর—

পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।

শেষ পংক্তি কয়টিও উদ্ধৃতির যোগ্য—

মহীয়ান্ সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, করে না গর্জন।

এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়—তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক সম্ভাবনা সুপ্রচুর পরিমাণে ছিল। কোন কোন দিকে, বিশেষত চলিত ভাষার ব্যবহারে তিনি অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি যদি হিন্দুধর্মের নবজন্মদানের দুরূহ-ব্রত গ্রহণ না করতেন তাহলে সাহিত্যভাণ্ডার তাঁর দানে যে পুষ্টতর হত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে শুভ হত কিনা বলা যায় না। মনে হয়, নিয়তি প্রধানত তাঁকে অন্য কাজে পাঠিয়েছিল। সে কাজ তিনি চরিতার্থ করে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেই কৃতিত্বের প্রমাণ, তাঁর সাহিত্য।

বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তার কয়েকটি দিক

গৌতম সান্ন্যাল

বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তার কয়েকটি দিক

প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে একটা উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়। কোনো মানুষ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গত স্বভাবানুগ জীবনের মধ্যেই সীমিত করে রাখে তার উদ্দেশ্যকে ; কোনো মানুষ আবার উদ্দেশ্য খুঁজে পায় স্বভাবনিয়ন্ত্রিত জীবনের উর্ধ্বে। কোনো মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায় নিছক ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে—আবার কোনো মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায় সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তার নিবিড় যোগসূত্রের মধ্যে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউ বা সচেতন, আগ্রহশীল, আবার কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন। কিন্তু তবুও প্রত্যেক মানুষের বাঁচার মধ্য দিয়েই কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যখনই মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে—যখনই সে চায় এই উদ্দেশ্যকে সচেতনভাবে চরিতার্থ করতে, তখনই সে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আর এই প্রশ্নই হল সমস্ত দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনায়, বিভিন্ন তত্ত্বে এই মূল প্রশ্নই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়।

ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে এই কথা যতখানি প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য—অন্যান্য দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে সম্ভবত তা নয়। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় যে প্রশ্নগুলি অথবা বিষয়গুলি প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলির মূল নিহিত আছে মানুষের জীবনেই। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অথবা জীবনকে অস্বীকার করে ভারতীয় পণ্ডিতেরা কখনই দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হননি। ভারতীয় চিন্তাধারার আদি উৎস বেদ ও উপনিষৎ-এও এর ব্যতিক্রম নেই। ভারতীয় চিন্তাজগতে চারিটি পুরুষার্থের উল্লেখ করা হয়েছে,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারিটি পুরুষার্থকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে এই পুরুষার্থগুলির রূপ ভিন্ন ভাবে হয়েছে এবং বিভিন্ন পুরুষার্থগুলিকে বিভিন্ন ক্রম দেওয়া

হয়েছে। মোটামুটিভাবে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারাতেই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে ও এই পরমপুরুষার্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই ভারতে দার্শনিকেরা দর্শনের মূল প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।

উক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে; কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে কোনো ধারণা লাভ করার চেষ্টায় ঐ কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে যদি আমরা পুরোপুরি ভারতীয় বলে আখ্যায়িত করতে চাই, তা হলে প্রধানত ঐ অর্থেই। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগে অথবা তারও কিছু পরে—যখন মানুষের জীবন ছিল সহজ, স্বচ্ছ, তখন যে কাজ সম্ভব ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই কাজ কেমন করে সম্ভব হল? মানুষের জীবন যখন অপেক্ষাকৃত সরল, জটিলতামুক্ত—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক যখন স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট—জীবনবোধ তখন স্থির, জীবননিঃসৃত জীবনের উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নটিও পরিষ্কার এবং তার উত্তরটিও তখন সুনির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবন যখন অস্বচ্ছ, জটিল, পারিপার্শ্বিকের ভিন্নমুখী স্রোতের আবর্তে মানুষের জীবনবোধ যখন অস্পষ্ট —তখন জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নগুলিকে একটি মূল প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত করা ও তার সুস্পষ্ট উত্তর নির্দেশ করা কেবলমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ—সংকল্প যাঁর অটুট। ঊনবিংশ শতাব্দীর পারিপার্শ্বিকে নিমজ্জিত পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েও তাই বিবেকানন্দের ভেতরে আদি ভারতীয় ভাবধারা সুস্পষ্ট ভাবেই মূর্ত।

একটি বিশিষ্ট ভারতীয় ভাব থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। বেদ-নিরপেক্ষ বা বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদগুলি ছাড়াও বেদাশ্রয়ী দর্শনগুলিও অনেক। কেবল ষড়দর্শন নয়—এই ষড়দর্শনের প্রত্যেকটির ভিতরেও আবার

একাধিক মতবাদ বর্তমান—যেগুলি কেবলমাত্র গৌণ প্রশ্নে নয়—প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলি সম্পর্কেও ভিন্ন মতাবলম্বী। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তাকে এর কোন্‌টির অন্তর্গত করব? অথবা তা' সবগুলি থেকেই ভিন্ন আর একটি বিশেষ মতবাদ? অথবা সেগুলির এক নতুন সমন্বয়? স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে যাঁদের ন্যূনতম পরিচয়ও আছে—তাঁরাও জানেন যে তাঁর চিন্তাধারা বেদান্তানুগ। কিন্তু এইটুকু বললেই ত' যথেষ্ট হয় না। বেদান্তের সত্য তার কাছে ধরা পড়েছিল কোন্ আলোকে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়, কারণ বিবেকানন্দের চিন্তাধারা কোনো নিছক দার্শনিক বিচারের ফল নয়—বহুধাবিভক্ত জীবনের জটিল পরিস্থিতির মাধ্যমে উপলব্ধ।

সমগ্র বেদান্তের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে অদ্বৈতবাদে। এক এবং অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই পরম সত্য। সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত। 'একমেবাঽদ্বিতীয়ম্', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি বেদান্তের মহাবাক্যগুলি এই সত্যই প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই মহাবাক্যগুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। উপনিষদে কেউ দেখেছেন শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, কেউ বা পেয়েছেন দ্বৈতবাদ—আবার কেউ বা বলেছেন একে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। বিবেকানন্দের কাছে এর কোন্‌টি সত্য বলে মনে হয়েছিল? জগতের মূলে যে এক ব্রহ্ম এ সম্পর্কে কোনো বৈদান্তিকেরই সংশয় নেই। কিন্তু বিরোধ আর মতভেদ উপস্থিত হয় তখনই যখন এঁরা জগৎ-সংসারের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেন। জগৎ-সংসারকে কেউ বা ব্রহ্মের পরিণাম বলে মনে করেছেন—আবার কেউ বা একে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মনে করেছেন।

অদ্বৈতবাদে সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে একক সত্তার সাহায্যে। এই একক সত্তা হল 'ব্রহ্ম'। এই 'ব্রহ্ম' চৈতন্যস্বরূপ;

বিশ্বের আপাতবৈচিত্র্য অবিদ্যার ফলমাত্র। এই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাকে জানতে পারলেই আমাদের তাত্ত্বিক সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। আত্মা অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করে হয় মুক্ত। 'ব্রহ্ম-জ্ঞানে'র ইচ্ছাই তাই সত্যসন্ধানের একমাত্র উপায়, এর ফল হল মুক্তি। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই। 'জ্ঞানযোগে' (১৭শ সংস্করণ, পৃঃ ৮৪) স্বামী বিবেকানন্দ একজায়গায় বলেছেন,...."নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন ; তাঁহার কখনই পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে"। অপর এক জায়গায় বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের goal (লক্ষ্য)। ...জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপলাভে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই।" (স্বামীজির বাণী ও রচনা। জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে। উদ্বোধন। ১৩৬৯, নবম খণ্ড)

অদ্বয়-ভাববাদের অন্যতম উদ্গাতা স্বামীজির চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য পারমার্থিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ততখানি সুস্পষ্ট নয়—যতখানি সুস্পষ্ট এই ব্যবহারিক জগৎ-এর ব্যাখ্যায়। "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" এই মহাবাক্যের প্রথম অংশ সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তাধারায় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য-অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য হয়ত দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। 'মায়াবাদ'কে স্বামীজি স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজের কথায়, "কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল ? আর উহার উত্তর—সর্বোত্তম উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর মায়াবাদ ; বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই,

বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এ বহুত্ব কেবল আপাতপ্রতীয়মান মাত্র”—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৩১৮)। কিন্তু এই ব্যবহারিক জগৎ কেবলমাত্র অবিদ্যাকল্পিত, স্বামীজি তা স্বীকার করতে পারেননি; তাই এই জগৎ সম্পর্কে বলেছেন,—“যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রভু স্বয়ং”।—(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭) স্বামীজির তত্ত্বচিন্তা এই ব্যবহারিক জগৎকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেই—তাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছে। পরম সত্যের স্বরূপ অবধানের পরও বিবেকানন্দ কর্মময় জগতের কথা বিস্মৃত হননি। কর্মময় জগতের মধ্যে সেই ‘পরম সৎ’-এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী কতদূর বিচারসিদ্ধ সে সম্পর্কে মতান্তরের অবকাশ আছে সত্য, কিন্তু তার ফলে তাঁর চিন্তার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি, বরং আপন স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার কারণ, যা আগেই একবার বলা হয়েছে, নিছক তত্ত্বের বিচার স্বামীজির কাম্য ছিল না; ব্যবহারিক জীবনের গ্লানি, দৈন্য আর বৈষম্যকে তত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত করে তাকে সুন্দর করাই ছিল তাঁর কাম্য। কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমস্ত গ্লানির হাত থেকে মুক্তি না পেলে পারমার্থিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ কেবল নিষ্প্রয়োজনই নয়—এক অর্থে তা অসম্ভবও। লণ্ডনে বেদান্তদর্শনের ওপর স্বামীজি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন *Practical Vedanta*। তত্ত্ববিচারের ফলিত দিকটি সম্পর্কে তাঁর এই গভীর সচেতনতা, তাঁর দার্শনিক চিন্তায় আধুনিকতা সূচিত করে। তাই *Practical Vedanta* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “If a religion cannot help man wherever he may be, wherever it stands, it is not of much use, it will remain only a theory for the chosen few.” তাঁর এক শিষ্যকে একবার স্বামীজি

বলেছিলেন,....“আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তার পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে।........অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হ'লে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথম অন্ন-সংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে শেখা।”—(স্বামীজির বাণী ও রচনা। জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে। উদ্বোধন। ১৩৬৯। নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-'৬৫)।

ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে এই সচেতনতার ফলেই স্বামীজির চিন্তায় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম আর ভক্তির স্বীকৃতিও দেখতে পাই; কর্ম কেবল ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী নয়—তাই নয়—অনেকাংশেই পরিপূরক। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞও কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। কর্মফল ত্যাগ করা মানেই কর্মত্যাগ করা নয়। “ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না, কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখলাভের জন্য কেন কর্ম করবেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা-কিছু কর্ম ক'রে যান, তাতে জগতের হিত হয়—সে-সব কর্ম ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' হয়।......মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তখনই ‘ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোনো প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ

সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি—আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে।……এই অতিচেতন ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায়; সে সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না।……আত্মজ্ঞের ফলাসঙ্গরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।”—(স্বামীজির বাণী ও রচনা। জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে। উদ্বোধন। ১৩৬৯, নবম খণ্ড, পৃ. ১৬২-'৬৩)।

কেবলমাত্র জ্ঞান ও কর্ম নয়, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যও দেখা যায় স্বামীজির চিন্তাধারায়, স্বামীজির মতে 'মুখ্যা ভক্তি' ও 'মুখ্য জ্ঞানে, কোনো প্রভেদ নেই। 'মুখ্যা ভক্তি' হল ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। আর যাকে প্রেম বলা হয়—তাই-ই পরমজ্ঞান। পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি সম্ভব নয়। 'আনন্দ'-ই প্রেম। আর যেহেতু যা চিৎ, তাই আনন্দ, আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি আর চিৎস্বরূপ অনুভূতি একই সঙ্গে হয়।

মুক্তি, সে যদি পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করা হয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে এই পুরুষার্থ উপলব্ধি হবে কি করে? তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া এই মুক্তিলাভ সম্ভব নয়—এ কথাটি ঘোষিত হয়েছে উপনিষদে,—“ত্বমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়”। মোক্ষলাভস্বরূপ নিঃশ্রেয়স্ ফললাভ যে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেরই ফল একথা বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তায় সুস্পষ্ট। কিন্তু জ্ঞান যে কর্ম বা ভক্তি-নিরপেক্ষ ভাবেই মুক্তিলাভ করতে পারে—এমন কথা কোনো ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রকাশিত হলেও বিবেকানন্দ জ্ঞানকে কখনই কর্ম বা ভক্তিনিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ উপায় হিসাবে দেখেননি। তাঁর মতে, “জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের

সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পার-নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্বলৌক, সার্বভৌম ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।” তাত্ত্বিক বিচারে, জ্ঞান কর্ম বা ভক্তিসাপেক্ষ উপায় অথবা বেদান্তের মূলকথা কর্ম-ভক্তি-নিরপেক্ষ জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র পথ—এ প্রসঙ্গে অনেক মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কোন্ মতটি যে যুক্তিসিদ্ধ সে কথা জোর দিয়ে বলা সহজ নয়। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন অথবা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা (বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) ব্যবহারিক জগতের সীমাবদ্ধ মানুষের জীবনবোধ থেকেই উৎসারিত —কর্ম বা ভক্তিকে বাস্তবিকপক্ষে উপেক্ষা করা যায় না—এই স্থির বিশ্বাস বিবেকানন্দের ছিল।

‘ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা’—বেদান্তের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে জগৎ অলীক নয়। তবে জগৎকে মিথ্যা বলার অর্থ কি? এ প্রসঙ্গে বেদান্তে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হয়েছে। ‘ব্রহ্ম’কেই একমাত্র পারমার্থিক সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জগৎ মিথ্যা। তবু জগৎকে মিথ্যা বললেও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনো এক অর্থে জগৎ-সংসারকে না মানলে আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত কিছুরই বিরোধিতা করতে হয়। তা হ’লে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সার্থকতাই বা কি? কাজেই কোনো এক অর্থে জগৎও সত্য। যে দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ-সংসারকে মেনে নেওয়া হয়েছে—বৈদান্তিকেরা তাঁকে বলেছেন ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই ব্যবহারিক সত্তা—প্রাতিভাসিক সত্তা বা নিছক অলীক থেকে ভিন্ন। তাত্ত্বিক বিচারে যাই হোক না কেন—সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়—এই পারমার্থিক সত্তার সঙ্গে ব্যবহারিক সত্তার সম্পর্কটি কি? এই দুইরকম সত্তার মধ্যে সত্যই কি কোনো যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব? কোনো একক তত্ত্বের সাহায্যে এই দুই সত্তার মধ্যে যথাযথভাবে কোনো যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হলে এই সত্তার পার্থক্যের আসল রূপ

কি ? আর যদি এই দুই সত্তা আত্যন্তিক ভাবে পরস্পর ভিন্ন হয়—তা' হলে অদ্বৈতবাদ কি রক্ষা হয় ? এই সমস্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তর্কের ঝড় বয়ে গেছে বহুযুগ ধরে। কিন্তু এই সমস্ত তর্কের ফলগুলি সাধারণ মানুষের কাছে কোনো নির্দেশনাই সূচিত করেনি। কিন্তু সমস্ত মানুষ যে সেই অমৃতফলস্বরূপ মোক্ষকে চরিতার্থ করবে এই বিশ্বাস প্রত্যেক বৈদান্তিকের পক্ষেই অপরিহার্য। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন কেবলমাত্র তার্কিক বিচারের দ্বারা আলোচ্য প্রশ্নগুলির মীমাংসা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর তারা পাবে বিশেষ কর্মের ধারা অবলম্বন করে। ব্যবহারিক জগতের বিশেষ কর্মগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাই তিনি ছিলেন সচেতন। কি ভাবে ব্যবহারিক জগতে কর্মকে স্বীকার করেও তাতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না হয়ে—ব্যবহারিক সত্তা থেকে অতিক্রান্ত হয়ে পারমার্থিক সত্তার উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে এই ছিল তাঁর ধর্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় অদ্বৈতবাদই যে প্রধানতম একথা অবিসংবাদিত হলেও একটা প্রশ্ন জাগে—যখন তাঁকে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য হিসাবে। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেননি। সাধারণতঃ আমরা তাঁকে দেখি দ্বৈতবাদের মূর্ত সাধক হিসাবে। তাই যদি হয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেও বিবেকানন্দ কেন দ্বৈতবাদকে গ্রহণ করলেন না ? বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি আর নিষ্ঠার সমন্বয়-সাধন কি ভাবে সম্ভব ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই—আমরা যদি বোঝাবার চেষ্টা করি—শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে পাশ্চাত্ত্য নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বিবেকানন্দের মনে এক বিরাট সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। এই সংশয় নিরসন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর

সাক্ষাৎ-এর পর। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁকে কোনো ধর্মোপদেশ বা তত্ত্বোপদেশের সাহায্যে তাঁর মনে কোনো ঈশ্বর-বিশ্বাস বা তাত্ত্বিক মতবাদে বিশ্বাস উৎপন্ন করার চেষ্টা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অতি-লৌকিক শক্তির। সেই অতি-লৌকিক শক্তির কাছে তিনি সমর্পণ করলেন তাঁর চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে—আর তারই ফলে লাভ করলেন তত্ত্বের সন্ধান। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কখনই ধর্মগুরু অথবা তত্ত্ব-উপদেষ্টা হিসাবে দেখেননি—তাঁকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং ভগবান-রূপে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে বিবেকানন্দ তাঁর ভক্তি নিবেদন করে বলেছেন :

> "আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
> লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
> ত্রৈলোক্যেঽপ্যমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
> ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥[১]
> স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
> হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
> গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
> সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥[২]

যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত অর্থাৎ চণ্ডালকেও যিনি ভালবাসিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা! যিনি অতিমানব-স্বভাব হইয়াও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিনলোকেই যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার প্রাণস্বরূপ, যিনি ভক্তির সহিত শ্রেষ্ঠজ্ঞানের কল্যাণমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥১॥ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য হুহুঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জুনের) ঘোরতর স্বাভাবিক অন্ধতম-স্বরূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শান্ত ও মধুর গীত (গীতাশাস্ত্র) যিনি সিংহনাদরূপে গর্জন করিয়া

বলিয়াছিলেন—সেই বিখ্যাত পুরুষই এক্ষণে রামকৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন" ॥ ২ ॥—(শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন—১৩৬৯। ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৫৪—৫৫) আর একটি স্তোত্রে বলেছেন,

"সামাখ্যাদৈর্গীতিসুমধুরৈর্মেঘগম্ভীরঘোষৈ-
র্যজ্ঞধ্বনি-ধ্বনিতগগনৈর্ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতবেদৈঃ।
বেদান্তাখ্যৈঃ সুবিহিত-যথোদ্ভিন্ন-মোহান্ধকারৈঃ
স্তুতো গীতো য ইহ সততং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥

দেবতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন, বিধিপূর্বক যজ্ঞসম্পাদন করার ফলে তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয় হইতে বেদান্তবাক্যদ্বারা ভ্রম ও অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল; তাঁহারা মেঘের মতো গম্ভীর সুমধুর সুরে সামবেদ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়াছেন, যাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—আমি সর্বদা সেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি।"

রামকৃষ্ণদেবকে বিবেকানন্দ যখন স্বয়ং ভগবানরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন—তখন রামকৃষ্ণদেবের মতবাদ দ্বৈত না অদ্বৈতবাদ সে প্রশ্ন তাঁর কাছে গৌণ; তাঁর প্রতি অটুট বিশ্বাস এবং ভক্তি স্থাপনই বিবেকানন্দের কাছে মুখ্য বলে মনে হয়েছে। কাজেই বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাঁর রামকৃষ্ণ-ভক্তি কেবল সামঞ্জস্য-পূর্ণ তাই নয়—রামকৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতিরেকে তাঁর নিজের কাছে অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ নয়। শঙ্করাচার্যের মত কঠোর বৈদান্তিকের মধ্যেও আমরা এক-ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তি দেখতে পাই।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ—পরমসত্তাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন—তাঁর কাছে জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা আর ধ্বংসকর্তারূপে স্বতন্ত্র কোনো ঈশ্বর স্বীকার করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে তর্ক আর বিচারের শেষ নেই; কিন্তু অতি কঠোর বৈদান্তিকও জীবন্মুক্ত অবস্থা পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। এই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যায়

এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর দ্বারা সৃষ্ট জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কোনো এক বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ লৌকিক ধারণা এবং লৌকিক ধর্মাচারের সীমাবদ্ধতা পরিষ্কার হয়। কোনো বিশেষ ধর্মের অনুশাসন আর তার মতানুযায়ী ঈশ্বরের রূপ সম্পর্কিত ধারণাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ মত পোষণ করলেও বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলির সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে। প্রত্যেক বিশেষ ধর্মের আংশিক সারবত্তা আর সেইগুলির আংশিক বাহুল্যগুলিও উক্ত বৃহত্তর আর ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তাধারা আলোচনা প্রসঙ্গে একথা অত্যন্ত সহজভাবে ধরা পড়ে।

ধর্ম মূলত ব্যবহারিক জগতের জিনিস। কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রধানত ব্যবহারিক জগতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও কোনো এক অর্থে একমাত্র ধর্মই জীবকে ব্যবহারিক জগৎকে অতিক্রান্ত করার উপায় নির্দেশ করতে সমর্থ। সাধারণভাবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা দুটি কারণে। এই ব্যবহারিক জীবনকে সর্বাত্মকভাবে সুষম ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে একমাত্র ধর্মই। অন্যকিছুই কি ব্যবহারিক জীবনকে সর্বাত্মক ভাবে সুষম আর সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে না? ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য বহু শাস্ত্রের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। সেগুলি কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? অথবা যদি সেগুলি একেবারে অপ্রয়োজনীয় না হয়, তবে কতটুকু তাদের প্রয়োজনীয়তা? আর তাদের প্রয়োজনীয়তা কোন্ অর্থেই বা ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার সমান নয়? ব্যবহারিক জীবনে অন্যান্য শাস্ত্রগুলির প্রয়োজনীয়তাবোধ—জীবন সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্রও সচেতনতা আছে, তিনি করবেন না। আর এই শাস্ত্রগুলির প্রয়োজনীয়তার স্বরূপও প্রায় প্রত্যেকের কাছেই পরিষ্কার। এই সমস্ত শাস্ত্রে আমরা পাই বিশ্বপ্রকৃতির বহুল বৈচিত্র্যের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের

ব্যাখ্যা—আর পাই, এই বহুল বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা। কাজেই এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় প্রতি পদে। প্রত্যেকটি শাস্ত্রই কোনো-না-কোনো উপায়ে ব্যবহারিক জীবনের কোনো-না-কোনো অংশকে কিছু পরিমাণে সুষ্ঠু করে তুলছে, জীবনের কোনো-না-কোনো অংশে কোনো-না-কোনো উপায়ে কিছু সামঞ্জস্য বিধান করছে। তাহলে ধর্মের সঙ্গে এই সমস্ত শাস্ত্রের পার্থক্য কোথায়? ধর্মের উৎকর্ষ কোথায়? এর উত্তর, একমাত্র ধর্মই পারে এই ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য আর সীমাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে আর এই ব্যবহারিক-জীবন-অতিক্রান্ত সেই পরম-পুরুষার্থের নির্দেশ সূচনা করতে। ধর্মের এই পূর্ণতা অন্য কোনোখানেই নেই। তবে ব্যবহারিক জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ধর্ম কখনই অত্যন্ত সাধারণ দিকগুলিকেও উপেক্ষা করতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনের যে কোনো সমস্যাই যেন ধর্মের পূর্ণতর আর ব্যাপকতর পটভূমিতে যথাযথ সমাধান খুঁজে পায়। এ প্রয়োজন যদি কোনো ধর্ম মেটাতে না পারে—তবে তার মূল্য কখনই সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে স্বামীজি একথা বলেছেন ঃ "If a religion cannot help man wherever he may be, wherever it stands, it is not of much use, it will remain only a theory for the chosen few—". *Practical Vedanta.* যেহেতু ধর্মকে এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—ধর্ম কখনই এমন হতে পারে না যে তার অন্তর্গত সমস্ত অনুশাসন আর আচার-নির্দেশ চিরকালের জন্যই অপরিবর্তিত থেকে যাবে। কোনো ধর্মের সকল অংশই যে ধ্রুবসত্য—আর তা সকল সময়ের সকল দেশের সকল লোকের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য এমন কথা বলা যায় না। ধর্ম যে একেবারেই অনড় অচল কিছু নয় একথা বোঝানোর জন্য বিবেকানন্দ বলেছেন, "কোনো দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই

প্রয়োজন। কোনো দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বাচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকারে যে জাতিতে বা ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।”

কিন্তু বিবেকানন্দ নিজেই আবার বলেছেন, “প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে ধর্মে যাচাই চলিবে না”। কেবল তাই নয় ধর্মের ভেতরেই যে কোনো কিছু শাশ্বত বর্তমান—সমস্ত কালের সমস্ত ধর্মের ভেতরেই একটিমাত্র ধ্রুবসত্যের অনুসন্ধান চলেছে—একথাও বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন ঃ “It has been the search of all nations, it is the goal of religion and this ideal is expressed in various languages in different religions.” —*God in everything*

বিবেকানন্দের এই দুই ধরনের উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছু বিরোধিতা আছে বলে হয়ত মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভাবলেই ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা অত্যন্ত সুসঙ্গত বলে ধরা পড়ে। ধর্ম কোনো অচলায়তন নয়, আচার-সর্বস্ব কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র নয়—একথা যেমন সত্য—তেমনি সত্য ধর্মের কাজ কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যবহারিক জগতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সীমাবদ্ধ নয় ; এই ব্যবহারিক জীবনেই জীবের কাছে সেই পরমসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সেই পরমপুরুষার্থকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে সচেষ্ট করাই ধর্মের প্রধানতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিচার করলেই বোঝা যায় সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের ধর্মে নিহিত সেই শাশ্বত ধ্রুব সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। একথা সত্য যে সকল ধর্ম সমানভাবে এই মূল সত্যটি উদ্ঘাটনে সমানভাবে সচেষ্ট হয় নি। তবে যে-ধর্ম এই সত্যটিকে যত পরিস্ফুট করেছে তার বক্তব্যের ভেতরে—সেই ধর্মই তত বেশী সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

সাধারণতঃ সকল ধর্মেই এই শাশ্বত ধ্রুব সত্যটি কেন্দ্রভূত হয়েছে ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে। ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আমরা স্বামীজির চিন্তাধারায় কি পাই? প্রশ্ন উঠতে পারে—বেদান্তের অদ্বৈতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী—যাঁরা চৈতন্যস্বরূপ এক সত্তায় বিশ্বাসী—ঈশ্বরের ধারণায় তাঁদের বিশ্বাস কতখানি যুক্তিসঙ্গত, ঈশ্বর বলতেই আমরা বুঝি অতিলৌকিক একটি সত্তা—যিনি অতিলৌকিক হলেও, এই লৌকিক জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সর্বতোভাবে এই লৌকিক জগতের সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রক। কিন্তু জগৎকে যদি সত্য বলে স্বীকার না করি তা হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সত্য বলে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবুও লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বাদ দেওয়া যায় না। এব আগেই আমরা দেখেছি বেদান্তের মতবাদকে স্বামীজি বাস্তব জীবনের সঙ্গে খাপখাইয়ে এবং ব্যবহারিক বস্তুজগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়েই গ্রহণ করেছিলেন। তাই লৌকিক জগতের সীমার মধ্যেও যার প্রয়োজনীয়তা আবদ্ধ তার গুরুত্বও বিবেকানন্দের কাছে কিছু কম ছিল না। তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। কেবলমাত্র লৌকিক জগৎ বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়—এই ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে পারমার্থিক ক্ষেত্রে উত্তরণের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের ধারণাকে স্বামীজি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। চৈতন্যস্বরূপ পরম-সত্তার সাক্ষাৎকারের উপর হিসাবে স্বামীজি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম এবং ভক্তির গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। লৌকিক জগতে কর্ম আর ভক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরে নিয়োজিত হলেই চৈতন্যস্বরূপ পরম-সত্তার সাক্ষাৎকারের উপায় হতে পারে—এই বিশ্বাস স্বামীজির মনের গভীরে উপ্ত ছিল।

যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী—ঈশ্বরের স্বরূপ, ঐশ্বর্য আর সৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে একাধিক বিশ্বাস প্রচলিত। কেউ বা এক-ঈশ্বরে

বিশ্বাসী, কেউ বা একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; কেউ উপাসনা করেন নিরাকারের—কেউ পূজা করেন সাকারের, কেউ বা ঈশ্বর মানার জন্য জাগতিক সমস্ত কিছুর থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে চান—কেউ বা আবার বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজির মতের দুটি দিক সম্বন্ধে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন; একটি হল—ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা,—অপরটি হল অপরাপর ধারণাগুলির প্রতি তাঁর মনোভাব।

বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই একই সত্যের কথা প্রচার করা হয়েছে। অথচ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কথা পাওয়া যায় সেগুলি কোনো কোনো অংশে পরস্পর-বিরোধী; অথচ প্রত্যেক ধর্মই ত' এক সত্য প্রচার করতে চান। এ বিরোধের মীমাংসা কি করে সম্ভব? ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণাকে যাঁরা লৌকিক আচার আর সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখেন না—তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সরল। বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্যগুলির আপাত বিরোধিতা সমন্বয়ে বিবেকানন্দ তাই অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পেরেছেন। তাঁর মতে, "Through high philosophy or low, through the most exalted mythology or the grossest, through the most refined ritualism or arrant fetishism every sect, every soul, every nation, every religion, consciously or unconsciously, is stuggling upward, towards God; every vision of truth that man has is a vision of Him and of none else..."

"Suppose we all go with vessels in our hands to fetch water from a lake. One has a cup, another a jar, another a bucket, and so forth, and

we all fill our vessels. The water in each case naturally takes the form of the vessel carried by each of us. He who brought the cup has the water in the form of a cup, he who brought the jar—his water is in the shape of a jar; and so forth; but in every case, water and nothing but water, is in the vessel. So it is in the case of religion; our minds are like these vessels, and each one of us is trying to arrive at the realization of God. God is like that water filling these different vessels, and in each vessel the vision of God comes in the form of the vessel. Yet he is One. He is God in every case. This is the only recognition of universality that we can get."

—*The Ideal of a Universal Religion.*

সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত চরম সত্যটি এক হলেও তাদের বৈচিত্র্য-গুলির এবং প্রত্যেক ধর্মের আপন বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন নি। তিনি কখনই চাননি যে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে যে কোনো একটি অথবা সমস্ত ধর্মগুলি মিলিয়ে একটি মাত্র ধর্মকে স্বীকার করলেই চরম সত্যটি আরও সহজেই চরিতার্থ হবে। এ প্রসঙ্গেই তিনি বলছেন, "What then do I mean by the ideal of a universal religion? I do not mean any one universal philosophy, or any one universal mythology, or any one universal ritual, held alike by all, for I know that this world must go on working, wheel within wheel, this intricate mass of machinery, most complex, most wonderful. What can we do then? We can make it run smoothly, we can lesson the friction, we can grease the wheels, as it were. How? By recognizing the natural necessity of variation. Just as we have recognized

unity by our very nature, so we must also recognize variation. We must learn that truth may be expressed in a hundred thousand ways, and that each of these ways is true as far as it goes. We must learn that the same thing can be viewed from a hundred different standpoints, and yet be the same thing."

—*The Ideal of a Universal Religion.*

শিকাগোর বিশ্বধর্মসভায় বক্তৃতায় এক অংশে বিবেকানন্দ বলেছেন, "The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth."

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী যারা—তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক সময়েই নানাভাবে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কখনও কোনো একটি ধর্মের অনুগামীরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য অন্য ধর্মের লোকেদের ওপর বলপ্রয়োগ করেছে—বাধ্য করার চেষ্টা করেছে তাদের নিজেদের ধর্মের অনুগামী করার ; কখনও আবার একটি ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকেদের হেয় জ্ঞান করে নিজেদের ধর্মের কাছে তাদের ঘেঁষতে দেয় নি। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধের ফলে পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত ঘটে গেছে। ধর্মবিশ্বাসের এই ভয়ঙ্কর পরিণতিতে মাঝে মাঝে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—বিভিন্ন ধর্মের মধ্যের এই বিরোধ সম্পর্কে। এই বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়েছে বার বার। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে একটি মাত্র ধর্মের অনুশাসনে সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এ ইতিহাস সুস্পষ্ট ছিল। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমস্ত ধর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের পথ তিনি খুঁজেছিলেন—সমস্ত ধর্মের আপন আপন বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে : "...Is there

any way of practically working out this harmony in religions? We find that this recognition that all the various views of religion are true is very very old. Hundreds of attempts have been made in India, in Alexandria, in Europe, in China, in Japan, in Tibet and lastly in America, to formulate a harmonious religious creed, to make all religions come together in love. They have all failed, because they did not adopt any practical plan. Many have admitted that all the religions of the world are right, but they show no practical way of bringing them together, so as to enable each of them to maintain its own individuality in the conflux. That plan alone is practical which does not destroy the individuality of any man in religion, and at the same time shows him a point of union with all others."

—*The Ideal of a Universal Religion.*

কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বরে ধারণা যদি কেবলমাত্র লৌকিক আচার আর সংস্কারের গণ্ডীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এ ধরনের সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। কোনো বিশেষ ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কিত যে বিশেষ ধারণা পোষণ করা হয় তার বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে প্রধানত সেই ধর্মের অনুগত বিশেষ ক্রিয়াকর্মসম্পর্কিত বিধি-নিষেধের মধ্যে। এগুলির প্রয়োজনীয়তা—যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং ধর্মে আস্থাবান—তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কাজেই প্রত্যেক ধর্মের আপন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন সত্যই যে নেই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে এইটাই শেষকথা নয়। সমস্ত ধর্মে যে একই সত্য নিহিত—একথা যখন বলা হয়—তখন সেই সত্য আরও ব্যাপক আরও গভীর। সেই সত্য জানতে গেলে কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অন্ততঃ একবার ছাড়িয়ে যেতে হবে। আর এই পরম সত্য অবহিত হলেই কোনো একটি বিশেষ ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে

স্বীকার করে নিয়েও সমস্ত ধর্মের অন্তর্গত মূল যোগসূত্রস্বরূপ সেই পরম সত্য চরিতার্থ করার চেষ্টাও বলবৎ থাকবে। বিবেকানন্দের মানসচক্ষে এই তাত্ত্বিক সত্যটি উদ্ভাসিত ছিল বলেই তাঁর সর্বধর্মের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা অনেক বেশী প্রয়োগানুগ হয়েছিল।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত থাকলেও হিন্দুধর্ম যে আপন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য ধর্ম থেকে শ্রেয়—এ স্থির বিশ্বাস বিবেকানন্দের ছিল। আর এই বিশ্বাস তাঁর অন্তরে উৎসারিত হয়েছিল তার কারণ হিন্দুধর্মকে তিনি বুঝেছিলেন উপনিষদের আলোকে। আর একমাত্র উপনিষদের আলোকে বুঝলেই বিবেকানন্দ যে ভাবে বুঝেছিলেন সেইভাবে বিভিন্ন ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এইখানেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। আমেরিকার বিশ্বধর্মসভায় হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মূল সুর ছিল এই। বিশ্বধর্মসভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"To the Hindu, then, the whole world of religions is only a travelling, a coming up, of different men and women, through various conditions and circumstances, to the same goal. Every religion is only evolving a God out of the material man, and the same God is the inspirer of all of them—why, then, are there so many contradictions? They are only apparent, says the Hindu. The contradictions come from the same truth adapting itself to the varying circumstances of different natures. It is the same light coming through glasses of different colours. And these little variations are necessary for purposes of adaptation. But in the heart of everything the same truth reigns."

বেদান্ত অথবা হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কিত যা ধারণা তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। কাজেই বিবেকানন্দের নিজস্ব ধারণাটি নির্দিষ্টভাবে খুঁজে

পাওয়ার চেষ্টার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর এক ; কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জগৎ কি তাঁর থেকে পৃথক্? জগতের এ আপাত বহুত্ব—তাও কি ঈশ্বরেরই প্রকাশ? এ সম্বন্ধে তাঁর মত,—"যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্যপ্রতিরূপমাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোনো ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে। এরূপে এখনও যদিও সকলকেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই সব এক হয়ে যাবে।" এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ। সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে আমরা সর্বেশ্বরবাদ বলি তা আসলে একেশ্বরবাদই। কারণ 'সর্ব' ত আসলে 'এক'ই, সেই 'এক'ই 'সর্ব' ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। 'সব' 'একে'র ইচ্ছামাত্র। 'সাকার' ও 'নিরাকারে' কোনো পার্থক্য নেই। কারণ ব্যবহারিক জগতে যা আকার—পারমার্থিক পরিপ্রেক্ষিতে তাই ত' নিরাকার তত্ত্বমাত্রে পরিণত হয়।

সমস্ত কিছুই যে ঈশ্বরের প্রকাশ—তা কেবল পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্য নয় ; ব্যবহারিক জগতেও সর্বজীবেই ঈশ্বরের প্রকাশ। ব্যবহারিক জগতেও জীবের পক্ষে অকল্যাণকর কিছুই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কাজেই ধর্মের অনুশাসন অথবা বিধিনিষেধে —জীবের পক্ষে অকল্যাণকর কিছু থাকে—তবে তা কোনো মতেই প্রকৃত ধর্ম বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। আধুনিক চিন্তাধারায় মানবতাবাদের যে উন্মেষ দেখা যায় তা যে উপনিষদের চিরন্তন বাণীর মধ্যেও উক্ত হয়েছে এই সত্য বিবেকানন্দ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কাজেই ধর্মের আচার অথবা সংস্কারে অকল্যাণকর কিছু দেখলেই তাকে তীব্র নিন্দা করেছেন বিবেকানন্দ। যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার তাঁর জীবনের প্রধানত ব্রত ছিল সেই হিন্দুধর্মের ভেতরেও যে কিছু কিছু সংস্কার আর আচারকে বর্জন করতে হবে একথা তিনি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

উপনিষদে যে তত্ত্বে পৌঁছানোর নির্দেশ আছে জ্ঞানের সাহায্যে—সেই একই তত্ত্বে পৌঁছানোর নির্দেশ রয়েছে গীতায়—কর্মের মাধ্যমে। মানুষ যতদিন এই ব্যবহারিক জগতে দেহ ধারণ করে বাঁচবে কর্মকে সে কখনই বর্জন করতে পারে না। কিন্তু কর্ম মানেই সাধারণতঃ আমরা বুঝি এমন কিছু যার পেছনে রয়েছে কোনো ইচ্ছা। ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায়ই হচ্ছে কর্ম। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করার পরও কর্ম সম্ভব কি করে? কর্ম অপরিহার্য—অথচ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে তার রয়েছে আপাত-বিরোধ। এই আপাত-বিরোধের সমাধান রয়েছে গীতায়। কর্মকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে—তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্যে পৌঁছানোর নির্দেশ রয়েছে বলেই ব্যবহারিক জগতের জীবের কাছে গীতার কথা তাই অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। এ কথা বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন—তাই তাঁর সারা জীবনের মধ্য দিয়ে গীতার উপদেশ প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই আমরা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, ব্যবহারিক জগতে জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত মানুষের কাছে সে উপদেশের উপযোগিতা অমূল্য তা বিবেকানন্দের কাছে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান ছিল।

বিবেকানন্দের বেদান্ত সম্পর্কিত ধারণা, ঈশ্বর ও ধর্মের বিষয়ে মত আলোচনা করার পরও স্বতন্ত্রভাবে 'গীতাতত্ত্ব' সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়—যখন দেখি সমগ্র বেদ, বেদান্তের ঊর্ধ্বেও গীতার স্থান—এই বিশ্বাস বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিশদভাবে উল্লেখ করেন। গীতায় কোনো নতুন তত্ত্বের অবতারণা করা হয়নি। বেদ-উপনিষদে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে—সেগুলিকেই গীতায় পুনরুক্তি করা হয়েছে। বিবেকানন্দ গীতার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেয়েছেন সেগুলি তিনি বিশদ ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বেদ এবং উপনিষদের অসংখ্য

শ্লোক এবং সূত্রের মধ্যে সকলের পক্ষে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নয়—অথচ গীতায় সেই কথাগুলিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উপনিষদে যে সমস্ত মহাবাক্যগুলি বলা হয়েছে সেগুলির নিহিতার্থ অনুধাবন করা অনেক সময়েই খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে; তার কারণ, এই মহাবাক্যগুলির অবতারণা অনেক সময়েই অপ্রাসঙ্গিকভাবে করা হয়েছে। গীতায় সেই সমস্ত সত্যই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে? "উপনিষদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতা কি— গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া!" "উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। .... দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।" "গীতা উপনিষদের ভাষ্য।"

কিন্তু গীতার গুরুত্ব শুধু এর ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়। বেদের দুই অংশ। একটি দার্শনিক অংশ—উপনিষদ—অপরটি কর্মকাণ্ড। কিন্তু এই দুই অংশের মূল বক্তব্যের ভেতরেও অনেক বিরোধ দেখা দেয়। গীতায় এই দুই বিরোধী বক্তব্যের সামঞ্জস্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। বেদের কর্মকাণ্ডের মূল কথা ভোগ। ইহলোকেও ভোগ—সুখ, আনন্দ। পরলোকেও স্বর্গে অনন্ত সুখ। আর এই দুই প্রকার সুখলাভের উপায় বিশেষ কর্মধারা অনুসরণ করা। এর জন্য প্রয়োজন নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ড, যজ্ঞ ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্মসাধনের জন্য পুরোহিতের ওপর নির্ভর করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে "উপনিষদ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত

হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায়, ততই চায়। ফলে মানুষ হাসিকান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে— কখনও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না; অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র। একই শক্তি সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।"

দ্বিতীয়তঃ, বেদের কর্মকাণ্ডে মানুষকে চিরকালের জন্য প্রকৃতির দাস হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে। কর্ম একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আর এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায়ই নেই। অনন্তকাল প্রকৃতির ক্রীতদাসরূপে থাকতে হবে। পুরোহিতদের যথাযথ দক্ষিণা দিয়ে নির্দিষ্ট আচার আর যাগযজ্ঞ করলে কেবল এই দাসত্বকে সুখের করা যায়। অন্যদিকে উপনিষদ কর্মের নিয়মকে স্বীকার করলেও এই নিয়মের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুক্তি-পথের সঙ্গে মীমাংসক কথিত ক্রিয়া-কাণ্ডের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

এই বিরোধগুলির সমাধানের ইঙ্গিত একমাত্র গীতায় পাওয়া যায়। গীতায় বলা হয়েছে—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।"—অর্থাৎ, প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিতে পারে? কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে গীতায় মানুষকে নিজের শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে নিজের প্রকৃতিকে অতিক্রম করার কথাও বলা হয়েছে। "যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল—তখন এই বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জনসাধারণের মতামতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন।" "অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধন পথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কাম

কর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্মত্যাগ করিয়া কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ জীবনে কর্ম ত্যাগ করিয়া থাকা মুহূর্তমাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম ত্যাগ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর।" "পরা শান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্ম ত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।" গীতার এই উপদেশের মধ্যেই জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে। ত্রিভুবনে ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নেই, তবুও তিনি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছেন। তিনি যদি মুহূর্তের জন্যও কর্ম থেকে বিরত হন, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবে। গীতার এই সারমর্ম বিবেকানন্দের কাছে সব থেকে প্রয়োজনীয় কথা বলে মনে হয়েছিল।

গীতার উপদেশের আরেক বৈশিষ্ট্য হল কর্মবাদের সঙ্গে অনাসক্তির সমন্বয়। নিষ্কাম কর্মের উপদেশ। কর্মে ব্যাপৃত থেকেই কর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। আমরা কার্যে আসক্ত হই—সেইজন্যই আমাদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেবল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করলে—সেই কর্ম আর কোনো নতুন ফল উৎপন্ন করে না বরং কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করলেই কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু একেবারে আসক্তিশূন্য হয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করা কার পক্ষে সম্ভব? এই নিরাসক্ত—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে? যিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের মধ্যেই সেই পরমতত্ত্ব-স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন—সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ক্রোধ থেকে মুক্ত—তিনিই এই নিষ্কাম কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন।

গীতায় যে কেবল জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করা হয়েছে তা নয়—গীতায় জ্ঞান ও ভক্তিরও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ভক্তির কথা বলেছেন—তার অর্থ নিষ্কাম ভালবাসা। একমাত্র প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিই নিষ্কাম ভালবাসা সম্ভব। "যে-কেহ ভক্তিভরে আমার উদ্দেশে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।"—এই হল ভক্তের প্রতি গীতার আশ্বাস। "যদি শক্তি থাকে, বেদান্ত দর্শনের ভাব গ্রহণ কর এবং স্বাধীন হও। যদি তাহা না পারো তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পারো, কোনো প্রতিকারের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও যদি না পারো, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সৎকাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে, ভগবানের সেবায় উৎসর্গ কর।...যদি তুমি কিছুই করিতে না পারো, একটি সৎকাজও যদি তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে প্রভুর শরণ লও।"

গীতার যে ভাবটিকে বিবেকানন্দ মূল কথা বলে স্বীকার করেছেন তা হল,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—পার্থ, তুমি বীর, তোমার এ ক্লীবতা সাজে না। বিবেকানন্দের মতে এই একটি শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাওয়া যায়—কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত। "আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বধ্যুপপদ্যতে'—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি-স্বরূপকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ—এ তো তোমার সাজে না।...যে-কোনো কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ।" (গীতাতত্ত্ব)

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন—তেমনই পরবর্তী যুগে ধর্মের পথে সকলকেই

প্রবেশাধিকারের কথা ঘোষণা করেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব সকলের জন্য ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন 'কর্মে'র কথা প্রচার করে। এই জন্যই বিবেকানন্দের কাছে বুদ্ধদেবের স্থান ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই মত। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের সকল মতের সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, "অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও স্বীকার করেছেন, "জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনোরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর'।"

নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তাঁর কারণ, "বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনোরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোনো মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ"। বুদ্ধদেব এই চরমাবস্থা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন কর্মের দ্বারা। "তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।"

হিন্দুধর্মের মূল কথা হল ঈশ্বর আর ভক্তি। এ দুটি বর্জন করে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অথচ বুদ্ধদেব বললেন— ঈশ্বর নেই, আত্মাও নেই, আছে শুধু কর্ম। বিবেকানন্দ ঈশ্বর এবং

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারকে বুদ্ধের মূল শিক্ষা—কর্মই আসল—এর পরিপন্থী বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, বুদ্ধদেব দেখেছিলেন—ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। "সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তা'হলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে বলো? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরি কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন।" বুদ্ধের শিক্ষা—পূজা প্রার্থনার কোনো দরকার নেই। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা? আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা।···সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা।"

বুদ্ধদেবের শিক্ষার প্রতি বিবেকানন্দের আকর্ষণের আর একটি কারণ তাঁর বিস্ময়কর ভালবাসা।"····যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখ মোচন ভিন্ন অপর কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।" "মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল।····এই সর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।" "একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন।····তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি একথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?' ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না ভগবান, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণময়।' ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী

হওয়ার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন' ?"

বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ ধর্মের যথার্থ গুরুত্ব বুঝতে গেলে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হবে গৌণ। কারণ, "পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল। এই কারণে বুদ্ধদেবের চিন্তা-ধারার মূল্যায়ন করেছিল ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে। বিবেকানন্দের কথাতেই, "যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম, সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান্ ধর্মনেতার—আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল।" "প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন। কিন্তু তুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন—ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে।' এইভাবে সত্যবস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ করল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণ বার বার এসেছেন।" বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এই-সব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। বেদের একটি মাত্র শব্দও কোনো বেচারীর কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হ'ত। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল।

"অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মতো অনন্ত হৃদয়। তিনি

দেখলেন জনসাধারণ কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কি ভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। ······মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ······ইনিই মহামানব বুদ্ধ।” “ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান্ বিজয়রূপে দেখা দিলেন।”

বুদ্ধদেব সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের বিস্তারিত উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যে যে বিষয়ে বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন —ঠিক সেই সেই বিষয়গুলিই আমরা বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনে আর চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত দেখি। প্রথমতঃ, বুদ্ধদেবের চিন্তাধারায় গভীর মানবতাবোধ এবং সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণ চিন্তা। বুদ্ধদেব অতি-মার্ত্য কোনো পরিমণ্ডলের কথা চিন্তা করেননি —চৈতন্যস্বরূপ অথবা অন্য কোনো রূপবিশিষ্ট পরম সত্যের চরিতার্থের কথা ভাবেননি। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের ব্রতকে চরিতার্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হতে দেখি বিবেকানন্দের কর্মে ও চিন্তায়। বুদ্ধদেবের কর্মের পথ গ্রহণ ও অন্ধ ধর্মীয় আচার আর সংস্কারের বিরুদ্ধে ঐকান্তিক সংগ্রামও সর্বতোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ও কর্মময় জীবনে।

বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ যাঁরা গ্রহণ করেন, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে তাঁদের চিন্তাধারায় ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের মনের মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। আমাদের

জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তুর সম্পর্কে অনুভূত মূল্যবোধের সঙ্গে সেই পরমার্থের যেন কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর, নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি কোনো বিশেষ ধারণা যে অদ্বৈতবাদ থেকে নিঃসৃত হতে পারে একথা হঠাৎ যেন মানা যায় না। ভারতীয় চিন্তাধারায় যে যে অংশে আমরা বেদান্তের স্ফুরণ দেখতে পাই— প্রায়ই সেগুলি সম্বন্ধে এক বিশেষ অভিযোগ উত্থাপিত হয়—তা হ'ল বেদান্ত দর্শনে নীতি-শাস্ত্রের কোনো স্বতন্ত্র স্থান নেই। অবশ্য ভারতীয় দর্শনের যে-কোনো চিন্তাধারাতেই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক মূল্য সম্পর্কিত যে-কোনো ধারণাই চারটি পুরুষার্থের সমন্বয়-সাধন অথবা কর্মবাদের ভেতরেই নিহিত আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের ভেতরে সমন্বয়-সাধনের ভেতরেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নৈতিক আদর্শ চরিতার্থ করার উপায় নিহিত আছে— সাধারণতঃ এই রকমই মেনে নেওয়া হয়। এ ছাড়া আমাদের প্রত্যেক কর্মের দ্বারাই কোনো-না-কোনো পাপ অথবা পুণ্য উৎপন্ন হয়—যা ভোগ করতে আমরা বাধ্য। কাজেই কোনো কর্মের নৈতিক মান স্থির করাও হয়—সেই কর্মদ্বারা উৎপন্ন পাপ অথবা পুণ্যের মানদণ্ডে। পরম তত্ত্বের সিদ্ধির সঙ্গে অথবা এই ব্যবহারিক জগতের তাত্ত্বিক সত্যতা অস্বীকারের সঙ্গে—এই নৈতিক আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান কতখানি সম্ভব সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে—কিন্তু উপনিষদের মূল সত্য মেনে নিয়েও যে ব্যবহারিক জীবনের কর্ম সম্বন্ধে পাপ-পুণ্যের মান নির্দেশ করা সম্ভব—তার প্রমাণ পাওয়া যায় গীতায়। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় গীতার প্রভাব অথবা গীতার চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি—এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা আগে করা হয়েছে—নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে স্বামীজির চিন্তার পরিচয় তা থেকেই কিছুটা স্পষ্ট হয়।

নৈতিক লক্ষ্য বা আদর্শকে অনেক সময়েই কোনো বৃহত্তর আদর্শের অংশবিশেষ বা তার অনুবর্তী কোনো আদর্শ বলে মনে করা হয়। ভারতীয় ভাববাদে এক পরমপুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে।

গীতায় সামগ্রিকভাবে ভাববাদী এই পরমপুরুষার্থকে গ্রহণ করা হলেও ব্যবহারিক জগতের মানুষের জীবনের বিভিন্ন আদর্শগুলির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। নৈতিক আদর্শ বা লক্ষ্য—সেই পরমপুরুষার্থেরই বিশেষ পর্যায়ের একটি রূপমাত্র। এই বিশেষ পর্যায়ের আদর্শের নৈতিকতা কেবল এই ব্যবহারিক জগতেই সীমাবদ্ধ। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক জগতে অস্তিত্ব বজায় রাখছে—ততক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত কাজের জন্যই সে নৈতিক দায়ে আবদ্ধ। আবার এই নৈতিক দায়িত্ব পারমার্থিক পর্যায় থেকে বিবেচনা করলে এর কোনো গুরুত্বই থাকে না।

নৈতিক আদর্শ কোনো একটি বৃহত্তর আদর্শের বিশেষ পর্যায়ের প্রকাশ হলেওযেহেতু ভারতীয় ভাববাদের সেই পরম পুরুষার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যবহারিক জগতের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—মানুষের ব্যবহারিক জগতের কাজগুলির নৈতিক মান বিচারের জন্য এই ব্যবহারিক জগতের উপযোগী কোনো বিশেষ মাপকাঠির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবহারিক জগতের উপযোগী এইরূপ একটি মানদণ্ডের কথা গীতায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচার সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তা তারই অনুবর্তী।

মানুষের ব্যবহারের নৈতিক মান নিরূপণের পূর্বে আমাদের একটি ধারণাকে গ্রাহ্য বলে ধরে নিতে হয়। এই ধারণাটি হল এই যে, মানুষের যে কাজের নৈতিক মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে যাচ্ছি, সেই কাজটিকে আমরা স্বনিয়ন্ত্রিত কাজ বলে মনে করব। পরমব্রহ্ম অথবা তদনুরূপ কোনো অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে মেনে নিলে ব্যক্তির ব্যষ্টিগত সত্তাকে স্বীকার করা যায় না। কাজেই কোনো ব্যক্তি-বিশেষের কাজকেই স্বনিয়ন্ত্রিত বলা যায় না ও তার কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণেই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অথবা পরমপুরুষার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে

নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব ম্লান বলে প্রতীয়মান হয়। কেবল পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেও ব্যক্তিবিশেষের কর্ম কতদূর স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারে, আদৌ স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারে কিনা এবং যদি স্বনিয়ন্ত্রিত হয়—তাহলে তা কোন্ অর্থে—এই সমস্ত দিক্‌গুলি বিচার করার প্রয়োজন আছে। প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শনচিন্তায় কর্মবাদকে স্বীকার করা হয়েছে। কর্মবাদ মানলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিবিশেষের সমস্ত কর্মই পূর্ব কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং সমস্ত জগৎসৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে একটি মাত্র কর্মবীজ। তাই যদি হয়, ব্যক্তি-বিশেষের কর্মের স্বনিয়ন্ত্রিতা রক্ষা করা কি ভাবে সম্ভব? গীতায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে, এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রধানতম উৎস হল এ প্রসঙ্গে গীতার উপদেশ।

যে পরম সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—ব্যবহারিক জীবনের কর্মধারার মাধ্যমেও তা সম্ভব? কিন্তু কর্ম-ধারার মাধ্যমে পরম সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধিকে সম্ভব করতে হলে সেই কর্মধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। কর্মের এই বিশেষ নিয়ন্ত্রণই হল নৈতিক নিয়ন্ত্রণ। আমাদের কর্মকে নৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন—সেই নিয়ন্ত্রণের সাহায্যেই আমরা আমাদের কর্মকে চরম লক্ষ্যের অনুগামী করতে পারব। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে যে চরম লক্ষ্যের অনুবর্তী না হলে সে কর্ম কখনই নৈতিক লক্ষ্যের অনুবর্তী হতে পারে না। কিন্তু চরম লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই নৈতিক লক্ষ্যের অন্য লক্ষণও নিরূপণ করা সম্ভব—আর সেই লক্ষণই ব্যবহারিক জগতের মানুষের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিরূপণ করা সম্ভব—নৈতিক আদর্শের এই লক্ষণটি কি? বেদের বিভিন্ন অংশে (প্রধানতঃ

কর্মকাণ্ডে) এবং অন্য কোনো কোনো শাস্ত্রে উক্ত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ থেকে এই লক্ষণ নিরূপণ করা সম্ভব। কিন্তু গীতায় এই লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। বিবেকানন্দের চিন্তায় গীতার এই মূলসূত্রটিই আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। ব্যবহারিক জগতে ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তা থাকলেও তার এই সত্তা কখনই সম্পূর্ণ ভাবে এক-কেন্দ্রিক নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তা নানা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ। রক্ত-মাংসে গড়া ইন্দ্রিয়গত শরীর-বিশিষ্ট মানুষও তার সত্তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে কল্পনা করে বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের জীবন কখনই সম্পূর্ণভাবে স্থূল ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত নয়—এক অর্থে মানুষের ব্যক্তিত্ব তার ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। এই দিক থেকে বিচার করলে বিভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তার পারস্পরিক বন্ধনটি আরও অনেক বেশী নিবিড় বলে বোঝা যায়। যে কর্মের সাহায্যে মানুষ এই নিবিড় বন্ধনটিকে উপলব্ধি করে—স্বীকার করে নিয়েও তার বিশিষ্ট সত্তার বিকাশ সাধনে সফল হতে পারে—সেই কর্মই তাকে নৈতিক লক্ষ্যের নিকটতর করে। যেহেতু সে আপন বিশিষ্ট-সত্তার বিকাশ সাধনের জন্য পরস্পরের নিবিড় বন্ধনটিকে স্বীকার করে নেয়—তার নিজস্ব বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ম অপর ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তার বিকাশ সাধনের সহায়ক হয়। এই জন্যই নৈতিক আদর্শের অনুগামী কোনো কর্মই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে—সাধারণ ও বিশেষের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটায় না। বরং যেহেতু একের বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের বিকাশ সাধনও সম্ভব হয়—নৈতিক আদর্শের অনুগামী কর্ম বিশেষ ও সাধারণের মধ্যে যে বিরোধ থাকে—তাকে ক্রমশঃই দূর করে। বিবেকানন্দ এ কথাও স্বীকার করেন যে ব্যবহারিক জগতের কোনো অবস্থাই ধ্রুব ও পরিবর্তনহীন নয়। কাজেই বিভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তা সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে এক অবশ্যপ্রয়োজনীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও এই পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ পরিবর্তনশীল।

কাজেই নৈতিক আদর্শের অনুগামী যে কর্ম এই পারস্পরিক সম্পর্কটিকে সার্থক করে—তার রূপও পরিবর্তনশীল। তা ছাড়া, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্কটি অবহিত হয়—কাজেই নৈতিক আদর্শের অনুগামী কর্মপন্থার আপেক্ষিকতাও বিবেকানন্দ স্বীকার করেন।

একমাত্র মানুষের স্বনিয়ন্ত্রিত কর্মেরই নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু কর্মের এই স্বনিয়ন্ত্রণ কতখানি সম্ভব? প্রত্যেক মানুষই তার পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগী এবং তার প্রত্যেক কর্মই তার পূর্বকৃত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত: কাজেই কর্মের নৈতিক মান বিচারের অবকাশ কোথায়? মানুষের প্রত্যেক কর্মই ফল উৎপন্ন করে—এ কথা যখন বলা হয়—তখন এই বোঝান হয় যে ফলের ঈপ্সা যে কর্মের উদ্যোক্তা সেই কর্মই ফল উৎপাদন করে। আর ফলের ঈপ্সা তখনই থাকে যখন কর্ম হয় অজ্ঞাতপ্রসূত কিন্তু ফললাভের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কি কোনো কর্ম সম্পাদন সম্ভব? ইচ্ছা না থাকলে কর্মই সম্ভব হয় না। ফললাভের ইচ্ছা ছাড়া সমস্ত কর্ম অসম্ভব হলেও এই ফল যে সর্বদাই তাৎক্ষণিক ফল হবে—এমন কোনো কথা নেই। কেবল মাত্র তাৎক্ষণিক ফল লাভের ইচ্ছায় যে কর্ম করা হয়—সেই কর্মই ফল উৎপাদন করে ও বন্ধন সৃষ্টি করে আমাদের স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট করে। কাজেই তাৎক্ষণিক ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করে আত্যন্তিক ফললাভের জন্য কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। তবেই ব্যক্তির পক্ষে স্বনিয়ন্ত্রিত কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের কর্মে এই আত্যন্তিক ফললাভের ইচ্ছা কি করে সম্ভব? ব্যবহারিক জগতের কর্ম কখনই সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবিশেষের স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। তবুও যে কোনো ব্যক্তি যথার্থ চেষ্টার সাহায্যে—নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং তাৎক্ষণিক ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারে এবং তার বিশিষ্ট সত্তার মধ্যেই সর্বজনীন সত্তা অনুভব করে বৃহত্তর এবং অনেকগত

ফললাভের ইচ্ছার চেষ্টা করতে পারে,—একমাত্র এই ভাবেই ব্যক্তি তার স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মকে নৈতিক মূল্যায়নের উপযুক্ত করতে পারে। কর্মের সাহায্যে ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে সর্বজনীন সত্তা অনুভব করতে না পারলে সে কখনই পরম সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে না।

গীতার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ধারণা কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে ; কর্মের যথাযথ ভূমিকার স্বীকৃতিই বিবেকানন্দের কাছে গীতার মূলসূত্র বলে প্রতিভাত হয়েছিল। একই কারণে বুদ্ধদেবের প্রতিও বিবেকানন্দ অটুট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বুদ্ধদেব কোনো তাত্ত্বিক পরমসত্তার কথা মানেননি। অথচ তিনি কর্মবাদ স্বীকার করেছিলেন। পূর্বকৃত কর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই তিনি কোনো রকম আত্যন্তিক ও তাত্ত্বিক ফললাভের কথা বলেননি। ব্যবহারিক জগতে ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তার মধ্যে সর্বজনীন সত্তাকে স্বীকার করার ভেতরেই তিনি দেখেছিলেন কর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ। কর্ম ব্যক্তিকে নয় বরং ব্যক্তিই কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে—নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তায় এইটিই প্রধানতম কথা।

ব্যবহারিক জগতে ব্যক্তি তার স্বকীয় সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়—তেমনি ব্যবহারিক জগতে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার সমষ্টিগত দিকটি বিচার করলে আমরা পাই সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ যে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা কিছু এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ তাকে যে লক্ষ্যের দিকে চালিত করে—সামাজিক মূল্যবোধ সেই একই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে সমষ্টিগত ভাবে চালিত করে। যেহেতু নৈতিক মূল্যবোধ কখনই সমষ্টিকে অস্বীকার করতে পারে না—সামাজিক মূল্যবোধকে

আমরা নৈতিক মূল্যবোধেরই আর একটি দিক বলতে পারি। ব্যবহারিক জীবনে এমন কোনো কোনো পরিস্থিতি আছে যেগুলি মানুষ কখনই ব্যষ্টিকেন্দ্রিকভাবে অনুভব করতে পারে না। এই সমস্ত পরিস্থিতি মানুষকে বাধ্য করে একই সঙ্গে ভাববার—একই সঙ্গে মানুষ এই সমস্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। এইভাবে মানুষের সামাজিক চেতনার উন্মেষ হয়। এই সামাজিক চেতনা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এই সমস্ত পরিস্থিতিকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করবার এবং মানুষ তার সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে তারা বিচার করতে পারে কোনো সামাজিক আচার ব্যবহার তাদের সমষ্টিগত লক্ষ্যের নিকটে পৌঁছে দিতে পারবে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—নতুন করে সামাজিক মূল্যবোধ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা। এই সময়ে বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক চিন্তানায়কই তাঁদের নিজ নিজ ভাবাদর্শ-অনুযায়ী সামাজিক মূল্যবোধের কথা বলে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই বৈশিষ্ট্য বিবেকানন্দের চিন্তাধারাতেও সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবেকানন্দ সচেতন ছিলেন। এই পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে সামাজিক মূল্যবোধের নিরূপণের প্রচেষ্টা তিনি করেন নি। অথচ, এই সামাজিক মূল্যবোধ তাঁর অদ্বৈতবাদের বিরোধী বলেও তাঁর মনে হয় নি।

বিবেকানন্দের মতে, "সত্য দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সংকলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সংকলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।" এই প্রথম প্রকারের জ্ঞান কখনই ত্রৈকালিক বা ধ্রুব হতে পারে না। বহির্জগতের পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। ব্যবহারিক পর্যায়ের বহির্জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল—কাজেই 'বিজ্ঞান' ধ্রুব নয়। সামাজিক পরিস্থিতি—সমাজের আচার-ব্যবহার-সমস্তই বহির্জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। কাজেই সামাজিক চেতনা এবং সামাজিক মূল্যবোধ কখনই ধ্রুব হতে পারে না. "ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়।" কাজেই সমস্ত সামাজিক বিধি-নিষেধই তাৎকালিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়। আর যে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি জন্মায় সেই মূল্যবোধও তাৎকালিক প্রয়োজনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ যে কেবল কালিক প্রয়োজন অনুসারেই নির্ধারিত হয় তা নয়—একই কালে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ নিজস্ব মূল্যবোধ স্থির করে এবং ঐ মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত বিধি-নিষেধগুলিকেই অনুসরণ করে ও অপরকে করাতে চায়।

কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজের আদর্শ যে দেশ ও কালের সর্তে সীমাবদ্ধ এবং সেই বিশেষ সমাজের আদর্শকে চরিতার্থ করার জন্য যে ঐ দেশ ও কালের উপযোগী উপায় অনুসরণ করা উচিত একথা বিবেকানন্দ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারের জন্য কোনো কোনো সংস্কারক পাশ্চাত্ত্যের সর্বৈব অনুসরণকে উপায় বলে গ্রহণ করেছিলেন, আবার কোনো কোনো সংস্কারক অতীত ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে আশ্রয় করেছিলেন। বিবেকানন্দ এই দুই উপায়েরই ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, "ভারতবর্ষে আমাদের এই পথে দুইটি প্রধান অন্তরায়, ইহা একটি উভয়-সংকট অবস্থা। একটি হইল পুরাতন গোঁড়ামির প্রতি গভীর আসক্তি ও অপরটি হইল পাশ্চাত্ত্য

সভ্যতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ"। অন্ধভাবে কোনো কিছু অনুকরণে যে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না—তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই অনুকরণকে স্পষ্টভাবেই তিনি ধিক্কার করেছেন: "অনুকরণ সভ্যতা নহে, কাপুরুষের অনুকরণ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না........। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিও না যে আহার-বিহার ও আচার-ব্যবহারে পরানুকরণ কখনও ভারতের পক্ষে মঙ্গলের হইবে......। অপর পক্ষে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এক প্রকার বাতিকগ্রস্ত—দর্শনশাস্ত্রের বাতিক এবং প্রভুই জানেন এই অদ্ভুত জাতির অদ্ভুত ঈশ্বর ও অদ্ভুত গ্রাম্য কুসংস্কার সম্পর্কে আর কত প্রকার বাল-সুলভ ব্যাখ্যাই না আছে। প্রতিটি তুচ্ছ গ্রাম্য কুসংস্কার তাঁহাদের নিকট বেদের নির্দেশের ন্যায়"।

সমাজের অন্ধ সংস্কারের অচলায়তন যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে—আর তারই ফলে দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের শোষণের কবলে পড়তে হয়—একথা বিবেকানন্দ পরিষ্কার ভাবে জানতেন। সামাজিক আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা সমস্তই দেশ ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শ্রেণী এই সমস্ত সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কার, বিধিনিষেধ—এগুলি ধ্রুব বলে প্রচার করেন। সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিগণ নিম্ন-শ্রেণীকে স্পর্শ করিবে না অথচ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অর্থই শোষণ করিতেছে....চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের শ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতেছেন। প্রত্যেক দেশেরই এই অবস্থা। ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ এ বিষয়ে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষে এই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বর্তমানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যাধিক্য হইতে ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। যতই চেষ্টা করুক আর

উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাপ্য অধিকারদানের মধ্যেই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর মঙ্গল"।

নিম্নশ্রেণীর প্রাপ্য এই অধিকার যে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অধিকার—আর অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া যে তাদের কোনো রকম অধিকারই তাদের উন্নতি বিধানে অসমর্থ—একথা বিবেকানন্দ ঘোষণা করে গেছেন। এই অর্থনৈতিক শোষণ সর্বপ্রকার মানবতার বিরোধী, সর্বপ্রকার সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী। এই শোষণকারী দল তাই সমাজের শত্রু—মানুষের শত্রু। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ তাই মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা "যতদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষুধার্ত অজ্ঞ থাকিবে ততদিন প্রত্যেক মানুষকেই আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব, যাহারা তাহাদেরই অর্থে বিদ্যার্জন করিয়াছে অথচ তাহাদের জন্য কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে না। দীন-দরিদ্রকে শোষণ করিয়া তাহাদেরই অর্থে সগর্বে বিলাসিতা করিতেছে এবং এযাবৎ এই দুই কোটি নর-নারীর জন্য যাহারা কিছুই করে নাই তাহারাও বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত কি হইতে পারে?"

সমাজের এই যে ক্ষত—এর নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন আমূল-সংস্কার। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন কেবল উন্নত শ্রেণীর সেবা বা দানের সাহায্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে। যারা শোষিত—যারা নিপীড়িত তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য না জানবে—ততদিন পর্যন্ত কোনো রকম সংস্কার সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই; আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি ঈশ্বরের স্থলে নিজেকে বসাইয়া সমাজকে নির্দেশদানের পক্ষপাতী নহি। যে পথে তোমরা চলিতেছ তাহা ঠিক নহে। আমার আদর্শ জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতির বিধান করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন তাহার নিজ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইতে হয়, অন্য কোনো উপায় থাকে না, জাতির পক্ষেও তদ্রূপ"।

বিবেকানন্দ ভাববাদী ছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন সমাজের যে কোনো রকম উন্নতির জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক উন্নতি। "সুস্থ সামাজিক পরিবর্তনসমূহ অন্তরস্থ অধ্যাত্মশক্তিরই বিকাশ এবং যদি তাহা দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন সমাজও তদনুযায়ী তাহাকে গঠন করিয়া লইবে। আধুনিক সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে যাইও না, কারণ, প্রথমে অধ্যাত্ম-সংস্কার ব্যতীত অন্য কোনো সংস্কার হইতেই পারে না।" কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উন্নত হলেই যে সমাজের শোষিত শ্রেণী মুক্ত হবে—এমন কথা বিবেকানন্দ বলেননি। শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রথমে প্রয়োজন শোষিত শ্রেণীর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা। কারণ তারা যদি নিজেরা সচেতন না হয় তাহলে নিজেদের মুক্তির চেষ্টা করতে পারবে না, আর স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা না হলে শুধু অপরের দয়ায় সমাজের এই ধরনের ক্ষত দূর হয় না। একমাত্র মানসিক উন্নতির দ্বারাই তারা সমাজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। স্বামীজির এই চিন্তাধারার সঙ্গে টলস্টয়ের আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের অত্যন্ত মিল দেখা যায়।

বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজ বলতে প্রধানত বুঝিয়েছেন হিন্দু সমাজ। এই সমাজের প্রধানতম সামাজিক যোগসূত্রটি হল ধর্ম। হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই ধর্মীয় লক্ষ্যই সামাজিক জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু যদিও সমাজ-জীবনের আদর্শ হল ধর্মীয় আদর্শ, বিবেকানন্দ কখনই মনে করতেন না যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার পালনেই ধর্মীয় লক্ষ্য নিকটতর হয়। তাঁর মতে, "পৃথিবীতে কোনো ধর্ম হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোনো ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই"। সামাজিক আদর্শচ্যুতি ও সামাজিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিন্দুধর্মের কতকগুলি অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, যা আমাদের ধর্মীয় লক্ষ্য

চরিতার্থ করার পথে অন্যতম অন্তরায়। ধর্মীয় আদর্শকে যখন সামাজিক আদর্শের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, তখন ধর্ম বলতে বোঝায় সেই জিনিস যা আমাদের মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে—ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাকে তার জীবনের চরম লক্ষ্য চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। তথাকথিত লৌকিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ-জীবনের লক্ষ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই জাতিপ্রথা হিন্দু-ধর্মের লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্বর্তী হলেও তার সঙ্গে সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পর্ক খুবই অল্প। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান-নিঃসৃত মূল্যবোধকে ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতির বিভেদ টেনে আনলে অথবা ধর্মীয় আচার-বিভেদগুলোকে জাতিবিভাগের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে তা কেবল বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ-সিদ্ধির সহায়তা করে মাত্র। আসলে জাতিভেদের ভিত্তিস্বরূপ যে সমস্ত ধর্মীয় আচার-বিধির কথা বলা হয় তা প্রধানতঃ রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ধর্মের প্রকৃত রূপের সঙ্গে তার কোনো রকম সম্বন্ধ নেই। তাঁর মতে, "জাতি ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে উদ্ভূত এবং ইহা বংশানুক্রমিক একটি ব্যবসায়-বৃত্তি।" তিনি আরও বলেছেন, "বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই জাতিকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাবিয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং ধর্ম ও জাতিকে একত্রে জড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহারা অকৃতকার্য হইয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মণত্বকে যদি ধর্মীয় এবং সামাজিক আদর্শ বলে ধরা যায় ত' সেই ব্রাহ্মণত্বের স্বরূপ উচ্চ বংশ-গৌরব ও ছুতমার্গের মধ্যে নিহিত নাই। "ভারতে সকলকে ব্রাহ্মণ করাই আমার পরিকল্পনা, কারণ ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।" কিন্তু ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা যে সমাজের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকেদের উপর বিধিনিষেধের বোঝা চাপিয়ে তাদের শোষণ করেছে আর

মনুষ্যত্বের আদর্শ থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে রেখেছে—এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভুয়ো ব্রাহ্মণত্বের এই ভণ্ডামী সমাজ বেশীদিন সহ্য করে না। তাই, "এতদিন ব্রাহ্মণগণই ধর্মকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সময়ের প্রতিকূলে তাঁহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।" ব্রাহ্মণের হাতে সকলের আধ্যাত্মিক জগতের ছাড়পত্র আটকে থাকবে না—প্রত্যেকেই নিজে চেষ্টা করে আধ্যাত্মিক ছাড়পত্রের অধিকারী হবে। "আমরা তাই চাই, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ, প্রত্যেককেই এরূপ শিক্ষা দান কর যে তোমার মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই তাহার নিজ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হউক।"

"বিস্তৃতিই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। প্রেমই বিস্তৃতির লক্ষণ ও সর্বপ্রকার স্বার্থপরতাই মৃত্যু। অতএব প্রেমই বাঁচিয়া থাকিবার রীতি।" সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, সমাজ-চেতনা এসমস্তই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তারই আপন বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির কাছে অনেকখানি দায়বদ্ধ। এই দায়িত্বকে সে যদি অস্বীকার করতে চায় তাহলে তার পক্ষে তার আপন সত্তাকেও বজায় রাখা সম্ভব নয়। আর অপরের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে হলেই তাকে অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, অপরাপর ব্যক্তি-সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে দিতে হবে পূর্ণ স্বীকৃতি। কোনো একটি বিশেষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য তেমনি বিরাট্ মানবজাতির একটি সমাজ ধরলে প্রত্যেক মানুষের এই দায়িত্ব থেকে গেছে। আবার বিরাট মানব-সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অথবা রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলিরও প্রত্যেকটি অপরটির প্রতি এরূপ দায়িত্বে বদ্ধ। প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক সমাজই তার আপন মূল্যবোধের ওপর নিষ্ঠিত। বিভিন্ন সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এই বিশেষ

বিশেষ মূল্যবোধ বা বিশেষ বিশেষ ধাঁচগুলি হয়ত অনেক সময়েই পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কোনো সমাজেই এরকম ভাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না যে অপর সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ—সমস্ত কিছুই ভুল অথবা সেই বিশেষ সমাজের সমস্ত কিছুই পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত কালের সমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য। সমস্ত সমাজেরই অন্যান্য সমাজের কাছ থেকে কিছু কিছু শিক্ষণীয় থাকতে পারে। তাই তিনি হিন্দুসমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই ধরিয়া থাকিবে। তারপর অপর হস্তটি প্রসারিত করিয়া অপর জাতির নিকট যাহা কিছু প্রাপ্ত হও গ্রহণ করিবে কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই জীবনে একটি আদর্শের অনুগামী হইবে।" ভারতীয় সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ—নিজ সভ্যতার মূল ভিত্তিকে আশ্রয় করে অপর সকল দেশের সভ্যতা আর সংস্কৃতি—অন্যান্য ভাবাদর্শকে জানবার এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য থাকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য তিনি বলেছিলেন। "আমার স্বদেশপ্রেম, ভারতের প্রতি ভালবাসা ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত আমি মনে করি না যে অপর জাতির নিকট অনেক কিছু শিক্ষা করিতে হইবে। মনে রাখিও, আমরা অপরের পদতলে বসিতেও প্রস্তুত, যেহেতু প্রত্যেকের কাছেই মহৎ শিক্ষণীয় কিছু আছে। আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে অপর দেশের সমাজ-শক্তি কিভাবে কাজ করিতেছে এবং যদি আমরা পুনরায় একটি জাতিতে পরিণত হইতে চাই তবে অপর জাতির মানসিক বিকাশ কিভাবে হইতেছে তাহার সহিত স্বাধীন ও মুক্তভাবে আদান-প্রদান রাখিতে হইবে। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, যাহা কিছু পার স্বীকরণ করিয়া লও, প্রত্যেক জাতির নিকট হইতে শিক্ষালাভ কর এবং যাহা কিছু প্রয়োজনীয় গ্রহণ কর।" সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মানসিক বিকাশের পন্থা নির্ধারণই বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের মূল লক্ষ্য। মানবজাতির এই মুক্তির পথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সমাজের

ভূমিকার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার শ্রেষ্ঠত্বেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। "মানবজাতির বিকাশের জন্য প্রতীচ্যের আদর্শও যেমন প্রয়োজন, প্রাচ্যেরও সেইরূপ প্রয়োজন, এবং আমার মনে হয় ইহা অধিকতর প্রয়োজন।"

মানুষের ইতিহাস কেবল নিছক কতগুলো ঘটনার সমষ্টি মাত্র নয়। এই ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি, মানবসমাজের উত্থান-পতন আকস্মিক নয়। এর ভেতরে খুঁজলে একটি ক্রম পাওয়া যাবে। ইতিহাসের গতি আকস্মিক নয়; এই গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কতকগুলি নিয়মদ্বারা অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে কতগুলি নিয়ম কার্যকরী। বিশেষতঃ কোনো সামাজিক লক্ষ্যকে সচেতনভাবে লাভ করার প্রচেষ্টা যেখানে যেখানে, সমাজের মূল্য-বোধকে বিচার করার, বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে। ইতিহাসের ধারা যে নিয়মে বয়ে চলেছে—সেই নিয়মটিকে সচেতন-ভাবে অন্বেষণ করার প্রয়োজন আছে। সমাজ-সচেতন প্রত্যেক চিন্তানায়কই তাই এই নিয়ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। ইতিহাস-দর্শনকে তাই সমাজ-দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলির পেছনে কতগুলি সামাজিক শক্তি কাজ করে। ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতিকে এই সামাজিক শক্তির উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। এই সমস্ত সামাজিক শক্তিগুলির প্রত্যেকটি নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে কাজ করে যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলির পেছনে যে কোনো একটি নিয়মই কাজ করছে না এমন কোনো কথা নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির কার্য হিসাবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাই নিয়েই ইতিহাস। তাই ইতিহাসের মূলভিত্তিস্বরূপ কোনো সাধারণ নিয়ম থাকা অসম্ভব নয়। সমাজ-সচেতন বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। তার ভেতরে বিবেকানন্দের গভীর সমাজ-সচেতনতা সূচিত হয়। ভারতীয় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টার ভেতরে বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই—বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তার মূলসূত্রের সঙ্গে তার সমন্বয়-সাধন একদিকে যেমন অত্যন্ত সহজসাধ্য আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে তাঁর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ইতিহাস-দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

"শক্তিমান বৃক্ষ সুন্দর সুপক্ক ফল উৎপাদন করে, সেই ফলটি ভূমিতে পতিত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং পচিয়া যায়। সেই ধ্বংস হইতেই ভাবী বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সম্ভবতঃ তাহা প্রথম বৃক্ষটি অপেক্ষাও শক্তিমান হয়। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মাধ্যমে অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এইরূপ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারত জন্মলাভ করিবে।" কেবল তৎকালীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেই একথা সত্য নয়। যে কোনো সমাজের বিবর্তনের মধ্যেই এই উত্থান-পতন বিবেকানন্দ স্বীকার করেন। কোনো একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ দেশ-কালানুযায়ী পরিস্থিতি সেই সমাজের ব্যক্তিদের মনে এক বিশেষ মূল্যবোধ, এক বিশেষ ভাবাদর্শ সঞ্চারিত করে। সমাজের এই বিশেষ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজের ক্রিয়া-বিধিগুলি স্থির হয়। কিন্তু দেশ অথবা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত ক্রিয়া-বিধি, ঐ সমস্ত ভাবাদর্শ, ঐ সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধগুলি আর সমাজের প্রয়োজনে লাগে না—সমাজকে তার লক্ষ্য চরিতার্থ করতে সহায়তা করে না। সমাজ তখন এক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন ভাবাদর্শ, নতুন মূল্যবোধ, নতুন ক্রিয়া-বিধির— যা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। আর এইগুলিকে আশ্রয় করে সমাজ এক নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়।

"ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে কোনো আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তীভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য-

বোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে।” বিবেকানন্দের মতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ সমাজের এক বিশেষ সময়ের ঐ সমাজের বিশেষ রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থা, বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির রূপদান করে এবং সমাজের ভৌতিক পরিস্থিতি যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেই বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শকে আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলে। ভারতীয় সমাজের ইতিহাস অন্বেষণ করে বিবেকানন্দ তাঁর এই মতবাদের উদাহরণ পেয়েছেন। ভারতীয় ইতিহাসে তিনি কয়েকটি প্রধান প্রধান আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের অস্তিত্ব দেখেছেন এবং ভারতীয় ইতিহাসের এক একটি যুগকে—ভারতীয় সমাজের এক একটি পর্যায়কে তিনি এক একটি আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করেছেন। কার্য-কারণ-নিয়মের প্রতিফলন সমাজ-ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়েই তিনি দেখেছিলেন। “কার্য-কারণ-নিয়ম আর্য জাতিরই মত সুপ্রাচীন। এই নিয়ম সর্বশক্তিমান, কোনো দেশ বা কালের সীমায় ইহা আবদ্ধ নয়। প্রাচীন ঋষি-কবিগণ ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহাকেই ভিত্তিপ্রস্তর-রূপে স্বীকার করিয়া আজ পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাহার জীবন-দর্শন রচনা করিয়া চলিয়াছে।” সমাজ-জীবনে যখন এই কার্য-কারণ-নিয়মের প্রয়োগ প্রতিফলিত দেখি তখন কারণ হিসাবে উপস্থিত থাকে একটি মৌল আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম যুগে এই আধ্যাত্মিক সূত্রটি ছিল একটি সার্বভৌম একক সত্তার বিশ্বাস। এই সত্তা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রাচীন যুগের দর্শন,

বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, সামাজিক বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতির। এই প্রাচীন যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন,

"যুগ প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে········

"এই জিজ্ঞাসার সাহস আর্য-ঋষিদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টক-খণ্ডের স্বরূপ-অনুসন্ধানে, উদ্বদ্ধ করিয়াছিল শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের মাত্রা নির্ণয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা ঐগুলির পুনর্বিন্যাসে। ········এই অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রচলিত দেবতাবর্গকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং সর্বজ্ঞ, সর্ব-ব্যাপী ও সর্ব-শক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টারূপে যিনি কীর্তিত, যিনি পিতৃপুরুষের স্বর্গীয় পিতা—তাঁহার জন্য হয় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা এককালে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়াই এক সার্বভৌম ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল...

"এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের দান প্রাচীন অথবা আধুনিক যে-কোনো জাতির দান অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে ধাতু-ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতের স্বর-গ্রাম নির্ধারণে, বেহালা-জাতীয় তারযন্ত্রের উদ্ভাবনে তাহাদের যে প্রতিভা, তাহাই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

"এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।"

কিন্তু প্রথম যুগের আধ্যাত্মিক ধারণাটি বেশীদিন অপরিবর্তিত থাকল না। যে ব্রাহ্মণেরা এই আধ্যাত্মিক ধারণার উদ্গাতা ছিলেন—

সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করায় সমস্ত ভাবাদর্শ, বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করতে শুরু করলেন। ফলে শীঘ্রই তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে উঠল। ব্রাহ্মণেতর সকলেই চাইলেন তাঁদের ঐ ক্রিয়া-বিধি, ভাবাদর্শ ইত্যাদির পরিবর্তন আনতে। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়রা, সমাজে যাঁদের স্থান ঠিক ব্রাহ্মণদের পরেই, তাঁরাও ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা করলেন; সম্ভবতঃ, সম্পূর্ণ এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য। "পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল, এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল। একদিকে পুরোহিতকুলের আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই-সকল ক্রিয়া-কর্মকে সমর্থন করিত, যে-গুলির জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য। আবার অন্য দিকে যে রাজন্য-বর্গের শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত—পরিচালিত করিত এবং যাঁহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মননক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠানদক্ষ পুরোহিতবর্গকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে আর সম্মত ছিলেন না।"

সাধারণ মানুষ এই দ্বিমুখী বিরোধের ফলে বিভ্রান্ত হল এবং দলে দলে জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। "শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারত-ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।"

"এ বিরোধের প্রথম সমাধানপ্রচেষ্টা শুরু হয় ভাব-সমীকরণের সূত্র অনুসরণ করিয়া, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে একই সত্য বিভিন্ন ভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিল।" এই সমাধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই সূচিত হয় ভারতীয় ইতিহাসের নূতন পর্যায়।

এই পর্যায়ের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা রূপায়িত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতায়। "জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ও বিপর্যয়ের পর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ জীবন-দর্শনরূপে গীতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।"

"বর্ণাধিকারের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য রাজন্যবর্গের যে দাবি এবং পুরোহিতকুলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ-জনিত যে উত্তেজনা, তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও তাহার মূলীভূত হেতু যে সামাজিক বৈষম্য, তাহা তখনও দূর হইল না, রহিয়াই গেল।" তাই দেখা যায়, "সেই সামাজিক বৈষম্যের বিরোধ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নূতন শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের নেতৃত্ব প্রাচীন আচার-ব্যবস্থাদি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বিশেষ অধিকারভোগী পুরোহিত-বর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, বৈদিক দেবতাদিগকে বৌদ্ধাচার্যগণের ভৃত্য-শ্রেণীতে অবনমিত করিয়াছিল; সেই সঙ্গে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে, 'স্রষ্টা' বা 'সর্বনিয়ন্তা' বলিয়া কিছু নাই, উহা পুরোহিতগণের আবিষ্কার অথবা কুসংস্কার মাত্র।" বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। "খুব সম্ভব এই সংস্কারকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রাচীন শক্তিসমূহ কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে নাই, তথাপি বৌদ্ধ-প্রাধান্যের কালে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।" এই বৌদ্ধ-প্রাধান্যের কালকে ভারতীয় ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায় বলা যায়।

"অত্যধিক গ্রহণ-প্রবণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই হারাইয়া ফেলে, এবং জনপ্রিয়তার চরম

আগ্রহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মূল বৈদিক ধর্মের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আর সম্ভব ছিল না। বৈদিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ ধর্মের উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি-উপাসনা, মন্দিরে শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়া যথা-সময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মকে এক কালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।"

"সীথিয়ানদের ভারতাক্রমণ এবং পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল।" "ইহার পর প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।" এই অভ্যুত্থানকে ভারতীয় ইতিহাসের অপর এক স্বতন্ত্র পর্যায় বলা যায়। "নির্ভীক রাজপুত-জাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে যে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞানকেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নব ভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভা-শিল্পীবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্প দ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিজেতা জাতির এই ধর্ম এবং ভাবধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোর করে ভারতের লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে, "মুসলমানযুগে উত্তর ভারতে বিজয়ী জাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস ; তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।

"রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইস্‌লামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এবং মুসলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থন-কারী;"......

এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের অবস্থার উদাহরণের সাহায্যে বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন যে, যে-কোন সামাজিক পরিস্থিতি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ঐ ভাবাদর্শকে আশ্রয় করেই বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্র-নীতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। "প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মনন-শীলতা আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের মত প্রাচীন কালেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধি-চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

"সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল, বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।"

বিবেকানন্দের ইতিহাস-দর্শনকে এক অর্থে ভাববাদী ইতিহাস-দর্শন বলে আখ্যায়িত করা চলে। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তাঁর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এই ইতিহাস-দর্শনের একটি বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সমাজ-জীবন কখনই স্থির নয়। যুগে যুগে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়েছে। এবং এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ দ্বারা। অথচ অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করলে এই আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের কোনো পরিবর্তন স্বীকার করা যায় না। তাহলে ব্যবহারিক সমাজ-জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি কি করে সংঘটিত হল? ব্যবহারিক জগতের বিশেষ ব্যাখ্যা দিলে ও সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ অর্থ করলে হয়ত এই বিরোধের নিরসন সম্ভব; কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তায় এ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দ বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন যে সমাজ-জীবনে দেশ-কালের অবস্থা ও বাস্তব পরিস্থিতি বহু ক্ষেত্রে চিন্তা-ধারার সুস্পষ্ট পরিবর্তন এনেছে। শুধু তাই নয়—সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে না পারলে কোন ভাবাদর্শই টিকে থাকতে পারে না। এ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে একদিকে ভাববাদী ইতিহাস-দর্শনের সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায় তেমনি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এ চিন্তাধারার কোনো রকম সমন্বয়-সাধন খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে।

তা ছাড়া বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক অধ্যাত্মবাদ ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন গতিকে ব্যাহত করে দেখায়। সমাজ-ইতিহাসের গভীরে যে নিয়ন্ত্রণের কথা তিনি বলেছেন—তার সাহায্যে বিচার করতে গেলে ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্ন গতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। ইতিহাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়কে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করলে তবেই এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ ধরা পড়ে।

পরম সত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি জ্ঞানের মাধ্যমে হয় 'সত্য'-রূপে, কর্মের মাধ্যমে হয় 'কল্যাণ'-রূপে আর নান্দনিক অনুভূতির মাধ্যমে হয় 'সুন্দর'-রূপে। আসলে এই 'সত্য', 'শিব' আর 'সুন্দর' এক; এমন কি একরকমভাবে জানলেই অন্য দুটি দিকও উদ্ভাসিত হয়। তাই ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমে পৌঁছলেও 'সুন্দর' সীমাতীত, অরূপ বিশেষ। যে শিল্পবোধ সেই অরূপের সন্ধান দিতে পারে না—তা যথার্থ শিল্পবোধ নয়। "রসো বৈ স"—তিনি রসস্বরূপ। তাই অমিশ্র নান্দনিক-বোধের মাধ্যমেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। বিবেকানন্দের মতে তাই, "···· সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মত সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনি মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে।" শিল্প-সৃষ্টি থেকে যথাযথ রসাস্বাদন করতে হলেও তেমনি লাভালাভের দৃষ্টি বাদ দিতে হবে: "একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্র-দ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন,

যাঁহার বেচা-কেনার কোনো মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন।”

পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোনো মূল্যবোধ বিচার-বিশ্লেষণ করলে সেই মূল্যবোধ পরমপুরুষার্থ থেকে ভিন্ন ভাবে জানা যায় না। বেদান্তের একক পরম সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নন্দন-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় শিল্পমূল্যের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে—তাই ব্যবহারিক পর্যায়ে লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও শিল্পের বিচারের প্রয়োজন যথার্থ প্রয়োজনীয়। বিবেকানন্দ একথা স্বীকার করেন। তাঁর শিল্পরস সম্পর্কে আগ্রহ কেবল পারমার্থিক পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যবহারিক লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও শিল্প সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন।

লৌকিক বিচারে শিল্প সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়—শিল্প-সৃষ্টি কতখানি বাহ্য বস্তুকে প্রতিফলিত করবে—আর শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি আর কল্পনাই বা তার মধ্যে কতখানি থাকবে। শিল্প কতখানি প্রতীকের আশ্রয় নেবে এবং এই প্রতীক কতখানি সংবাহনযোগ্য হবে—এ সমস্ত প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে কেবল আগ্রহশীল ছিলেন তাই নয়—এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টাও তাঁর চিন্তায় পাই: “একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent করা চাই, নইলে কিছুই হয় না……একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা Perfect drama লেখা, একই কথা।”

শিল্পের ভাব-সংবাহনের সমস্যা হল আর একটা প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ে যিনি শিল্প সৃষ্টি করেছেন আর যিনি শিল্প উপভোগ করেছেন—দু'জনারেই যে দায়িত্ব সমান—এ কথা বিবেকানন্দ মানতেন। তাঁর মতে একদিকে যেমন “শিল্পের বিষয়বস্তুর মুখ্য-

ভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্য থেকে ফুটে বেরুনো চাই।” তেমনি আবার “একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না।....একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অঙ্কি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না।”

বিভিন্ন দেশের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতামত যে কোনো শিল্প-বিশেষজ্ঞের কাছেই গ্রহণযোগ্য না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে। লুভার মিউজিয়মে গ্রীকশিল্পের নমুনা দেখে তিনি যে মূল্যায়ন করেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ: “মিউজিয়ম দেখে গ্রীক-কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম ‘মিসেনি’, দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক।.......এই ‘মিসেনি’ শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হ'তে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ‘হেলেনিক’ বা যথার্থ গ্রীক-শিল্পের সময়।.... ..ক্রমে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে।” গ্রীক-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, “(ক্লাসিক) গ্রীক-শিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোনো দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধি-নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক-শিল্প সজীব হইয়া উঠে। এই ক্লাসিক গ্রীক-শিল্পের দুই সম্প্রদায়,—প্রথমটি আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়ান।”

আটিক শিল্পের দুইটি বৈশিষ্ট্য বিবেকানন্দের কাছে সব থেকে আবেদনগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছিল। আটিক শিল্পের একটি দিক

হল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে আলাদা করে শুধুমাত্র মানুষের জীবনের সাধারণ বিবরণের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে দেব-মহিমার প্রচার। অদ্বৈতবাদের অন্যতম বিবেকানন্দ জীবের মধ্যেই ব্রহ্মকে দেখেন। তাই আর্টিক শিল্পে একই সঙ্গে মানব-মহিমা আর দেব-মহিমার সন্ধান পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

জাপানী ছবি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্যও তাঁর গভীর শিল্প-বোধের পরিচয় দেয়। জাপানী ছবির নিজস্ব ভাববৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল। জাপানীদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "…ঐ আর্টের জন্যই ওরা বড়। তারা যে Asiatic. আমাদের দেখছিস্ না, সব গেছে, তবু যা আছে তা' অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ।"

বিবেকানন্দের মতে "শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।" ভারতীয় শিল্পে বিবেকানন্দ এই দুই গুণেরই সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ভারতীয় শিল্প-সাধনার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন পরমার্থের সাধনা। এই নামরূপের জগতের আড়ালে যেমন পরম সত্তা তেমনি রূপে রঙে অভিব্যক্ত শিল্প-স্থষ্টির গভীরে যেন আছে অরূপের অস্তিত্ব। এই অরূপকে রূপের মাধ্যমে অনুভব করাই হল শিল্পবোধের চূড়ান্ত কথা।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহস্মি" ॥

"হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্য ধর্ম আমি যাহাতে দেখিতে পারি এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি,—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমি-ই।" (ঈশোপনিষৎ)

রূপের মধ্য দিয়া যেমন সেই রূপকারকে দেখা যায় ও সেই রূপকারকের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া যাওয়া যায়—তেমনি শিল্প রসাস্বাদনের মধ্যেই অরূপের সন্ধান মেলে—শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে শিল্প-রসিকের আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তার কয়েকটি দিকের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা এই নিবন্ধে করা হল। স্বভাবতই, কারো দর্শন-চিন্তার কোনো বিবরণ দিতে গেলেই প্রশ্ন ওঠে,—এই দর্শন-চিন্তা কতখানি বিচারগ্রাহ্য। বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনো একটি বিশেষ দার্শনিক চিন্তার কতটুকু রাখা যায়—আর কতটুকু নেওয়া যায় তার হিসাব করা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিবন্ধে তা করা হবে না। তবে বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো এবং কোন্ অর্থে এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ—সেটা বোঝার চেষ্টা করা শুধু প্রাসঙ্গিক হবে তাই নয়—আমাদের কাছে তার গুরুত্বও অনেক।

বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়। সে দর্শন-চিন্তার সঙ্গে আমাদের বাস্তব-জীবন আর লৌকিক অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য পুরোপুরিই বর্তমান। বিবেকানন্দের চিন্তার অপর বৈশিষ্ট্য হল তাঁর চিন্তাধারায় একদিকে যেমন ভারতীয় ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তেমনি তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক আর মুক্ত। তাঁর চিন্তাধারায় একদিকে দেখি গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর মননশীলতার পরিচয়—তেমনি দেখি সুস্পষ্ট বাস্তববোধ। এই মননশীলতা আর বাস্তববোধের জন্যই বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও—তাঁর দার্শনিকতা যে-কোনো চিন্তাবিদের ঈর্ষার বস্তু। তাঁর এই দার্শনিকতার জন্যই তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম দার্শনিক বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

———